তফসীরে নূরুল কোরআন

ছাব্বিশ পারা

২৬

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

ছাব্বিশতম খন্ড

اقرأ باسم ربك الذي خلق

তফসীরে নূরুল কোরআন

ছাব্বিশতম খন্ড

২৬

ছাব্বিশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ,
সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস,
চেয়ারম্যান, তফসীরে তাবারী
প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

চতুর্থ প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০১০
কার্তিক -১৪১৭
জিলকদ-১৪৩১

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১১০০ ফোন-৯৫৫৮৯১৩

Tafseer-e Nurul Quran (26): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam. Published Bby Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207
Mobile : 0173014889. Price : 300.[illegible] 20

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

১।	সূরা আহকাফ প্রসঙ্গে	২
২।	নামকরণ	২
৩।	সূরার মূল আলোচ্য বিষয়	২
৪।	এ সূরার আমল	৩
৫।	স্বপ্নের তাবীর	৩
৬।	বিশ্ব–সৃষ্টির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট	৫
৭।	শেরক অন্যায়, মূর্খতা–প্রসূত	৬
৮।	আমি কোন নতুন রসূল নই	১৫
৯।	মোমেনদের জন্যে মহা প্রতিদানের সুসংবাদ	১৭
১০।	প্রিয়নবী (দঃ) স্বপ্ন দেখলেন	১৯
১১।	এস্তেগফার আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়	২০
১২।	আমি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী	২১
১৩।	নাজাত লাভের পর	২৩
১৪।	হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ	২৪
১৫।	ইহুদীদের ঘৃণ্য চরিত্র	২৬
১৬।	আয়াতের মর্মকথা	২৭
১৭।	শানে নজুল	২৯
১৮।	পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের তাগিদ	৩৫
১৯।	গর্ভধারণের সময় সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য	২৮
২০।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর জীবন ধারা	৫০
২১।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৫৬
২২।	কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৫৭
২৩।	আহকাফের পরিচিতি	৫৮
২৪।	শানে নজুল	৬৯
২৫।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর দরবারে জ্বীনেরা হাজির হলো	৬৯
২৬।	জ্বীনদের মজলিশ সম্পর্কে এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা	৭১
২৭।	জ্বীনেরা জান্নাতে যাবেনা	৭৮
২৮।	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ প্রসঙ্গে	৮১

২৯। প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ৮৪
৩০। একটি দোয়া ৮৫
৩১। সূরায়ে মোহাম্মদ প্রসঙ্গে ৮৭
৩২। সূরার মূল বক্তব্য ৮৮
৩৩। সূরার আমল ৮৯
৩৪। স্বপ্নের তাবীর ৮৯
৩৫। শানে নজুল ৮৯
৩৬। শরীয়তে মোহাম্মদীয়ায় ঈমানের প্রতি গুরুত্ব ৯৩
৩৭। ঈমানের বরকত ৯৫
৩৮। সত্য-অসত্যের সংঘাত চিরন্তন ৯৬
৩৯। জেহাদের আদেশ ৯৭
৪০। আয়াতের মর্মকথা ১০০
৪১। শানে নজুল ১০২
৪২। মোমেন ও কাফেরের পার্থক্য ১১১
৪৩। জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্যে দোয়া কর ১১৪
৪৪। শানে নজুল ১১৬
৪৫। কেয়ামতের আলামত ১১৯
৪৬। পছন্দনীয় কাজ ১৩২
৪৭। আয়াতের মর্মকথা ১৩৯
৪৮। আল্লাহর রাহে দানের গুরুত্ব ১৪৭
৪৯। সূরায়ে ফাতহ প্রসঙ্গে ১৫১
৫০। এই সূরার আমল ১৫২
৫১। স্বপ্নের তাবীর ১৫২
৫২। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৫২
৫৩। পটভূমি ১৫৩
৫৪। হোদায়বিয়ার সন্ধি–সুস্পষ্ট বিজয় ১৫৫
৫৫। আয়াতের মর্মকথা ১৭০
৫৬। আয়াতের তাৎপর্য ১৭২
৫৭। হোদায়বিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ১৭৫
৫৮। সালাতুল খাওফের আদেশ ১৭৯
৫৯। মাগফেরাতের সুসংবাদ ১৮০
৬০। প্রিয়নবী (দঃ)-এর মোযেজা ১৮১

৬১।	হুজুর (দঃ)-এর বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ	১৮৯
৬২।	হামলাকারীরা অন্ধ ও বধির হলো	১৯৪
৬৩।	হযরত আবু জন্দল (রাঃ)-এর ঘটনা	১৯৪
৬৪।	খাদ্য-দ্রব্যে বরকত	১৯৭
৬৫।	আল্লাহর রসূল (দঃ)-এর অনুসরণেই রয়েছে কল্যাণ	২০০
৬৬।	প্রিয়নবী (দঃ)-এর মোযেজা	২০৩
৬৭।	মোনাফেকদের শাস্তির ঘোষণা	২০৯
৬৮।	প্রতিবন্ধীদের উপর জেহাদ ফরজ নয়	২১৭
৬৯।	গায়বী মদদ	২২৪
৭০।	আল্লাহ পাক প্রিয়নবী (দঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন	২২৮
৭১।	আবিসিনিয়া থেকে হযরত জাফর (রাঃ) এর প্রত্যাবর্তন	২৩৯
৭২।	হুজুর (দঃ) জাফর (রাঃ) এর ললাটে চুম্বন করলেন	২৩৯
৭৩।	ফোদকের ঘটনা	২৪০
৭৪।	ওয়াদিয়ে কোরার বিজয়	২৪১
৭৫।	সার্বজনীন ধর্ম ইসলাম	২৫৪
৭৬।	সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য	২৫৯
৭৭।	এবাদতের কারণে চেহারা নূরানী হয়	২৬১
৭৮।	সূরা হুজুরাত প্রসঙ্গে	২৬৬
৭৯।	স্বপ্নের তাবীর	২৬৬
৮০।	এ সূরার আমল	২৬৬
৮১।	পটভূমি	২৬৬
৮২।	শানে নজুল	২৬৭
৮৩।	আয়াতের মর্মকথা	২৭০
৮৪।	শানে নজুল	২৭২
৮৫।	আয়াতের মর্মবাণী	২৭৩
৮৬।	হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর দরবারের আদব রক্ষার পুরস্কার	২৭৪
৮৭।	হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হলো	২৭৫
৮৮।	স্বপ্ন যোগে হযরত সাবেত (রাঃ)-এর ওসিয়ত	২৭৬
৮৯।	শানে নজুল	২৮১
৯০।	শানে নজুল	২৮১
৯১।	ঈমান আল্লাহ পাকের দান	২৮৭
৯২।	শানে নজুল	২৮৯

৯৩।	মুসলমানদের কর্তব্য	২৯১
৯৪।	শানে নজুল	২৯৩
৯৫।	শানে নজুল	২৯৭
৯৬।	কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপকরণ বর্জণীয়	২৯৮
৯৭।	গীবতের কাফফারা	৩০১
৯৮।	শানে নজুল	৩০২
৯৯।	শানে নজুল	৩০৫
১০০।	প্রকৃত মোমেনের পরিচয়	৩০৮
১০১।	সূরায়ে ক্বাফ প্রসঙ্গে	৩১৩
১০২।	এ সূরার ফজিলত	৩১৩
১০৩।	এ সূরার আমল	৩১৪
১০৪।	স্বপ্নের তাবীর	৩১৪
১০৫।	মূল বক্তব্য	৩১৪
১০৬।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৩২৪
১০৭।	কা'বা শরীফে গেলাফ	৩৩০
১০৮।	আল্লাহ্ পাক নিকটতম	৩৩৪
১০৯।	মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী	৩৪০
১১০।	মৃত্যু-যন্ত্রণা	৩৪১
১১১।	যাঁদের জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি	৩৫০
১১২।	শানে নজুল	৩৫৮
১১৩।	মৃতরা এই ডাক শ্রবণ করে	৪৬২
১১৪।	এ জীবন একটি মহা পরীক্ষা	৩৬৩
১১৫।	সূরা যারিয়াত প্রসঙ্গে	৩৬৫
১১৬।	এ সূরার আমল	৩৬৬
১১৭।	স্বপ্নের তা'বীর	৩৬৬
১১৮।	পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৬৬
১১৯।	সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গি	৩৬৬
১২০।	নেককারগণের শুভ-পরিণতি	৩৭৪
১২১।	নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্য	৩৭৮
১২২।	পবিত্র কোরআনের ঘোষণার প্রতি ঈমান	৩৮৩
১২৩।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মেহমানগণের ঘটনা	৩৮৪

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৬তম খন্ড (ছাব্বিশ পারা) পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা। আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

অগণিত দরুদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নূর সকলের পূর্বে, যাঁর আবির্ভাব সকলের জন্যে রহমত, যিনি বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি আল্লাহ পাকের প্রিয়তম রসূল, যিনি নবী রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ, যাঁর মহান আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের পরম সাফল্য। হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, তাঁর আজওয়াজ এবং তাঁর আসহাবের প্রতি, যাঁর মাধ্যমে তুমি রেসালতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ, যিনি মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী, যিনি মেরাজের মর্যাদায় সম্মানিত, এমন দরুদ যা হবে চিরস্থায়ী, যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন এ দরুদও অব্যাহত থাকবে।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে সেরা বা অভিযাত সৃষ্টি হলো মানব জাতি। মানুষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব তার এলমের কারণে, মানুষের এ উচ্চ মর্যাদা ফেরেস্তাদের চেয়েও অধিকতর, এজন্যেই আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সম্মানসূচক সেজদা প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন ফেরেস্তাগণকে, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ ঘটনার উল্লেখঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

(সূরা বাকারাহ)

"এবং (স্মরণ কর সে সময়কে), যখন আমি ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করেছিল"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণের উপর মানুষের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আর এ উচ্চমর্যাদার কারণ হলো তার এলম। আর এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এ প্রশ্ন তুলেছেন,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"যাদের এলম আছে, আর যাদের এলম নেই, তারা কি এক সমান? তা কখনো নয়"।

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ

"আল্লাহ পাকের বন্দাগণের মধ্যে শুধু আলেমগণই তাঁকে ভয় করে"।

অর্থাৎ এলম না থাকলে আল্লাহ পাককে ভয় করার গুণ থেকেও মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়। বৃষ্টি যেমন আসমান থেকে নাজিল হয়, তেমনিভাবে এলমও অবতীর্ণ হয় আসমান থেকে।

যেভাবে বৃষ্টির কারণে যমীন তৈরী হয় ফল-ফসলের জন্যে, তেমনিভাবে এলমের মাধ্যমে মানব-মন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে প্রস্তুত হয় এবং মানবিক গুণাবলী অর্জিত হয়। আর যেভাবে বৃষ্টিপাত ব্যতীত যমীন থেকে ফসলাদি বের হয়ে আসেনা, তেমনিভাবে এলম ব্যতীত মানুষ সঠিকভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগীও করতে পারেনা। এলমের এই ফজিলত ও গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ পাক স্বয়ং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এলম বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

(সূরা তোয়াহা)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে পরওয়ারদেগার! আমার এলম বাড়িয়ে দিন"।

আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে দান করা হয়েছে আগের পরের সকল এলম। আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের প্রতিটি কথা, কার্য্য বিবরণ এবং অনুমোদন আজও সংরক্ষিত রয়েছে। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট থেকে অর্জিত এলম সংরক্ষণে এবং এর প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন ইসলামের এলম দান করেন।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এলমে দ্বীন হাসিল করার জন্যে পথ চলে, আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এলম শেখ এবং অন্যকে শেখাও।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশও দিয়েছেন, এলম অন্বেষণ

করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, একজন আলেমের ফজিলত, একজন আবেদ ব্যক্তির উপর এমন, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার ফজিলত রয়েছে। (তিরমিজী শরীফ)

তিরমিজী শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় ফেরেস্তাগণ তালেবে এলমদের জন্যে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় এবং আসমান যমীনের সমস্ত মখলুক এমনকি, পানির মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্যে এস্তেগফার করে।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, এলমের একটি পরিচ্ছেদ শিক্ষা করা এক হাজার রাকাআত নফল নামাজের চেয়ে উত্তম।

সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করেছেন, এলম হাসিল করা সর্বোত্তম কাজ। এলম থাকলে সামান্য আমলও উপকারী হয়, আর এলম ব্যতীত অনেক আমলও উপকারী হয়না। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, কোন এলম হাসিলকারীর যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সে শাহাদতের মর্তবা পায়।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ওলামায়ে কেরামের মজলিশের চেয়ে উত্তম কোন স্থান সৃষ্টি করেননি। একজন আলেমের মৃত্যু এক হাজার আবেদের মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, এলম আমল ব্যতীত উপকারী হয়, কিন্তু আমল এলম ব্যতীত উপকারী হয়না।

বিখ্যাত সাহাবী আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এলমের জন্যে সফরকে জেহাদ মনে করেনা, তার বিবেক বুদ্ধিতে ক্রুটি রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাতে এক ঘন্টা এলম শিক্ষা করা বা এলম শিক্ষা দেয়া সারা রাত এবাদতের চাইতে উত্তম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, সাধারণ মোমেনদের উপর আলেমদের মর্তবা সাতশত গুণ বেশী।

বিখ্যাত সুফী সাধক সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বলেছেন, আল্লাহ পাক নবুওয়তের পর এলমের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কোন জিনিষ দান করেননি।

বস্তুতঃ এজন্যেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (বড় পীর সাহেব) (রঃ) বলেছেন, সমস্ত গুণাবলীর সমষ্টিই হলো এলম শিক্ষা করা এবং তার উপর আমল করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়া।

যে এলমের এত ফজিলত ও মর্তবা রয়েছে, তার ভান্ডারই হলো পবিত্র কোরআন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অগণিত মোযেজার মধ্যে পবিত্র কোরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মোযেজা। যারা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে এলম হাসিল করে, তারাই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেনঃ "আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক রূপে"।

মুসলিম জাতির সোনালী যুগে এলমই ছিল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পবিত্র কোরআনের এলম থেকেই এলমের সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। কোরআন হলো এলমের মহা সমুদ্র, আর সে মহাসমুদ্র থেকেই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন। যখন সমগ্র বিশ্বের এক চুতর্থাংশ মুসলিম জাতির করতলগত ছিল, তখন মুসলমানদের এলম সমগ্র বিশ্বকে আন্দোলিত করেছিল, আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ যখন বাগদাদের ক্ষমতায়, তখন তিনি "বয়তুল হিকমত" নামক একটি গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন, তাতে ৭০ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। তদানীন্তন বাগদাদে এমন আরও বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম জাতির দুর্গতি সেদিন থেকে শুরু হয়, যেদিন মুসলমানগণ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে উদাসীন হয়, এ উদাসীনতার পরিধি দূর্ভাগ্যবশতঃ এত বিস্তৃত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে অনেক মুসলমান শুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন পাঠ করতেও পারেনা।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে এ দূরত্বই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দূর্গতির কারণ। আর এ দূরত্ব দূরীভূত করার লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা। পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অসীম রহমতের ফলেই আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৬ তম খন্ড পেশ করার তৌফিক পেয়েছি। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই।

হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা, আমাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা কর এবং হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় এই মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর এবং মুসলমানগণকে এর দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ দান কর। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

(মওলানা) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ·

তফসীরে নূরুল কোরআন

ছাব্বিশতম খন্ড **ছাব্বিশ পারা**

سورة الأحقاف مكية وهي خمس وثلاثون آية وأربع ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ

مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ

اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

সূরা আহকাফ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই এই কিতাব নাজিল হয়েছে।

(৩) আসমান সমূহ, জমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে যথাযথ ভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফেরদেরকে যে সব বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে, তারা সে সম্পর্কে বিমুখ থাকে।

(৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক, পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও তো? অথবা আসমান সমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব রয়েছে কি? যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে ইতিপূর্বের কোন কিতাব বা পূর্ব প্রচলিত কোন জ্ঞানের কথা আমার নিকট উপস্থাপন কর।

সূরা আহকাফ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহকাফ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

এ সূরায় ৪ রুকু, ৩৫ আয়াত, ৬৪৪টি বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

'আহকাফ' ইয়ামনের অর্ন্তগত একটি স্থানের নাম, যেখানে আদ জাতির বসবাস ছিল। 'আহকাফ' শব্দটি 'হকফ' এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ হলো বালুর স্তূপ। আলোচ্য সূরায় আদ জাতির নাফরামানীর শাস্তি স্বরূপ তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেন পৃথিবীর অন্যত্র নাফরমানদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আহকাফ'।[২]

সূরার মূল আলোচ্য বিষয়

(১) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত প্রমাণিত করা, কেননা যতক্ষণ তাঁকে আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে কেউ মেনে নেবেনা, ততক্ষণ পবিত্র

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬১, পৃষ্ঠা-৪২

২। তফসীরে হক্কানী, পারা-২৬, পৃষ্ঠা-২

কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করবেনা। এজন্যে সর্ব প্রথম এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে (হে রসূল!) আপনার প্রতি মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কিতাব নাজিল হওয়াই তাঁর রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি এক, অদ্বিতীয়, আর তিনিই উপাস্য, কেননা পৃথিবীর কোন কিছুই আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, আল্লাহ পাকই তাঁর "কুন" আদেশ দ্বারা সব কিছুকে যথাযথ ভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো বোধ শক্তি সম্পন্ন মানুষের কর্তব্য।[১]

এ সূরার আমল

সূরা আহকাফ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জ্বীন ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আসবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ব্বর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কেয়ামতের দিনের সত্যতার ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার সূচনাতেই পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪২৩.

কোরআনে করীমে এ দু'টি বিষয়ের আলোচনা প্রায়শঃ কাছাকাছিই থাকে, আর এটি উভয় সূরার যোগসূত্র।[১]

তফসীরুল কোরআন

حٰمٓ ①

হা-মীম। এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

এই কিতাব পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নিজস্ব কালাম। যিনি মহা পরাক্রমশালী, যাঁর শক্তির কোন সীমা নেই, যিনি মহাজ্ঞানী, যাঁর জ্ঞানেরও কোন তুলনা নেই, তিনিই নাজিল করেছেন মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআন।

যেহেতু পবিত্র কোরআন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী, আল্লাহ পাকের মহান বাণী, তাই তা সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى

'আসমান সমূহ এবং জমীন আর এ উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্যেই সৃষ্টি করেছি'।

এ আয়াতে কয়েকটি কথার ঘোষণা রয়েছে, সমগ্র বিশ্ব-জগতকে এক আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা, অতএব বিশ্ব সৃষ্টির কোন কিছুই আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এতে প্রতিবাদ রয়েছে নাস্তিকদের ভ্রান্ত ধারণার, যারা বলে যে, সব কিছুই প্রকৃতির দান, এভাবে তারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আসমান সমূহ ও জমীন এবং তার মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিহীন বা অহেতুক নয়; বরং এর পেছনে আল্লাহ পাকের বিরাট হেকমত এবং নিগুঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে।

---

১ । তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৯৬৭

এ উদ্দেশ্য কার দ্বারা সফল হলো, আর কার দ্বারা ব্যর্থ হলো তার বিচার হবে কেয়ামত দিবসে, তাই কেয়ামত অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, যারা কেয়ামতকে বিশ্বাস করেনা, যারা এ জীবনের আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে আলোচ্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

'এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত'।

বিশ্ব-সৃষ্টির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট

আল্লাহ পাক বিশ্ব সৃষ্টিকে চিরদিনের জন্যে সৃষ্টি করেননি, এর একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যেমন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নিখিল বিশ্বেরও সময় নির্ধারিত রয়েছে। সে সময় সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন। যখন সে নির্ধারিত সময় শেষ হবে, তখন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব লোপ পাবে, আর তখন হবে কেয়ামত। অতএব, যারা পৃথিবীকে চিরস্থায়ী মনে করে তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন এ পৃথিবীও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, এরশাদ হয়েছেঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا.............. شَرًّا يَّرَهُ -

'পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং ধরণী তার অভ্যন্তরস্থ ভার বের করে ফেলবে, আর মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কেননা আপনার প্রতিপালকই তাকে এ আদেশ করেছেন, সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কেউ অনু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা দেখতে পাবে, আর কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তা-ও দেখতে পাবে' (সূরা জিলজাল)।

পবিত্র কোরআনের এমনি বহু আয়াতে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ আয়াত সমূহ দ্বারা যে কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা সতর্কতা অবলম্বন করেনি, এটি তাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

'কিন্তু কাফেরদেরকে যে সব বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তারা সে সম্পর্কে বিমুখ থাকে'।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে তৌহীদের দলিল প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে করে কাফেররা তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, এমনিভাবে যুগে যুগে আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করে মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু কাফেররা তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আসমানী হেদায়েত সম্পর্কে বিমুখই রয়ে গেছে। বর্বরতার যুগের ন্যায় এ আধুনিক যুগেও অনেক পথভ্রষ্ট লোক সত্য গ্রহণে অপ্রস্তুত রয়েছে।

বস্তুতঃ বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করা এবং সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর দানের কথা ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দিবা-রাত্রির পরিবর্তন লক্ষ্য করে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা এবং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। আর পৃথিবীর এসব পরিবর্তন দেখে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা নিতান্ত দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ
هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

'(হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাক, পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও তো? অথবা আসমান সমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব রয়েছে কি? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ইতিপূর্বের কোন কিতাব বা পূর্ব প্রচলিত কোন জ্ঞানের কথা আমার নিকট উপস্থাপন কর'।

শেরক অন্যায়, মূর্খতা প্রসূত

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাকই আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, আর এ সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ হেকমত, আর এজন্যেই তিনি

একমাত্র মাবুদ, অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, আর কারো সম্মুখে মাথানত করোনা, কিন্তু তোমরা তোমাদের হাতে বানানো মূর্তি অথবা প্রস্তর কিংবা বৃক্ষের পূজা কর, তোমাদের এ কর্মের পেছনে কোন যুক্তি আছে কি? বলতো, যাদের তোমরা পূজা কর, তারা পৃথিবীর কোন কিছু সৃষ্টি করেছে কি? তাদের এমন কোন কীর্তি মহিমা রয়েছে কি যা তাদের ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে? এমনিভাবে আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব রয়েছে কি? কোথাও তাদের কোন সাক্ষী নেই, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন শক্তিই নেই, জ্ঞানও নেই, তোমরা যে তাদের পূজা কর তারা সে খবরও রাখেনা, তারা বড়ই অসহায়, অক্ষম, বোধহীন, নিতান্ত জড় পদার্থ, অতএব, তাদের পূজা করা, তাদের সম্মুখে মাথানত করা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় বহন করে। কোন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ কখনও এমন অযৌক্তিক, অসুন্দর কাজ করতে পারেনা।

اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমার প্রতি যে মহান বিশ্বগ্রন্থ নাজিল হয়েছে, তা-তো তোমরা মান না, তবে শেরকের বৈধতা এবং সত্যতা সম্পর্কে যদি তোমাদের নিকট পূর্বের কোন আসমানী গ্রন্থ থাকে তবে তা উপস্থাপন কর, অথবা শেরকের সমর্থনে কোন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির কোন উক্তিও যদি থেকে থাকে, তা-ও হাজির কর। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে শেরেকের পক্ষে দলিল পেশ করা তোমাদের কর্তব্য। যদি তোমরা তাতে ব্যর্থ হও তবে এমন অন্যায়. অযৌক্তিক কাজে লিপ্ত থাকা চরম মূর্খতা এবং বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতের اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ কথাটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, শেরকের পক্ষে পূর্ব প্রচলিত কোন জ্ঞানী-গুণীর উক্তি যদি থাকে তবে পেশ কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, শেরকের স্বপক্ষে তোমাদের নিকট কোন দলিল প্রমাণ থাকলে হাজির কর

মসনদে আহমদে রয়েছে, এর অর্থ হলো যদি কোন লিখিত দলিল দস্তাবেজ থাকে, তবে হাজির কর।

হযরত আবুবকর এবনে আইয়াশ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এর অর্থ হলো পূর্বকালের কোন জ্ঞান যদি এর সমর্থনে কারো কাছে থাকে, তবে তা পেশ কর। আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, নিখিল বিশ্বের সব কিছু এক আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, আর

সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যে সব জড় পদার্থকে তোমরা ঠাকুর দেবতা মান এবং আল্লাহ পাকের সাথে শেরক কর, প্রকাশ্যে এর কোন যুক্তি বা দলিল প্রমাণ নেই, তবে তোমাদের নিকট যদি কোন গোপন দলিল প্রমাণ থাকে তবে তা হাজির কর।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো শেরকের স্বপক্ষে যদি তোমাদের নিকট বিশেষ কোন তথ্য থাকে, তবে তা পেশ কর।

এবনে জরীর তাবারী (রঃ)-ও একথাই বলেছেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ব্যাপারে দলিল ব্যতীত কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হয়না। এমনকি, কারো কাশফ কিংবা এলহামের ভিত্তিতেও শরীয়তের কোন বিধান প্রণীত এবং প্রমাণিত হবেনা।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَآءً وَّ
كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧
أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ
لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ
شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٨

তরজমা

(৫) সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে? যে আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবেনা, আর এগুলো তাদের ডাকের খবরও রাখেনা।

(৬) আর যখন কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একাত্রত করা হবে, তখন এগুলো তাদের (পূজারীদের) শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।

(৭) আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, এবং সত্য তাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন কাফেররা তা অস্বীকার করে বলে এ-তো সুস্পষ্ট যাদু।

(৮) তবে কি তারা বলে, তিনি নিজে তা রচনা করেছেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে তোমরা তো আমাকে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে কোনভাবেই রক্ষা করতে পারবেনা। তোমরা যে সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সর্বাধিক অবগত। আমার এবং তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে শেরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে, এ মর্মে যে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যা কিছুকে কাফেররা ডাকে তাদের কোন সৃষ্টি-ক্ষমতা নেই, উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিও তাদের নেই। অতএব এমন অসহায় বস্তুকে উপাস্য মনে করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, শুধু যে বাতিল উপাস্যদের কিছু করার ক্ষমতা নেই তা নয়, বরং পূজারীদের প্রার্থনা শ্রবণের ক্ষমতাও তাদের নেই, তারা কেয়ামত পর্যন্ত পূজারীদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑤

'আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে? যে আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, আর এগুলো তাদের ডাকের খবরও রাখেনা'।

বস্তুতঃ ভক্ত পূজারীদের ডাক শ্রবণের কিংবা জবাব দেয়ার কোন ক্ষমতাই মাটি বা পাথর নির্মিত এ জড় পদার্থের প্রতিমাগুলোর নেই, আর যারা নক্ষত্রপুঞ্জের উপাসনা করে তাদের অবস্থাও তদ্রূপ। নক্ষত্রপুঞ্জ কারো কথা শ্রবণ করে না, তারা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছে, আর যারা হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ওযায়ের (আঃ) বা ফেরেশতাদের উপাসনা করে তারাও নিজেদের ফরিয়াদ শোনাতে পারেনা, কেননা তারা সে সব কথাই শোনেন যা আল্লাহ পাক তাদেরকে শ্রবণের ক্ষমতা দিয়েছেন।

এমনিভাবে তারা সে সব কাজ করতে পারেন যা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তৌফিক দান করেন। ফেরেশতাদের এবং পয়গম্বরগণের যে ক্ষমতা রয়েছে তা আদৌ তাঁদের নিজস্ব নয়, বরং তা আল্লাহ পাকেরই দান, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির বরখেলাপ কখনো কোন কাজ তাঁরা করতে পারেন না, তাই সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহিমময় আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্য কিছুর উপাসনা করার চেয়ে মূর্খতা ও গোমরাহী আর কিছুই নেই, তবুও যে তাদের উপাসনা করে সে সব চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট, সবচেয়ে বড় গোমরাহ।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑥

'আর যখন কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন এগুলো তাদের (পূজারীদের) শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে'।

কেয়ামতের কঠিন দিন হবে মহাসংকট ও বিপদের দিন, এবাদত বন্দেগীর উপকারীতা সেদিনই পাওয়া যাবে আর সাহায্য লাভের প্রয়োজনীয়তাও সেদিনই সর্বাপেক্ষা বেশী হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে, ঐ কথিত উপাস্যরা কেয়ামতের সে দুঃসময় উপাসকদের শত্রু হয়ে পড়বে। তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমরাও উপাসনাকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তারা আমাদের উপাসনা করেনি, মূলতঃ তারা উপাসনা করেছে তাদের কু-প্রবৃত্তির।

যিনি সর্বশ্রোতা, যিনি সর্বদ্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি পরম করুণাময়, তাঁর বন্দেগীর পরিবর্তে যারা জড় পদার্থের পূজা করে তাদের জীবন-সাধনা কখনো সার্থক হতে পারেনা, আর তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা।

وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ

(এবং তাদের এবাদতকে উপাস্যরা অস্বীকার করবে)

এ কথাটির আরো একটি অর্থ হতে পারে তা হলো এই, মুশরেকদের বাতিল উপাস্যরা তাদের এবাদতের কথা অস্বীকার করবে। তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা কখনো মুশরেক ছিলাম না, আমরা বাতিল উপাস্যদের এবাদত করিনি।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এ জড়পদার্থ উপাস্যগুলো কেয়ামতের দিন কিভাবে তাদের পূজারীদেরকে জবাব দেবে? এর জবাবে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এ বাতিল উপাস্যদের সৃষ্টি করে এ ক্ষমতা দেবেন, যেন তারা তাদের পূজারীদের পূজা অর্চনার কথা অস্বীকার করতে পারে।[১]

এজন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে বলেছিলেনঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমাদের নিজেদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছ, এর ভয়াবহ পরিণতি তোমরা কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে, কেননা শেরক ও মূর্তিপূজার কারণে তোমাদের স্থান দোজখে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, আর সে মহা সংকটের মুহূর্তে তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবেনা, যাদের তোমরা উপাসনা করেছিলে তারা তা অস্বীকার করবে এবং পূজারীদের শত্রু হয়ে পড়বে।[২]

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৬
তফসীরে রুহুল মাআয়ানী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭
২। তফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৩

'আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফেররা তা অস্বীকার করে বলে, এ-তো সুস্পষ্ট যাদু'।

এ আয়াতেও আল্লাহ পাক কাফেরদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন কাফেরদের দুর্গতির যে বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে, তাতে তাদের সতর্ক হওয়া ছিল বাঞ্ছনীয়, সত্য পথ গ্রহণই ছিল তাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্য পালনের পরিবর্তে তারা পবিত্র কোরআনকে যাদু বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

আর যখন এ কাফেরদের সম্মুখে আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পঠিত হয়, শোনানো হয় তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, তখন তারা মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ না করে পবিত্র কোরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করার ধৃষ্টতা দেখায় এবং এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং এর চেয়েও মারাত্মক উক্তি তারা করেছে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط

'তবে কি তারা বলে যে, তিনি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজেই তা রচনা করেছেন'?

তাদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ অন্যায় মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে।

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط

(হে রসূল!) আপনি তাদের এ অন্যায় মন্তব্যের জবাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন যে, তোমরা ক্ষণিকের জন্যে ভেবে দেখ, যদি তোমাদের কথা সত্য হয় যে, আমিই পবিত্র কোরআন রচনা করেছি, তবে আল্লাহ পাক কি আমাকে পবিত্র কোরআনের প্রচার এবং দ্বীন ইসলামের তবলীগের এ সুবর্ণ সুযোগ দান করতেন? তিনি কি আমাকে এজন্যে শাস্তি দিতেন না? তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার

শক্তি কি তোমাদের রয়েছে? তোমরা কি আমাকে এমন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে? শুধু তোমাদের কেন, পৃথিবীর কারো কি এমন শক্তি আছে যে, সে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে? এমন অবস্থায় আমি কেন আমার সর্বনাশ ডেকে আনব? আমার নিজের রচনাকে আল্লাহ পাকের রচনা বলে প্রমাণ করবো? পৃথিবীতে কেউ এমনভাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনেনা, অতএব তোমরা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট।

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ

অর্থাৎ তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তোমরা কি সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছ। তোমাদের কোন কথাই আল্লাহ পাকের অজানা নেই, সবই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান। অতএব, আল্লাহ পাকের মহান বাণীকে মিথ্যা বলার এবং আল্লাহ পাকের নবীকে অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখ।

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট'।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ পাককেই আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী মানি। তিনিই বলবেন, কে সত্যপন্থী আর কে বাতিল পন্থী। তিনি আমার সততা এবং সত্যবাদিতার সাক্ষী এবং তোমাদের মিথ্যাবাদিতা এবং নাফরমানীর সাক্ষী। এরপর কাফেরদেরকে তওবা এস্তেগফার করে সত্য গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছেঃ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٨

'আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি তোমাদেরকেও ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন, আর তিনি অতীব দয়াবান, তাঁর অনন্ত অসীম দয়ার কারণেই তিনি মানুষকে ক্ষমা করেন।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

তরজমা

(৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি কোন নতুন রসূল নই, আমার এবং তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে তা-ও আমি জানি না। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি, আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র।

(১০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অস্বীকার করে থাক, বিশেষতঃ বণী ইসরাঈলের একজন সাক্ষীও যখন এর উপর স্বাক্ষ্য দিয়ে থাকে এবং বিশ্বাস করে থাকে, আর তোমরা ঔদ্ধত্ব প্রকাশ কর, এমন অবস্থায় তোমাদের পরিণাম কি হবে? নিশ্চয় আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না।

(১১) আর কাফেররা মোমেনদের সম্পর্কে বলে, যদি এ কোরআন উত্তম হতো, তবে এসব লোকেরা এর প্রতি (ঈমান আনয়নে) আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতোনা। আর যখন তারা কোরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা একথাই বলবে যে, এটি অনেক পুরাতন মিথ্যা।

তফসীরুল কোরআন

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নতুন নতুন মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের দাবী করতো, কখনো তাঁর নিকট গায়েবী খবর জানার আবদার করতো, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

আমি কোন নতুন রসূল নই

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি কোন নতুন রসূল নই তথা পৃথিবীতে আমিই প্রথম রসূল নই, আমার পূর্বেও যুগে যুগে বহু নবী রসূল আগমন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি সবশেষে আগমন করেছি, অতএব তোমরা কেন আমার রেসালতকে অস্বীকার কর? যেভাবে পূর্বকালের নবী রসূলগণ মানুষকে শেরক পরিহার করে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমিও তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনেরই আহ্বান জানাচ্ছি। এতদ্ব্যতীত, তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে বলতো, তিনি অন্য মানুষের ন্যায় পানাহার করেন, এমনকি হাট-বাজারেও যাতায়াত করেন এবং তাঁর অনুসারীগণ হলেন দরিদ্র, তিনি যদি আল্লাহর রসূলই হবেন, তবে এ অবস্থা কেন? তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি কোন নতুন রসূল নই, ইতিপূর্বে যে সব নবী রসূল আগমন করেছেন, তাঁরাও পানাহার করতেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করতেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে দরিদ্র লোকেরাই তাঁদের অনুসারী হয়েছেন।

অতএব, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যে সব কথা বলছে, তা তাঁর নবুওয়তের শানের খেলাফ নয়। নবী সর্বদা মানুষই হয়ে থাকেন, জ্বীনও নয় ফেরেশতাও নয়, তাই পানাহার কিংবা জীবনের অন্যান্য দায়িত্ব পালন নবীর জন্যে দোষণীয় কিছু নয়।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৭।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) "আমি কোন নতুন রসূল নই" কথাটির অর্থ বলেছেন, "আমি প্রথম রসূল নই"। মুজাহেদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন। আর কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমার পূর্বেও নবী রসূলগণ আগমন করেছেন।[১]

وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ

'আর আমি জানিনা, আমার সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে এবং আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে তা আমি জানিনা। এরপর যখন সূরায়ে ফাতহের এ আয়াত-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(যেন আল্লাহ পাক আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ মাফ করেন)

নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ সুসংবাদ আপনার জন্যে মোবারক হোক, আল্লাহ্ পাক আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করবেন তা-তো ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কি অবস্থা হবে তা-তো জানা গেলনা। এরপর নাজিল হলো-

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -الاية

'তা এজন্যে যে, তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্ন-দেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং আল্লাহ পাক তাদের গুণাহ সমূহ মাফ করে দেবেন, আর এটিই আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে মহা সাফল্য' (সূরা ফাতহ)। আর অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছে যেমনঃ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا (সূরা আহযাব)

'(হে রসূল!) মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রয়েছে মহা প্রতিদান'।

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৫

মোমেনদের জন্যে মহা প্রতিদানের সুসংবাদ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, মোমেনদের জন্যে রয়েছে বিরাট এবং বিশেষ প্রতিদান।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আনাস (রাঃ), তফসীরকার কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং একরামা (রঃ)। তাঁরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিদয়ার সন্ধির ঘটনার পূর্বে। কিন্তু এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এ ঘোষণা করা হয় যে, তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে, তখন এ আয়াত মনসুখ হয়।

তবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতকে মনুসুখ মনে করার কোন কারণ নেই, কেননা পবিত্র কোরআনের প্রতিটি সূরা তা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হোক কিংবা মদীনা মোনাওয়ারায়, তাতে দু'টি বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে, মোমেনদের জন্যে মাগফেরাত এবং জান্নাত, আর কাফেরদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি।[১]

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অথ হলো, আল্লাহ পাক এরপর আমাকে কি আদেশ দেবেন এবং কোন্ বিষয় থেকে আমাকে বিরত রাখবেন তা আমি জানিনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম হাসান বসরী (রঃ)-এর আরো একটি মত হলো, আখেরাতে পরিণতি কি হবে তা তো আমার জানা আছে, অর্থাৎ আমার ও আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার জীবনে আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে তা আমি জানিনা। পূর্বকালের কোন কোন নবীকে হত্যা করা হয়েছে, আমাকেও কি হত্যা করা হবে? অথবা এ জীবনের স্বাভাবিক অবসান ঘটবে? তা আমি জানি না এবং তোমাদের ব্যাপারে কি হবে তা-ও আমি জানি না। পূর্বকালের নাফরমানদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে, কারো প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছে, আর কোন জাতিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়েছে, আর কাউকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৩৩
তফসীরে খাজারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৫

হয়েছে, তোমরাও তাদের ন্যায়ই নাফরমানী করছো, অতএব তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে এবং কি শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হবে তা আমি জানি না।

এ পর্যায়ে মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, হযরত খারেজা এবনে জায়েদের সূত্রে বর্ণিত, হযরত উম্মে আলা আনসারীয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, মুসলমানগণ যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে "মোয়াখাত" বা ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন, মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে একজন করে মোহাজেরকে আপন ভ্রাতা হিসেবে বাড়ীতে নিয়ে যান। আমাদের ভাগে এসেছিলেন হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)। কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হলেন এবং তাঁর এন্তেকাল হয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেন, তখন আমি বললাম, হে আবুস সায়েব! (হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)-এর ডাক নাম) আপনার প্রতি আল্লাহ্‌পাকের রহমত হোক, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি কিভাবে জান যে, আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি আরজ করলাম, আল্লাহর শপথ! আমি তা জানিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার মৃত্যু এসেছে, আমি তার সম্পর্কে কল্যাণের আশা করি। আর আমি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে, আর একথাও জানি না যে, তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে।

হযরত উম্মে আলা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমি আর কারো সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতাম না। কিছুদিন পর আমি হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)- কে স্বপ্নে দেখি যে, তাঁর কাছে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। আমি এ স্বপ্নের কথা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করি, তখন তিনি বললেন, এটি হলো তার নেক আমল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, এ হাদীসের তাৎপর্য হলো, কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে তার নাজাত বা ধ্বংসের ব্যাপারে শেষ কথা বলা বৈধ নয়; কেননা এর দ্বারা এলমে গায়েবের দাবী করা হয়, আর আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত এলমে গায়েব আর কারোই নেই। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির প্রকাশ্য

অবস্থা ভাল থাকে তথা ঈমান ও নেক আমল, তাকওয়া-পরহেজগারী, এবাদত বন্দেগী ঠিক থাকে, তবে তার সম্পর্কে ভাল আশা করা যেতে পারে।

পূর্বোল্লেখিত হাদীসের তাৎপর্য হলো, যদিও আমি আল্লাহর রসূল এবং যদিও আল্লাহ পাক আমাকে পূর্বাপর সমস্ত বিষয়ের এলম দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও আমি বিস্তারিত ভাবে জানি না যে, আমার এবং তোমাদের বিশেষ বিশেষ আমলের কি পরিণতি হবে? দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে কি কি ঘটবে, বিস্তারিত ভাবে তা আমার জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের একটি দল আলোচ্য আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যা করেছেন, "আমি জানি না দুনিয়াতে আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে"।

আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকবেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে, আর কাফেররা থাকবে দোজখে।

প্রিয়নবী (দঃ) স্বপ্ন দেখলেন

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম অত্যাচার করতে থাকলো ও জুলুমের সকল সীমা অতিক্রান্ত হলো, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেনঃ এমন একটি স্থান যেখানে খেজুরের গাছ রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে হিজরত করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর নিকট থেকে স্বপ্নের এ বিবরণ শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি হিজরত করে কখন সেখানে তশরীফ নিয়ে যাবেন? এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন, সে সময় এ আয়াতাংশ নাজিল হয়।

وَمَا أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ

অর্থাৎ আমি জানি না কত দিন এখানে থাকবো এবং কবে এখান থেকে হিজরত করে যাবো যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি জানি না দুনিয়াতে আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেশত্যাগে

বাধ্য করা হয়েছে, আমাকেও কি সেভাবে দেশ ত্যাগ করতে হবে? অথবা যেভাবে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে, সেভাবে আমার সাথেও কি অনুরূপ ব্যবহার করা হবে তা আমি জানি না। হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে কি আমার সাথে দেশত্যাগ করতে হবে অথবা তোমাদেরকেও কি শহীদ করা হবে তা-ও আমি জানি না, আর হে কাফেররা! পূর্বকালের বিভিন্ন যুগে কাফেরদেরকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে সেভাবে তোমাদেরকে কি আজাব দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হবে? তা আমি জানি না, তখন আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সুসংবাদ দিলেনঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

'তিনিই আল্লাহ পাক যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সত্য দ্বীনকে সকল বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন'। আর উম্মতের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

'(হে রসূল!) যতদিন আপনি তাদের মধ্যে আছেন, ততদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে আজাব দেবেন না'।

এস্তেগফার আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

'আর এ উম্মতকে আল্লাহ পাক শাস্তি দেবেন না, যখন তারা এস্তেগফার করতে থাকে'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এ উম্মতের প্রতি আজাব আসেনি। এরপর যদি এ উম্মত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নিজেদের গুণাহের জন্য তওবা করতে থাকে, ততদিন এ উম্মতকে আল্লাহ পাক আজাব দেবেন না, এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার হযরত সুদ্দী (রহঃ)।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩

'আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশ আসে, আমি শুধু তাই মেনে চলবো।

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গায়েবী কথা জানতে চেয়েছিলো, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে কোন ওহী নাজিল করেননি, তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে যে, আল্লাহ পাক যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেন তাই আমি জানিয়ে দেই, এর বেশী কিছু বলতে পারি না। অথবা এর অর্থ হলো যেহেতু কাফেরদের চরম নির্যাতনে অস্থির হয়ে মুসলমানগণ জানতে চাইতেন, হিজরত কবে হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হে রসূল! আপনি বলুন, কবে হিজরত করতে হবে তা আমি জানিনা, আমি তো আল্লাহ পাকের ওহীর মাধ্যমে যা জানি তাই বলি, হিজরতের ব্যাপারে এখনো কোরআনে করীমের কোন আয়াত নাজিল হয়নি, যখন এ সম্পর্কে কোন প্রত্যাদেশ আসবে তখনই জানা যাবে কবে হিজরত হবে।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমার নিকট গায়েবী এলম নেই, আমি গায়েব জানার দাবীদারও নই, আমি শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশেরই অনুসরণ করি।[১]

وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

আমি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী

'আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র' অর্থাৎ আমার কাজ হলো সুস্পষ্ট ভাষায় সকল মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করা, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, কুফরী নাফরমানী এবং শেরক থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক চলা এবং আল্লাহ পাকের বিধানের বাস্তবায়নে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৩৪-৩৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠ-১০
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৬
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১০০৫

সচেষ্ট হওয়া, তোমরা পবিত্র কোরআনকে মান বা না মান, আমি পবিত্র কোরআন মোতাবেক চলতে থাকবো, এ সম্পর্কে সকলের প্রতি আহবান অব্যাহত রাখবো।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অস্বীকার করে থাক, বিশেষতঃ যখন বণী ইসরাঈলের একজন সাক্ষীও এর উপর সাক্ষ্য দিয়ে থাকে এবং বিশ্বাস করে থাকে, আর তোমরা ঔদ্ধত্ব প্রকাশ কর, এমন অবস্থায় তোমাদের পরিণাম কি হবে'?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময় তদানীন্তন পৃথিবীতে ইহুদী জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, জ্ঞানে-গুণে, পান্ডিত্যে তারা অগ্রগামী ছিল, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো, এজন্যে মক্কার মোশরেকরা ইহুদী আলেমদের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যদি ইহুদী আলেমরা তাঁর সত্যতা অস্বীকার করে, তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বলে বেড়াবে যে, আমরাই যে শুধু তাঁর বিরোধিতা করছি তা নয়; বরং যাদের কাছে আসমানী গ্রন্থ তৌরাত রয়েছে, তারাও তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে।

বস্তুতঃ মোশরেকদের এ চক্রান্ত পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ইহুদী আলেমরা মোশরেকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে তাই নয়; বরং তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারও উল্লেখ করেছে।

আর আলোচ্য আয়াতে একথাই বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হে মক্কাবাসী! তোমরা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করছো, অথচ এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, বণী ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু যে তাঁর সত্যতার সাক্ষী দিয়েছে তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে, অথচ তোমরা এখনো ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করছো, এমন অবস্থায় তোমাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে তা একটু ভেবে দেখ।

আলোচ্য আয়াতে বণী ইসরাঈলের যে সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ), এ মত পোষণ করেছেন অধিকাংশ তফসীরকারগণ- হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), এবনে সিরিন (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং একরামা (রঃ)।

নাজাত লাভের পথ

এ পর্যায়ে তেবরাণী এবং হাকেম হযরত আওফ এবনে মালেক আল আশজায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে বাইরে যেতে লাগলেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তিনি ইহুদীদের গির্জায় প্রবেশ করলেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন, তাই সেদিন আমাদের উপস্থিতি তাদের মনপূতঃ হয়নি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করে তাদেরকে বললেন, হে ইহুদীদের দল! আমাকে এমন বার জন লোক দেখাও, যারা স্বাক্ষ্য দেয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল)। যদি তারা স্বাক্ষ্য দেয় তবে আল্লাহ পাক আসমানের নীচে যত ইহুদী রয়েছে তাদের সকলকে তাঁর গজব থেকে নাজাত দান করবেন। একথা শ্রবণ করে ইহুদীরা নীরব হয়ে গেল, তিনি দ্বিতীয়বার একথাটি বললেন, তখনও কেউ জবাব দিলনা, তৃতীয় বার তিনি একথা বললেন, তখনও তারা নীরবতা পালন করলো, তখন তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন, পেছন থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে বললো, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, একথা বলে সে অগ্রসর হলো এবং বললো, হে ইহুদীদের দল! তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে কর?

ইহুদীরা বললো, আল্লাহর শপথ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞানী তোমার চেয়ে বড় কেউ নেই। আর তোমার পূর্বে তোমার পিতার চেয়ে বড় আলেম কেউ ছিলনা, আর তোমার পিতার পূর্বে তোমার পিতামহের চেয়ে বড় আলেম কেউ ছিলনা।

তখন ঐ ব্যক্তি বললো, আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি, "ইনিই সেই নবী! যাঁর আলোচনা তোমরা দেখতে পাও তৌরাতে"।

তখন ইহুদীরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করলো এবং বললো, তুমি মিথ্যাবাদী, এরপর তারা তাঁর সম্পর্কে আরো মন্দ কথা বললো, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হলো।

এ বর্ণনায় যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি একথা শ্রবণ করিনি যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ব্যতীত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে কোন চলমান ব্যক্তি সম্পর্কে (জীবিত) বলেছেন যে, সে জান্নাতবাসীদের অর্ন্তভূক্ত। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতাংশ-

وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ

নাজিল হয়েছে। এবনে জরীর বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) নিজেও বলেছেন, এ আয়াতাংশ আমার সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এবং ইমাম বায়হাকী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত আরেকখানি হাদীস সংকলন করেছেন, বায়হাকী হযরত মুসা এবনে আকাবা (রাঃ) এবং জুহরী (রঃ)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর ইমাম আহমদ (রাঃ) স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা শ্রবণ করেছি এবং তাঁর গুণাবলী, নাম, আকৃতি এবং আগমনকারী নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তখন আমি উপলব্ধি করেছি যে, তিনিই সত্য নবী এবং সর্বশেষ নবী। কিন্তু তখন আমি এ সম্পর্কে নীরব রয়েছি, নিজের মনে তা গোপন করেছি, এরপর যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে মোনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন তিনি বণী আমর এবনে আওফ এর মহল্লায় অবস্থান করেন, তখন এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ দিল, আমি একটি খেজুর বৃক্ষের উপর আরোহণ করলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস ঐ বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন,

আমি তাঁর শুভাগমনের সংবাদ শ্রবণ মাত্রই উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বললাম, আমার ফুফু আমার তকবীরের আওয়াজ শুনে বললেন, যদি আজ হযরত মুসা এবনে এমরানের আগমনের খবর শ্রবণ করতে তবে এত বেশী আনন্দ প্রকাশ করতে না। আমি আমার ফুফুকে বললাম, আল্লাহর শপথ! ইনি মুসা এবনে এমরানের ভাই, যে দ্বীন নিয়ে মুসা এবনে এমরানকে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে দ্বীন নিয়েই ইনি প্রেরিত হয়েছেন। ফুফু বললেন, এসব তো শোনা কথা।

এরপর আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট রওয়ানা হয়ে গেলাম। তাঁর চেহারা মোবারক দেখেই আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতেই পারেনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বপ্রথম যে কথাটি শ্রবণ করেছেন, তা হলোঃ হে লোক সকল! দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, পর মুখাপেক্ষী লোকদেরকে আহার করাও, সালামের প্রচলন কর, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ককে জুড়ে রাখ, রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, তখন তোমরা নামাজ পড় (এই আমল করে) জান্নাতে প্রবেশ কর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, আমি আপনার নিকট তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, একথাগুলোর এলম নবী ব্যতীত কারো কাছে নেই। (১) কেয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত কি হবে? (২) জান্নাতবাসীদেরকে সর্ব প্রথম কি খাবার সরবরাহ করা হবে? (৩) সন্তান পিতা বা মাতার আকৃতি কেন লাভ করে আর চন্দ্রের মধ্যে কাল দাগ কেন?

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে এখনই জীব্রাঈল (আঃ) এসে বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বললেন, জীব্রাঈল এসে আপনাকে বলেছেন? সে তো ইহুদীদের দুশমন ফেরেশ্‌তা। তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ (১) কেয়ামতের প্রথম আলামত হবে একটি অগ্নি, যা প্রাচ্য থেকে বের হবে, আর মানুষকে প্রতীচ্যের দিকে নিয়ে যাবে। (২) জান্নাতবাসীদেরকে সর্বপ্রথম যে খাবার সরবরাহ করা হবে তা হবে মাছের কলিজি, (৩) পিতা-মাতার মধ্যে যে প্রাধান্য বিস্তার করে সন্তান তারই আকৃতি ধারণ করে আর চন্দ্রের কাল দাগের কারণ হলো, চন্দ্র সূর্য উভয়ই অত্যন্ত চমকদার ছিল। আল্লাহ পাক চন্দ্রের ঐ অংশটুকুর (কাল দাগ) চমক নিস্প্রভ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ

'আল্লাহ পাক এ স্থানের চমক নিস্প্রভ করে দিয়েছেন, আর এ কারণেই চন্দ্রে কাল দাগ হয়েছে'।

একথা শ্রবণ মাত্রই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলে উঠলেনঃ

اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد الرسول الله

আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। এরপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পরিবারের সকল লোককে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি সে সময় নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন।

ইহুদীদের ঘৃণ্য চরিত্র

কিছুদিন পর তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ইহুদীরা জানে আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার পুত্র, আর তারা একথাও জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং তাদের সবচেয়ে বড় আলেমের পুত্র, কিন্তু ইহুদীরা অত্যন্ত বড় মিথ্যাবাদী। আপনি আমার সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি আপনার জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা আমার মুসলমান হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তারা আমার প্রতি মিথ্যাবাদিতার অপবাদ দেবে এবং আমার এমন দোষের অনুসন্ধান করবে, যা আমার মধ্যে নেই। এজন্যে আমি চাই, আপনি আমাকে নিজের গৃহে কোথাও আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ দিন, এরপর তাদেরকে ডেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-কে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আত্মগোপনের অনুমতি দিলেন। এরপর ইহুদীদেরকে তলব করলে তারা হাজির হলো, তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন, হে ইহুদীর দল! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তোমরা নিঃসন্দেহে এ সম্পর্কে

অবগত আছ যে, আমি আল্লাহ পাকের রসূল, আমি সত্য দ্বীন এবং শরীয়ত নিয়ে এসেছি, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। ইহুদীরা বললো, আমরা আপনার দ্বীনকে হক্ব মনে করিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আবদুল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? ইহুদীরা বললো, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম ব্যক্তির পুত্র, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বড় আলেমের পুত্র। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম কবুল করে, তবে কি তোমরা মুসলমান হবে? তারা বললো, আল্লাহ পাক তাকে রক্ষা করুক, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-কে ডাকলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলেন এবং বললেন, "আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল"। হে ইহুদীর দল! আল্লাহ পাককে ভয় কর, যে দ্বীন তোমাদের নিকট এসেছে তা কবুল কর, আল্লাহর শপথ, তোমরা নিঃসন্দেহে অবগত রয়েছ যে, ইনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল, তোমাদের নিকট যে তৌরাত রয়েছে, তাতে তাঁর নাম এবং গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে, এজন্যে আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, তিনি আল্লাহ পাকের রসূল। আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, আমি তাঁর সত্যায়ন করি এবং আমি তাঁকে চিনি।

ইহুদীরা বললো, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ এবং সবচেয়ে মন্দ লোকের পুত্র! এভাবে ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)-এর সমালোচনা করতে থাকে। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি পূর্বেই আরজ করেছি, এরা অত্যন্ত মিথ্যুক অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং মন্দ লোক। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) নিজের এবং তাঁর পরিবারবর্গের মুসলমান হবার কথা ঘোষণা করলেন। তাঁর ফুফু খালেদা বিনতে হারেসও ইসলাম গ্রহণ করেন।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ আয়াতে কাফের মোশরেকদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করার আহবান জানিয়ে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস কর।

বণী ইসরাঈলের গুণী-জ্ঞানী লোকেরাও পবিত্র কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম এবং গুণাবলীর যে বিবরণ রয়েছে, তার বর্ণনা দেয়, এতদসত্ত্বেও জেদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে তারা পবিত্র কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেনা, এমন অবস্থায় তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, তোমাদের পরিণতি হবে কত শোচনীয়, তোমাদের আর নিস্তার নেই, কেননা আল্লাহ পাকের বিধান হলো এই, যারা হেদায়েত চায়না, আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেন না, ফলে তারা হেদায়েত থেকে চির বঞ্চিত হয়। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝١٠

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না'।

হেদায়েত নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের নেয়ামত, যারা এ নেয়ামত গ্রহণ করে তারাই ভাগ্যবান হয়। পক্ষান্তরে, যারা হেদায়েতের নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করা হয়না।

তফসীরকার মসরুক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়নি, তিনি তাঁর এ মতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলেছেন, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে, আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন হিজরতের পর মদীনা মোনাওয়ারায়। মূলতঃ এ সূরা নাজিল হয়েছে কোরায়েশদের সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে বিতর্ক হয়েছিল সে সম্পর্কে, আর (আলোচ্য) আয়াতে বণী ইসরাঈলের যে সাক্ষীর উল্লেখ রয়েছে, তিনি হলেন হযরত মুসা (আঃ), আর مثله শব্দ দ্বারা তৌরাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছে, আর হযরত মুসা (আঃ) তাঁর স্বপক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন।[১]

তফসীরকার মসরুকের (রঃ) এ বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন কালবী (রঃ)। তিনি বলেছেন, এ সূরা নিঃসন্দেহে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতখানি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৪১
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০

মদীনা শরীফে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যেন এ সূরার আলোচ্য আয়াত এ স্থানে রাখা হয়।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে বণী ইসরাঈলের একজন সাক্ষীর যে উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ বিশেষ কোন সাক্ষীর স্বাক্ষ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো তৌরাতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা রয়েছে, তাঁর নাম, গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাঁর শুভাগমণের সুসংবাদ রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি এমন কোন ব্যক্তি যে তৌরাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, সে যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা বলে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে, এতদসত্বেও তোমরা তাঁকে অবিশ্বাস কর, পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার কর, তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট এবং জালেম, এভাবে তোমরা নিজেদের প্রতিই জুলুম কর। আর আল্লাহ্ পাক এমন জালেমদেরকে হেদায়েত নসীব করেন না।[২]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ط

'আর কাফেররা মোমেনদের সম্পর্কে বলে, যদি এ কোরআন উত্তম হতো, তবে এসব লোকেরা এর প্রতি (ঈমান আনয়নে) আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতনা'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখার যে আহবান জানানো হয়েছিল, তার কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর খুঁজে না পেয়ে কাফের মোশরেকেরা বললো, পবিত্র কোরআন বা দ্বীন ইসলাম যদি উত্তম কিছু হতো, তবে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা কি পেছনে পড়ে থাকতো আর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, বিপদগ্রস্ত লোকেরাই এ ধর্ম গ্রহণে অগ্রবর্তী হতো? এমন তো হতে পারেনা।

শানে নজুল

এবনে জরীর তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন মোশরেক বলেছিল, আমরা সমাজে সম্মানের অধিকারী, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের চেয়ে আমরা ভাল অবস্থায় রয়েছি, যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হতো, তবে আমরাই তাদের পূর্বে তা গ্রহণ করতাম, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০

এবনুল মুনজের আওন এবনে আবি শাদ্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর জনীন নাম্নী একটি বাঁদী ছিল, সে তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে ঈমান এনেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতেন। তখন কাফেররা বলতো, যদি ইসলাম কোন উত্তম বস্তু হতো, তবে জনীন নাম্নী বাঁদী আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতোনা। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

এবনে সা'দ যাহ্যাক এবং হাসান বসরীর (রঃ) সূত্রে এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ⑪

'আর যখন তারা কোরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা একথাই বলে যে, এটি অনেক পুরাতন মিথ্যা'।

কাফেরদের এ উক্তির মূল কারণ হলো, তারা হেদায়েতের সৌভাগ্য লাভ করেনি, এটি তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা হেদায়েত থেকে মাহরুম হয়েছে। আর এজন্যেই তারা কোরআনে করীমকে পুরাতন মিথ্যা বলেছে, অর্থাৎ পূর্বকালে যেভাবে মিথ্যা দাবী করা হতো, এটিও তেমনি মিথ্যা দাবী।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে আরবের কাফের এবং ইহুদীরা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলো, যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হতো, তবে সকলের আগে আমরাই তা গ্রহণ করতাম। আর যেহেতু আমরা এ ধর্ম গ্রহণ করিনি, এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ
كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ
اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

তরজমা

(১২) আর এই কোরআনের পূর্বে মুসার কিতাবও ছিল পথের দিশারী ও রহমত, আর এটি এমন এক গ্রন্থ যা তৌরাতের সত্যতা প্রমাণ করে। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, যেন তা পাপীষ্ঠদেরকে সতর্ক করে এবং নেককারদেরকে সুসংবাদ দেয়।

(১৩) নিশ্চয় যারা বলেছে, আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতিপালক, এরপর এ বিশ্বাসের উপর অবিচল রয়েছে, (আখেরাতে) তাদের কোন ভয় নেই, তাদেরকে কোন দুঃখও করতে হবে না।

(১৪) তারাই সে সব লোক, যারা হবে জান্নাতবাসী, তাদের কর্মফল স্বরূপ তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

(১৫) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার মাতা তাকে বড় কষ্ট করে গর্ভ ধারণ করেছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভে অবস্থান এবং স্তন্য ত্যাগের সময় ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে,

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দান কর, যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর আমাকে তোমার মর্জি মোতাবেক আমল করার সৌভাগ্য দান কর। আর আমাকে নেককার সন্তান দান কর, আমি তোমার দরবারে তওবা করছি, আর নিশ্চয় আমি তোমার অনুগত বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা পবিত্র কোরআনকে পুরাতন মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তাদের এ অসত্য উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۗ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ⑫

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তোমাদের এ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অলীক, পবিত্র কোরআন আদৌ পুরাতন মিথ্যা নয়; বরং পুরাতন সত্য এবং চিরসত্য, কেননা ইতিপূর্বে হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাজিল হয়েছিল, তৌরাতে যে সব মৌলিক সত্য ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন তৌহীদ এবং আখেরাত, কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি। পবিত্র কোরআনেও সে মৌলিক সত্যগুলোরই ঘোষণা রয়েছে। তৌরাত ছিল মানব জাতির জন্যে আলোক দিশারী এবং যারা তৌরাত মেনে চলেছে, তা ছিল তাদের জন্যে রহমত। তৌরাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ ছিল, আজ তাঁর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর প্রতিই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন তৌরাতের সত্যতা ঘোষণা করে, তৌরাতের সত্যতায় তোমরা বিশ্বাস কর, অতএব পবিত্র কোরআনের প্রতিও তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, কেননা এটি পুরাতন সত্য। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে যারা পাপীষ্ঠ, নিজেদের প্রতি যারা জুলুম করে তাদেরকে পবিত্র কোরআন ভয় প্রদর্শন করে। আর যারা পবিত্র কোরআনকে মানে, সেই নেককার লোকদের জন্যে পবিত্র কোরআন চিরশান্তি, চির নাজাতের সুসংবাদ বহন করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ⑬

'নিশ্চয় যারা স্বীকার করেছে আল্লাহ পাকই আমাদের প্রতিপালক, এরপর এ বিশ্বাসের উপর অবিচল রয়েছে, (আখেরাতে) তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখও করতে হবেনা'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। এরপর যারা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছে, তাদের সে সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে প্রকৃত মোমেনদের চিরশান্তি লাভের সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ যারা এ সত্যে বিশ্বাস করেছে এবং এ সত্য প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ পাকই আমাদের প্রতিপালক, আর এ বিশ্বাসের উপর অটল অবিচল রয়েছে, আখেরাতে তাদের কোন ভয় থাকবেনা, তাদের কোন দুঃখও হবেনা।

মূলতঃ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তথা ঈমান আনয়ন করা এ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু এ সম্পদ সংরক্ষণ করা সহজ নয়, ইসলামের প্রথম যুগে যারাই ঈমান এনেছেন, তাদেরকে অহরহ অকথ্য নির্যাতন সইতে হয়েছে। বর্তমান যুগেও শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেককে উৎপীড়িত হতে হচ্ছে। যারা শত উৎপীড়ন নির্যাতন সহ্য করেও ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে, তাদের জন্যেই আলোচ্য আয়াতে চিরসুখী হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, লোভ-লালসা ঈমান বিরোধী কাজের জন্যে মানুষকে প্ররোচিত করে, এসব ক্ষেত্রে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং ঈমান বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকা বিরাট মহৎ কাজ, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয়তঃ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যারা ঈমানের দাবী মোতাবেক জীবন যাপন করতে চায়, তারা ক্ষেত্র বিশেষে ঈমান বিরোধীদের বিদ্রুপের শিকার হয়। যারা এসব ক্ষেত্রে ঈমানের দাবীর প্রতি অটল অবিচল থাকে, পাছে লোকে কি বলবে, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনা, বরং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি বলেন, তার উপর থাকে তাদের নজর এবং কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, এজন্যে থাকে তাদের দুশ্চিন্তা, তাই তারা সর্বদা ঈমানে অটল অবিচল থাকে, তাদের জন্যেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে চিরশান্তি লাভের সুসংবাদ।

আলোচ্য আয়াতখানির কিছু অংশ সূরা হা-মীম আস সজদায় স্থান পেয়েছে।[১]

১। এ আয়াতের বিস্তারিত তফসীর পেতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২৬১-৬৪

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

'তারাই সেসব লোক, যারা হবে জান্নাতবাসী, তাদের কর্মফল স্বরূপ তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে'।

অর্থাৎ যারা ঈমানদার হবে এবং এর উপর অটল অবিচল থাকবে, তাদের নেক আমলের শুভ পরিণতি স্বরূপ তারা জান্নাতবাসী হবে, আর জান্নাতে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে দয়া করে তাদের নেক আমলের শুভ পরিণতি দান করবেন, তাঁর রহমতেই তিনি বন্দার নেক আমল কবুল করবেন। তাই মৃত্যুর পর তাদের কোন ভয় থাকবেনা, আর আখেরাতে আল্লাহ পাক তাদেরকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করবেন, তা দেখার পর দুনিয়াতে যা কিছু সে ফেলে যাবে, তার জন্যে কোন দুঃখও থাকবেনা।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারাই সে সব লোক, যারা হবে জান্নাতবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, তাদের কর্মের শুভ পরিণতি স্বরূপ। আল্লাহ পাক তাদেরকে এ চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করবেন। কখনো মৃত্যু এসে তাদেরকে জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেনা। এমনিভাবে কখনো তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা। বলাবাহুল্য, তারা তাদের সমগ্র জীবনের সত্য-সাধনার বিনিময়েই এ চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভ করবে।

এ জীবনে মানুষকে সত্য সাধনায় তথা নেক আমলে রত থাকতে হয়, এ নেক আমল দু'প্রকার, (১) হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ব, (২) হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক। বন্দার হক্কের মধ্যে সর্ব প্রথম যে হক্ব অবশ্যই আদায় করতে হয়, তা হলো পিতা-মাতার হক। তাই পরবর্তী আয়াতে পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি. তার মাতা তাকে বড় কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করে তাকে *প্রসব* করেছে। তার গর্ভে অবস্থান এবং স্তন্য ত্যাগের সময় ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দান কর, যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর আমাকে তোমার মর্জি মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান কর। আর আমাকে নেককার সন্তান দান কর, আমি তোমার দরবারে তওবা করছি আর নিশ্চয় আমি তোমার অনুগত বন্দাদের অর্ন্তভুক্ত।

পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের তাগিদ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে কেননা তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ব্যতীত এমন কোন মোহাজের ছিলেন না, যাঁর পিতা-মাতা মুসলমান হয়েছিলেন। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আয়াত বিশেষ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) অথবা হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বা যাঁর সম্পর্কেই নাজিল হোক না কেন, আয়াতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রযোজ্য, আল্লাহ পাকের এ নির্দেশ সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে যেন তারা প্রত্যেকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পিতা ছিলেন হযরত আবু কাহাফা ওসমান এবনে ওসব, আর মাতার নাম ছিল উম্মুল খায়ের বিনতুল খায়ের এবনে সাখার এবনে ওমর। আলোচ্য আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করার তাগিদের পাশাপাশি এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে পিতা-মাতার মধ্যে মাতার হক্ব অধিকতর।

হাদীস শরীফে পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেনঃ উত্তম আমল *কোনটি*? যা আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। সাহাবী আরজ করলেন, তারপর? তিনি এরশাদ করলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোন্ আমল? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের রাহে রাহে জেহাদ করা। বর্ণিত আছে, একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট (নফল) জেহাদের অনুমতি চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? সাহাবী আরজ করলেন, জ্বী হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাদের খেদমতেই জেহাদের সওয়াব নিহিত রয়েছে।[১]

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

'তার মাতা তাকে বড় কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভে অবস্থান এবং স্তন্য ত্যাগের সময় ত্রিশ মাস'।

আলোচ্য আয়াতে সন্তানের কারণে মায়ের যে অসামান্য কষ্ট হয়, তার বিবরণ রয়েছে। গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবকালীন বেদনা এবং দুগ্ধ পান করানোর কষ্ট- এ সমস্ত কিছুর কোন তুলনা নেই। মায়েদেরকে আল্লাহ পাক এসব কষ্ট সইবার তৌফিক দেন বলেই তারা তা সইতে পারেন। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত, সন্তানের কষ্ট যেন না হয়, সন্তান যেন আরাম পায়, সেজন্যে মায়েরা তাদের সকল আরাম- আনন্দ সন্তানের জন্যে উৎসর্গ করে। পৃথিবীতে এমন কষ্ট নজিরবিহীন। এর পাশাপাশি পিতার কষ্টও অসাধারণ। দেহের রক্ত পানি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পিতা যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, তা ব্যয় করে সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনে। আর এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে সন্তান মাত্রকে তার পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের তাগিদ করা হয়েছে। জন্মের পূর্ব থেকে জন্মলগ্নে এবং জন্মের পর মাতা-পিতাকে যে অতুলনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়, ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

১। পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৩৫-৪৫

'আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা, শুধু তাঁরই বন্দেগী করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে'।

এ আয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই আসে, তবে তার আগমনের উসিলা হয় পিতা-মাতা।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ অহরহ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে থাকে, অথচ মানুষের কাছে আল্লাহ্ পাক তার নেয়ামতে সমূহের বিনিময় কিছুই চান না, ঠিক এমনিভাবে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির জন্যে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে, অথচ এর জন্যে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির কাছে কিছুই চায়না।

তৃতীয়তঃ এ পৃথিবীতে মানুষ একে অন্যকে ভালবাসে, বন্ধুত্ব করে এবং তার বিনিময়ে কিছু আশাও করে, কিন্তু পিতা-মাতা শুধু সন্তান-সন্ততির কল্যাণই কামনা করে, আর এ কারণেই আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে পিতা-মাতার প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের উভয়ের প্রতি এহ্‌সান করার এবং কথা ও কাজে কোনভাবে তাদেরকে কষ্ট না দেয়ার বিশেষ তাগিদ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে সন্তানের গর্ভে অবস্থান ও স্তন্যদানের সময়ও আল্লাহ্ পাক নির্দিষ্ট করেছেন, সে সময় হলো ত্রিশ মাস, অর্থাৎ দু'বছর দুগ্ধ পানের জন্যে, আর কমপক্ষে ছয় মাস গর্ভে ধারণের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে। এর কম হতে পারবেনা, বেশী হতে পারে। আর স্তন্য দানের ব্যাপারে দু'বছরের কম হতে পারে, বেশী হতে পারেনা।

কাতাদা (রঃ) আবুল হরবের সূত্রে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে এমন এক স্ত্রীলোককে হাজির করা হয় যার সন্তান হয়েছে ছয় মাসে। হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, এ স্ত্রীলোকটির উপর রজম হবেনা, দলিল হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। এতে গর্ভে ধারণ ও স্তন্য দানের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ত্রিশ মাস, আর অন্য আয়াতে দুগ্ধ পানের সময় নির্ধারিত হয়েছে দু'বছর, এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

ত্রিশ মাস থেকে দু'বছর বাদ দিলে ছয় মাস থাকে। অতএব, গর্ভে ধারণের জন্যে ছয় মাসের বিধান রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ দলিল শ্রবণ করে স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দিলেন।

আবু ওবায়দার সূত্রে আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওসমান (রাঃ) এর নিকটও এমনি একজন স্ত্রীলোককে হাজির করা হয়, যার সন্তান হয় ছয় মাসে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয় এ স্ত্রীলোকটি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করলে হযরত ওসমান (রাঃ) ঐ স্ত্রীলোকটিকে অব্যাহতি দেন।

গর্ভধারণের সময় সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য

ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, গর্ভধারণের সবচেয়ে নিম্নতম সময় হলো ছয়মাস, তবে এর অধিক সময় কত সে প্রশ্নে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মতে, গর্ভ ধারণের সর্বাধিক সময় দু'বছর।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, চার বছর এমনকি, পাঁচ বা সাত বছরও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, গর্ভ ধারণের সময় চার বছর হতে পারে।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রঃ) এর দু'টি মত বর্ণিত আছে (১) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতের সঙ্গে তিনি একমত (২) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর সঙ্গে তিনি একমত অর্থাৎ দু'বছর।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "সন্তান মায়ের গর্ভে দু'বছরের বেশী থাকেনা"।

একথা সহজেই অনুমেয় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে একথা বলেননি; বরং অবশ্যই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেই একথা বলেছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন সন্তান গর্ভে ধারণের সময় নয় মাস পূর্ণ হয়ে যায়, তখন মা তার সন্তানকে একুশ মাস দুধ পান করাবে, আর যদি ছয় মাসে

সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তবে দু'বছর মা সন্তানকে স্তন্যদান করবে। এভাবে ত্রিশ মাসের সময় পূর্ণ হবে।[১]

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দান কর, যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ'।

"অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়" কথাটির পূর্বে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, একটি কথা উহ্য রয়েছে আর তা হলো, মাতা-পিতা তাকে লালন-পালন করেছে, অবশেষে যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখনই তার জ্ঞান বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি চল্লিশ বছর পরেই পূর্ণতা লাভ করে, এ কারণে আল্লাহ পাক কোন নবীকেই তাঁর বয়স চল্লিশ বছর হবার পূর্বে নবুওয়ত দান করেননি। আর যখন কোন মানুষের চল্লিশ বছর হয়ে যায়, তখন তার প্রধানতম কর্তব্য হলো তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে মহান দাতা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাই যে প্রকৃত বন্দা সে বলে,

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দান কর, যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর এ নেয়ামত হলো ইসলাম গ্রহণের তৌফিক, হেদায়েত লাভ।

এ আয়াতে পর পর তিনটি জিনিসের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (১) হে আল্লাহ! তুমি যে নেয়ামত আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি দান করেছ, তার-জন্যে তোমার শোকর আদায় করার তৌফিক দান কর। আর নেয়ামত বৃদ্ধির পন্থাই হলো আল্লাহ পাকের শোকরগুজারী তাই এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৯.
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৪৬

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা আমার শোকর আদায় কর, তবে আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব'।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

(২) আর আমাকে এমন আমলের তৌফিক দান কর, যা তোমার পছন্দনীয় হয় তথা আমাকে তোমার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপনের সৌভাগ্য দান কর।

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

(৩) "হে আল্লাহ! আমাকে নেককার সন্তান দান কর"। কেননা নেককার সন্তান পিতা-মাতার নয়ন মনের শান্তির কারণ হয়, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে হয় সাফল্য লাভের উপকরণ।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে, তাঁকেই আল্লাহ পাক এ সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলেন। সর্ব প্রথম ইসলাম তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে তাঁর পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা হযরত আবু কাহাফা (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুর রহমান এবনে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), তারা সকলেই সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তিনটি দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর সকল দোয়া কবুল করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে এমন তৌফিক দিয়েছিলেন যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় বহু গোলাম বাঁদীকে ইসলাম গ্রহণের কারণে অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। হযরত আবুবকর (রাঃ) চড়া দামে তাদেরকে ক্রয় করে আজাদ করে দিতেন।

এভাবে মুসলমানদেরকে কাফেরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করতেন।

إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার দরবারে তওবা করছি, আর নিশ্চয় আমি তোমার অনুগত বন্দাদের অর্ন্তভূক্ত'।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকরগুজার হওয়া এবং নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে কল্যাণ কামনা করা এবং নিজের ভুল-ক্রুটির

জন্যে দরবারে এলাহীতে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সকলের ইসলাম গ্রহণ করা ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা, আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ করা, তাঁর দরবারে তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া- এসব গুণাবলী ছিল হযরত আবুবকর (রাঃ) এর বৈশিষ্ট্য, এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্যে পবিত্র কোরআন সকলের প্রতি আহ্‌বান জানায়।

أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

অর্থাৎ মানুষের চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে বিবেক-বুদ্ধির পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কোন মানুষের জীবনের ৪০ বছরে যে অবস্থা হয়, সাধারণতঃ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে ঐ অবস্থাই অব্যাহত থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশে যেহেতু একথা বলা হয়েছে, চল্লিশ বছরে মানুষ শক্তি সামর্থ্যে এবং বিবেক বুদ্ধিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাই এর দ্বারা একথা প্রমাণিত প্রমাণিত হয় যে, এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ তার পিতা-মাতার মুখাপেক্ষী থাকে, অতি শৈশবে মানুষ যখন চরম অসহায় থাকে, তখন যেমন পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর থাকেনা, ঠিক এমনিভাবে কৈশোর ও যৌবনেও পিতা-মাতার সেবা-যত্নের পাশাপাশি সাহায্য সহায়তা, পথ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চল্লিশ বছর উপনীত হবার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিবেক বুদ্ধির দুর্বলতা থাকে, এজন্যে পিতা মাতার সাহায্য সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় থাকে। আর যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়, মানুষের বিবেক বুদ্ধিও পূর্ণতা লাভ করে, তখনও পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়, আর এজন্যে আলোচ্য আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তফসীরকার মসরুক (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষকে কখন তার পাপাচারের জন্যে পাকড়াও করা হয়? তিনি বললেন, যখন কোন মানুষের চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যায়, তখনই পাপাচার পরিহার করে গুনাহ থেকে তওবা করে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হওয়া উচিত। এরপর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মুসলমান বন্দা যখন চল্লিশ বছর বয়স্ক হয়, তখন আল্লাহ পাক তার হিসাব কিছুটা আসানী করেন, আর যখন সে ষাট বছর বয়স্ক হয়, তখন আসমানওয়ালা তার সঙ্গে মহব্বত করেন, আর যখন আশি বছর বয়স হয়, তখন আল্লাহ পাক তার নেকীগুলো সুপ্রমাণিত করে রাখেন, আর গুণাহগুলো দূরীভূত

করেন, আর যখন সে নব্বই বছর পেয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ পাক তার পূর্বাপর গুণাহ মাফ করে দেন। আর তার পরিবারের লোকদের জন্যে তাকে সুপারিশকারী হিসেবে করেন। আর আসমান সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, এ ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের কয়েদী হিসেবে আছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মানুষের যখন বয়স চল্লিশ বছর হয়ে যায়, তখন তার কর্তব্য হলো যাবতীয় গুণাহ থেকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করা এবং আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মনোনিবেশ করা।[১]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي
قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ
مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৬) আমি তাদেরই নেক আমলগুলো কবুল করে থাকি এবং তাদের গুণাহ্গুলো মাফ করে থাকি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত, তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে তা ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

(১৭) আর যে কেউ তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্যে আফসোস, তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে আমি পুনরুত্থিত হবো, যদিও আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে। তখন তার পিতা-মাতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৯-১০

ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোর জন্যে, এখনও ঈমান আন্, আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য। কিন্তু সে বলে, এসব তো অতীত যুগের উপকথা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

(১৮) এরা সে সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ পাকের আজাব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বীন এবং মানুষের যে সব সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, এরাও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থী হয়ে থাকে। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে পরকালীন জীবনে পরম সৌভাগ্য লাভের সুসংবাদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

'আমি তাদের নেক আমলগুলো কবুল করে থাকি এবং তাদের গুনাহগুলো মাফ করে থাকি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত, তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে তা ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণিত হবে'।

এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, (কেয়ামতের দিন) মানুষের নেক আমল এবং বদ আমলের মোকাবেলা করা হবে। যদি একটি নেকীও মন্দ কাজ থেকে বেড়ে যায়, তবে তার বদলে ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছানো হবে।[১]

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১০,
তফসীরে আদ দুররুল , মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৬

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

(যে অনু পরিমাণও নেক আমল করবে তা সে দেখতে পাবে, আর যে অনু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, তা-ও সে দেখতে পাবে।)

অর্থাৎ সৎকাজ যত সামান্যই হোক, তার সওয়াব বা শুভ-পরিণতি অবশ্যই পাওয়া যাবে, আর মন্দ কাজ যত ক্ষুদ্রই হোক, তার পরিণতিও ভোগ করতে হবে। তবে যার সৎকাজ মন্দকাজ থেকে বেশী হবে, আর তা যত সামান্যই হোক, আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদি পূর্ববর্তী আয়াতের وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ এর الانسان দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের اولئك শব্দ দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত গুণাবলীর অধিকারী হয়, তারাই এ আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদ লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি الانسان শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ) অথবা হযরত সাদ এবনে ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের اولئك শব্দ দ্বারা সে সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত সাদ (রাঃ) এর গুণাবলী থাকবে। তাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করবেন এবং তাদের গুণাহগুলো মাফ করে দেবেন। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। অথবা এর অর্থ হলো, জান্নাতীদের সাথে তাদেরকেও সওয়াব দান করা হবে।

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

'আর যে কেউ তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্যে আফসোস, তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হবো? যদিও আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে। তখন তার পিতা-মাতা আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোর জন্যে, এখনও ঈমান আন, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, কিন্তু সে বলে, এসব তো অতীত যুগের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

পূর্ববর্তী আয়াতে সুসন্তানের আদর্শ পেশ করা হয়েছে যে, সে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকরগুজার হয় এবং তার পিতা-মাতার জন্যেও সে দোয়া করে, নেক আমলে মশগুল হয়।

আর আলোচ্য আয়াতে কুসন্তানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, পিতা-মাতাকে 'উফ্' 'আফসোস' বলে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে। সে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, পিতা-মাতা যখন আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়, তখন সে তাতে অস্বীকৃতি জানায়। পিতা-মাতা তাকে বলে, হে বৎস! আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়োনা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, মনে রেখ এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে। পরকালে প্রতিটি মানুষকে পুনর্জীবন দেয়া হবে এবং প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেককে তার এ জীবনের কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

কিন্তু এ কুসন্তান তার পিতা মাতার সাথে সদাচরণের স্থলে মন্দ ব্যবহার করে, পরকালীন জীবন সম্পর্কে কটুক্তি করে, সে বলে এসব হলো পুরাতন কাহিনী, চিরকাল এসব কথা লোকেরা বলে এসেছে, সর্বদাই মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আজো কেউ ফিরে আসেনি, অতএব, পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের কথা ভিত্তিহীন, অলীক।

وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

সন্তানের এসব কথা শুনে পিতা-মাতা তার হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেন এবং তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ! তাকে ঈমান আনয়নের এবং তওবা করার তৌফিক দান কর। এরপর সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এখনও সময় আছে, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, এবং তাঁর নিকট তওবা ও এস্তেগফার কর। কিন্তু ঐ কুসন্তান কোন অবস্থাতেই সরল সঠিক পথে আসেনা। পিতা-মাতা বলেন, নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাকের ওয়াদা ধ্রুব সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই কুসন্তান বলে, এসব পুরাতন কাহিনী বহু শুনেছি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

'এরা সে সব লোক যাদের উপর আল্লাহ্ পাকের আজাব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এর পূর্বে জ্বীন ও মানুষের যে সব সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, এরাও তাদেরই অর্ন্তভূক্ত। নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত'।

ইতিপূর্বে মানুষ এবং জ্বীন জাতির মধ্যে যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তারা আল্লাহ্ পাকের শাস্তি ভোগ করেছে এবং দোজখের আজাব তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এমনিভাবে এদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ পাকের সে আজাবই সাব্যস্ত হলো, প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং সর্বস্বান্ত। যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লাভ করার স্থলে তার মূলধন হারিয়ে ফেলে, তাকেই বলা হয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, এরা সে সব লোক যারা ঈমান এবং নেক আমলের অভাবে জান্নাত লাভ করতে পারবেনা, কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তারা পরকালীন জীবনে চরম ক্ষতিগ্রস্ত এবং সর্বস্বান্ত হবে, প্রকৃতপক্ষে তারা হবে সর্বহারা।

মূলতঃ পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে লাভবান হতে হলে ঈমান ও নেক আমলের পুঁজি অবশ্যই অর্জন করতে হবে, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ
اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاذْكُرْ اَخَا
عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا
عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৯) আর প্রত্যেকের কর্ম মোতাবেকই হবে তার মর্যাদা, আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন। আর তাদের প্রতি এতটুকু অবিচার করা হবেনা।

(২০) আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো দুনিয়ার জীবনেই সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করে দিয়েছ, তাই আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, কেননা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে, তাই আজ তোমরা অপমানজনক আজাব ভোগ করবে।

(২১) আর স্মরণ কর আদ জাতির ভাইকে, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন, সে তার আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল একথা বলে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা (ভয়াবহ) দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

(২২) তারা বলে, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করার জন্যেই এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে ভয়ের কথা বলছো, তা আনয়ন কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকের শোচনীয় পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি, নিজের পিতা-মাতার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, সত্যকে বর্জন করেছে, অসত্যকে গ্রহণ করেছে, অবশেষে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সর্বস্বান্ত। আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে তাদের আমল অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হবে, প্রত্যেককেই তার আমলের বিনিময় দান করা হবে, কারো প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবেনা, কারো প্রাপ্য সওয়াব এতটুকু কম দেয়া হবে না, এমনিভাবে লঘু পাপে গুরু দন্ডও দেয়া হবেনা। অকারণে কাউকে শাস্তিও দেয়া হবেনা, শাস্তি অথবা শান্তি উভয় অবস্থার জন্যে মানুষের কর্মই হবে কারণ, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا

'আর প্রত্যেকের কর্ম মোতাবেকই হবে তার মর্যাদা, আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে পরে ইসলাম গ্রহণকারীর চেয়ে উত্তম, এমনকি যদি এক ঘন্টার আগে পরেও হয় তবু মর্যাদায় পার্থক্য হবে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী সওয়াব বা ফজিলত দান করবেন।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ মোমেন হোক বা কাফের, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে। আর সে অবস্থানটি প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী হবে।

এবনে জায়েদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোজখীদেরকে নীচের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর জান্নাতবাসীগণকে উপরের দিকে উত্তোলন করা হবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে لكل বলে আল্লাহ পাক দু'টি দলের অবস্থা এবং পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এক দল, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেছে, আর তাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় দল, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসও করেনি এবং তাদের পিতা-মাতার প্রতিও অবাধ্য হয়েছে। কেয়ামতের দিন উভয় দলকে তাদের নিজ নিজ আমলের বিনিময় দেয়া হবে।

وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧﴾

'আর তা এজন্যে যে আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন, আর তাদের প্রতি এতটুকু অবিচার করা হবেনা'।

অর্থাৎ-যে নেক আমল করেছে, তার নেক আমল বৃথা যাবেনা এবং তার সওয়াবও কম করা হবেনা। আর যে বদ আমল করেছে, তার কৃত গুনাহের সমুচিত

১-তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৫১-৫২

শাস্তি সে ভোগ করবে। তার গুণাহের চেয়ে অতিরিক্ত কোন শাস্তি সে ভোগ করবেনা আর অন্যের গুণাহ্র জন্যে কাউকে দায়ীও করা হবেনা।[১]

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো দুনিয়ার জীবনেই সুখ–সম্ভার শেষ করে দিয়েছ, তাই আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কেননা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে। আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে ছিলে লিপ্ত, তাই আজ তোমরা অপমানজনক আজাব ভোগ করবে'।

কাফেররা যদি কোন সৎকাজ করেও, তবে তা হয় প্রাণহীন, কেননা তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত। ঈমান হলো আমলের প্রাণ, তাই ঈমান বিহীন আমল প্রাণহীন। এজন্যে কোন কাফেরের আমল আখেরাত পর্যন্ত যেতে পারেনা, তারা দুনিয়াতে দান খয়রাত করে, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে এগিয়ে আসে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তারা দানের বিনিময়ে সুনাম অর্জন করে, কিন্তু এর কোন ফল তারা আখেরাতে পাবেনা। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে তোমরা তো দুনিয়ার জীবনেই সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করে দিয়েছ, তাই আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি'।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ্ পাকের বিধানকে অমান্য করে, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভুলে যায়

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৪

এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী; কেননা কেয়ামতের দিন তাদেরকেই বলা হবে, তোমরা তো দুনিয়ার জীবনেই সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করে দিয়েছ।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর জীবন ধারা

মূলতঃ এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ বিলাস থেকে বিরত থাকতেন এবং আখেরাতের সাফল্যের আশায় দিন গুজরান করতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত ছিলেন, এতে কোন বিছানা ছিলনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে চাটাইয়ের চিহ্ন বসে গিয়েছিল, তাঁর মাথা মোবারকের নীচে একটি চামড়ার বালিশ ছিল; এ অবস্থা দেখে আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা যদিও আল্লাহ পাকের এবাদত করেনা, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়ার প্রচুর সুখ-সম্পদ দান করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে ওমর! তুমি কি এখনো এ বিভ্রান্তিতে রয়েছ? অন্য সব জাতিকে দুনিয়ার এ জীবনেই আনন্দ-উল্লাসের উপকরণ দিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেন, তোমার কি একথা পছন্দনীয় নয় যে, তাদের জন্যে শুধু দুনিয়া, আর আমাদের জন্যে আখেরাত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে দু'দিন পেট ভরে যবের রুটিও ভক্ষণ করেননি।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু সায়ীদ মাকবারী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিছু লোক বকরীর ভুনা গোশত নিয়ে বসেছিলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে খাবার গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলো, তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে তশরিফ নিয়ে গেছেন, আর যবের রুটিও কখনও পেট ভরে খাননি।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাদের একেক মাস অতিবাহিত হতো, কিন্তু ঘরে কখনো আগুন জ্বলতোনা, শুধু পানি আর খেজুরই থাকত (আর এভাবেই জীবন অতিবাহিত হতো)। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক উত্তম বিনিময় দান করুন আনসারী মহিলাদেরকে, তারা কখনো কখনো দুগ্ধ প্রেরণ করতেন।

ইমাম আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেন, একাধারে এমন অনেক রাত অতিবাহিত হতো, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতেন (খাবার মত কিছুই থাকত না)। তাঁর পরিবারের লোকেরাও সন্ধ্যাকালে খাবার মত কিছু পেতেন না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ অধিকাংশ সময় যবের রুটি খেতেন।

তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে আল্লাহ পাকের রাহে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যখন আর কাউকে ভয় প্রদর্শন করা হয়নি। আমাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, যখন আর কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি। আমার ত্রিশটি দিন-রাত এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার নিকট এবং বেলালের নিকট এমন কোন খাবার ছিলনা, যা জীবিত মানুষ খেয়ে থাকে। শুধু এতটুকু যা বেলাল তার বগলে সংরক্ষণ করেছিল (তাই আমরা খেয়ে নিতাম)। এ ঘটনা সে সময়ের যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিয়ে এক সঙ্গে মক্কা শরীফ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর নিকট এত সামান্য খাবার ছিল যা তিনি বগল তলে রেখে দিয়েছিলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, আমি "আসহাবে সুফফা"র সত্তর জন সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি, যাঁদের দেহে লুঙ্গি বা চাদর দু'টি এক সঙ্গে ছিলনা, ফলে তাঁরা একটি চাদরকে গলায় বেধে নিতেন, যা হাটুর নীচে বা টাখনুর উপর পর্যন্ত পৌছত। তাঁরা হাত দ্বারা তা একত্রিত করে রাখতেন, যাতে ছতর খুলে না যায়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যবের

রুটি নিয়ে আসেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারার এক ইহুদীর নিকট তাঁর লৌহ-বর্ম বন্ধক রেখে কিছু যব সংগ্রহ করেছিলেন, হযরত আনাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, আমি শুনেছি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের নিকট রাত্রিকালে এক ছা' গমও থাকেনি, আর এক ছা' কোন তরি-তরকারীও থাকেনি (আর সে সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন)।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, আবদুর রহমান বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিন ব্যক্তি তাঁর নিকট হাজির হয়ে আরজ করলো, হে আবু মোহাম্মদ, আল্লাহর শপথ! আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, আমাদের নিকট খাবার বলতে কিছুই নেই, আমাদের কোন যানবাহনও নেই, কোন আসবাবপত্রও নেই। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা কি চাও? যদি তোমরা পছন্দ কর তবে আমার নিকট চলে আস, আল্লাহ পাক যা আমাকে তৌফিক দান করেছেন, তা আমি তোমাদেরকে দান করবো। আর যদি তোমরা পছন্দ কর, তবে বাদশাহের নিকট তোমাদের কথা উল্লেখ করবো, আর যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে সবর করতে পার। আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, তিনি বলেছেনঃ দরিদ্র মোহাজেরগণ ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তখন লোকেরা বললো, তাহলে আমরা সবর করবো, আমরা কিছুই চাইনা।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মাআজ (রাঃ)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা মনোনীত করে প্রেরণ করলেন, তখন বলেছিলেন, আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠোনা, আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা কখনো আনন্দ-উল্লাস করেনা।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অল্প রিজকে আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ পাক তার অল্প আমলে তার প্রতি রাজী থাকবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) রোজাদার ছিলেন, সন্ধ্যাকালে তাঁর সম্মুখে খাদ্য-দ্রব্য পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, হযরত মাসআব এবনে উমাইর (রাঃ) শহীদ হয়েছেন, তিনি আমার চেয়ে

উত্তম ছিলেন; তাঁকে একটি চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়, (আর চাদরটি এত ছোট ছিল যে) মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকত, আর পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতখানি মনে পড়ে, হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) একথাও বলেছিলেন, হযরত হামজা (রাঃ) শহীদ হয়েছেন, আর তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, এরপর আমাদের জন্যে দুনিয়া ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন, দুনিয়া আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার ভয় হয়, এমন যেন না হয়, আমাদের সকল নেকীর বিনিময় আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই দিয়ে না দেন। এরপর তিনি ক্রন্দণ করতে লাগলেন এবং খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন।

হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমার হাতে গোশত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, জাবের এগুলো কি? আমি বললাম, গোশত খেতে মন চেয়েছিল, তাই ক্রয় করে এনেছি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার মন যা চাইবে তাই ক্রয় করবে, তবে কি–

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

(তোমরা তো দুনিয়ার জীবনেই সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করে দিয়েছ)

তোমার অন্তরে এ আয়াতের কোন ভয় নেই?

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি নেই, যে নিজের প্রতিবেশীর জন্যে অথবা চাচাতো ভাইয়ের জন্যে নিজে ক্ষুধার্ত থাকবে (অর্থাৎ নিজে অভুক্ত থেকে তাদেরকে খেতে দেবে)।

রাজীন জায়েদ এবনে আসলাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) পান করার জন্যে পানি চাইলেন, তাঁকে পানি দেয়া হলো, তাতে মধুর মিশ্রণ ছিল (অর্থাৎ মধুর সরবত ছিল), তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে এটি পবিত্র। কিন্তু আমি শুনেছি, যারা পৃথিবীতে তাদের সকল আকাংখা পূর্ণ করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ পাক আখেরাতের নেয়ামত নিষিদ্ধ করেছেন, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত-

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

পাঠ করে বললেনঃ আমার ভয় হয় আল্লাহ পাক আমাদের নেক আমলের বদলা পৃথিবীতেই দিয়ে না দেন। পরে হযরত ওমর (রাঃ) ঐ সরবত পান করেননি।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার এ মন্তব্য করেছেন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করতাম এবং উত্তম মসৃণ পোষাকের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আমার সকল সাধ ও আনন্দ আমি আখেরাতের জন্যে রেখে দিতে চাই।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আগমন করেন, তখন তাঁর সম্মুখে এমন খাবার পেশ করা হয়, যা তিনি কখনও দেখেননি। তখন তিনি বললেন, এ সুস্বাদু খাবার আমাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে? তাহলে সে দারিদ্র-প্রপীড়িত মুসলমানদের কি অবস্থা! যারা মৃত্যু পর্যন্ত যবের রুটিও পায়নি। হযরত খালেদ এবনে ওলিদ (রাঃ) আরজ করলেন, তাঁদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল; তিনি বললেন, যদি আমাদের অংশে এসব মূল্যহীন বস্তু থাকে আর তারা জান্নাতের মালিক হন, তবে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

হামীদ এবনে বেলাল বর্ণনা করেন, হযরত হাফস (রাঃ) অনেক সময় সন্ধ্যাকালে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করতেন। যখন খাবার পেশ করা হতো, তখন হযরত হাফস (রাঃ) খেতে অস্বীকৃতি জানাতেন। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে! তুমি আমার সঙ্গে খেতে চাওনা কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আমার বাড়ীতে যে খাবার তৈরী হয় তা এ খাবারের চেয়ে মোলায়েম ও সুস্বাদু। সেজন্যে আমি ঐ খাবারই পছন্দ করি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার জন্যে তোমার মা ক্রন্দণ করুক, তুমি কি জান না, আমি ইচ্ছা করলে একটি মোটা তাজা বকরী জবেহ করিয়ে ভুনা করার ব্যবস্থা করতে পারি, ময়দার রুটি তৈরী করাতে পারি এবং কিসমিস, মোনাক্কা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যদি কেয়ামতের দিন আমার নেকী সমূহ কম হওয়া আমার অপছন্দনীয় না হতো, তবে আমি তোমাদের জন্যে সুস্বাদু খাবার একত্রিত করতাম; অর্থাৎ নিজেও তেমন খাবার গ্রহণ করতাম এবং তোমাদেরকেও খেতে দিতাম।[১]

মূলতঃ সোনালী যুগের মুসলমানগণ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বাদ ও আনন্দ–উল্লাসকে গুরুত্ব দিতেন না। তাঁরা প্রাধান্য দিতেন আখেরাতের জীবনকে,

---

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৫৪

পরকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এজন্যে পানাহার বা জীবনের অন্যান্য বৈধ উপকরণকেও যথাসম্ভব পরিহার করে চলতেন, যেন ক্ষণিকের জন্যেও তাঁদের মন এ পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়ে, কেননা যদি মানব মনের এমন অবস্থা হয় তবে আখেরাতের ব্যাপারে তার গাফলত হতে পারে, আর তা প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُوْنَ

'অতএব, আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, কেননা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে; তাই আজ তোমরা অপমানজনক আজাব ভোগ করবে'।

অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে ঔদ্ধত্য ও দম্ভ প্রকাশ করেছিলে এবং সত্য গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করেছিলে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে কলুষিত জীবন যাপন করেছিলে, আখেরাতের জীবনের কথা এবং হিসাব-নিকাশের বিষয় বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে, তাই কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করতে হবে; তোমাদের লাগাতার পাপাচার, ঔদ্ধত্য ও অহংকার এবং সত্যদ্রোহীতাই তোমাদের এ ভয়াবহ পরিণতির কারণ।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

'আর আদ জাতির ভাইকে স্মরণ কর, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন, সে তার আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল একথা বলে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করোনা; নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা (ভয়াবহ) দিনের আশংকা করছি'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু

মক্কাবাসী পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার কারণে তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি ঈমান আনেনি, বরং তাদের সত্যদ্রোহীতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতনও বেড়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ

'আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে'। এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতেও তাদের গাফলত এবং ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটেনি, তারা মনে করতো যে, তারা সমৃদ্ধশালী, তাদের ধন-সম্পদের কারণে কখনও তাদের সুখ-শান্তির অভাব হবেনা।

তাই আলোচ্য আয়াতে সমৃদ্ধশালী আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। তারাও ছিল প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারী, তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত হুদ (আঃ)। তিনি তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলেন, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আদ জাতি হযরত হুদ (আঃ)-এর উপদেশে কর্ণপাত না করার কারণে আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে, আসমানী গজব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

'আর স্মরণ কর আদ জাতির ভাইকে, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। সে তার আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল একথা বলে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি'।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল! যদি আজ আপনার জাতি আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে-থাকে, তবে তা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে অন্যান্য নবী রসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা

হয়েছে এ মর্মে যে, আপনি আদ জাতির কথা স্মরণ করুন, আল্লাহ পাক হযরত হূদ (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন; তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তৌহীদে বিশ্বাস কর, শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর।

إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি'।

কিন্তু আদ জাতি হযরত হূদ (আঃ)-এর এ সতর্কবাণীকে কোন গুরুত্ব দেয়নি, তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বললো, আমরা উপলব্ধি করছি যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করাই তোমার উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾

'তারা বলে, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করার জন্যেই এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে ভয়ের কথা বলছো, তা আনয়ন কর'।

এভাবে আদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হূদ (আঃ)-এর হেদায়েতকে অমান্য করেছে, সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু এর পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। আদ জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ পাকের আজাব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার পাশাপাশি কাফেরদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলের বিরোধিতার পরিণাম সর্বদা ভয়াবহ হয়েছে। আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কখনও আল্লাহ পাক কোন দল, গোষ্ঠী বা জাতিকে ক্ষমতা দান করেন, সমৃদ্ধশালী করেন, কিন্তু যখন তাদের ঔদ্ধত্য, নাফরমানী, জুলুম–অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গজব নেমে আসে, পরিণামে তারা ধ্বংস হয়। পবিত্র কোরআন তাই এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করে মানব জাতিকে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি

ঈমান আনয়ন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর অনুসরণের আহবান জানিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এ সূরার নাম "আহকাফ" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, সূরার শুরুতে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আহ্কাফের পরিচিতি

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আহকাফ" নামক স্থানটি আম্মান এবং মোহরা নামক স্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আদ জাতি ইয়ামনের হাজরামুত এলাকার 'মোহরা' নামক স্থানে বসবাস করতো।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, বর্ণিত আছেঃ আদ জাতি ছিল ইয়ামনের একটি গোত্র, তারা সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থানে বাস করতো। এ স্থানটিকে "ইয়াশজার" বলা হতো।[১]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, আদ জাতি ইয়ামামা বাহরায়েন প্রভৃতি এলাকার নিকটস্থ বিরাট শূন্য প্রান্তরে বসবাস করতো। এ এলাকাকেই তখন "আহকাফ" বলা হতো। বর্তমানে এটি অনাবাদী থাকলেও তখন আদ জাতির বাসস্থান হওয়ার কারণে তা ছিল প্রাণবন্ত।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবনে জায়েদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যা একরামার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আহকাফ পাহাড় এবং গর্তকে বলা হয়। আদ জাতির এসব স্থানেই আবাস ছিল। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাজরামুতে একটি মরুভূমির নাম আহকাফ।[৩]

আল্লামা আলুসী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সিরিয়াতে একটি পাহাড়ের নাম আহকাফ।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৫৬-৫৭

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬৫৪

৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫০

এবনে এসহাক বলেছেন, আদ জাতি আম্মান এবং হাজরামুতের মাঝামাঝি স্থানে বাস করতো। আর এবনে আতীয়্যা (রঃ) বলেছেন, আদ জাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো তারা ইয়ামনে বাস করতো।[১]

আল্লামা মাজেদী (রঃ) লিখেছেন, আহকাফ এর শাব্দিক অর্থ বালুর স্তূপ; আহকাফ নামক স্থানটি জর্ডানের আম্মান থেকে পূর্ব পশ্চিমে ইয়ামন পর্যন্ত, আর উত্তর দক্ষিণে নজদ থেকে হাজরামুত পর্যন্ত। সম্পূর্ণ এলাকাটি ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর পশ্চিমাংশে বালুর বর্ণ লাল, আর এ এলাকাকেই আহ্কাফ বলা হয়।[২]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত হুদ (আঃ)-এর পূর্বেও এ এলাকাবাসীর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সতর্ককারী পৌঁছেছেন, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ যার পূর্বে ও পরেও বিভিন্ন যুগে সতর্ককারী এসেছিলেন, এবং তাঁরা সতর্ক করে একথা বলেছিলেন, তোমরা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

বস্তুতঃ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণ এভাবেই মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, যারা ভাগ্যবান, তারা সতর্কতা অবলম্বন করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে গেছে, পক্ষান্তরে, যারা হতভাগা, তারা নবী–রসূলগণের হেদায়েত মানেনি, পরিণামে তাদের শাস্তি হয়েছে অবধারিত।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৪

২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১০০৮

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ
أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ
قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۖ رِيْحٌ
فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ ۙ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوْا لَا يُرٰىٓ إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২৩) তিনি বলেন, এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তাই প্রচার করি, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।

(২৪) এরপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বললো তা-তো মেঘই, এ মেঘ আমাদের উপরই বর্ষিত হবে। কিন্তু তিনি বললেন, এটিই সে শাস্তি যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছ, এতেই রয়েছে ঝড় যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বহনকারী।

(২৫) তার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে সে সব কিছুকে উপড়ে ফেলবে, এরপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বাড়ী-ঘর ব্যতীত আর কিছুই রইলনা, এভাবেই আমি পাপীষ্ঠদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে; কিন্তু তারা সতর্ক হওয়ার স্থলে আল্লাহর নবীর প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছে, যদি আজাব সত্য সত্যই আমাদের উপর আপতিত হবে বলে মনে করেন, তবে বিলম্বের কী প্রয়োজন,

এখনই আসুক। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

আল্লাহর নবী হুদ (আঃ) বলেন, আজাব কখন আসবে, তা এক আল্লাহ্‌ পাকই জানেন, এই এলম আমার নেই, আমি শুধু সে কথাই পৌঁছিয়ে থাকি, যা নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে একথা জেনে রাখ যে, আজাবের আগমণ ধ্রুব সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তবে কখন কিভাবে তা আসবে- তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। তোমাদেরকে সতর্ক করাই আমার দায়িত্ব; তৌহীদের পয়গাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি, আজাব দেয়া পয়গম্বরের কাজ নয়; তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে, তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছ।

এরপরই আদ জাতি সম্পর্কে আজাবের সিদ্ধান্ত হয়; তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

'এরপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে লাগল, তখন তারা বললো, তা-তো মেঘই, এ মেঘ আমাদের উপরই বর্ষিত হবে''।

বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি অনেক দিন থেকে অনাবৃষ্টির কারণে কষ্টে ছিল। হঠাৎ একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, তারা মেঘ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো; তারা মনে করলো বৃষ্টিপাত হবে, তারা ফসল ঘরে তুলবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশে মেঘমালার আকৃতিতে যা দেখা গিয়েছিল, তা মেঘ ছিলনা; বরং আল্লাহ্‌ পাকের আজাব ছিল, আর তা ঘূর্ণিঝড়ের আকৃতি ধারণ করলো এবং দুর্ধর্ষ আদ জাতির উপর আপতিত হলো। তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

(তোমরা যা দেখেছ তা বৃষ্টি নয়;) বরং তা সে শাস্তিই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতেই রয়েছে ঝড়, যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বহনকারী।

অর্থাৎ হযরত হুদ (আঃ)-এর নিকট আদ জাতি যে শাস্তির জন্যে তাড়াহুড়ো করছিল, সে শাস্তিই তাদের উপর আপতিত হলো।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِأَمْرِ رَبِّهَا

তার প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে সে সব কিছুকে উপড়ে ফেলবে, এরপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বাড়ী-ঘর ব্যতীত আর কিছুই রইল না, তাদের সব কিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। তাদের পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফসল এক কথায় সব কিছু আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ ব্যতীত কেউ রক্ষা পেলনা। শুধু তাদের হারানো দিনের সাক্ষী হিসেবে বাড়ী-ঘরের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ

'তাদের বাড়ী-ঘর ব্যতীত আর কিছুই রইল না'।[১]

বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি তাদের আজাবের কথা তখন উপলব্ধি করল, যখন তারা দেখল ব্যতাসে সব কিছু উড়িয়ে নিচ্ছে, এমনকি তাদের উটগুলোকে পৃষ্ঠের বোঝাসহ আসমান-জমীনের মধ্যখানে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে তারা পালিয়ে স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশ করলো, দ্বার রুদ্ধ করে দিল, কিন্তু প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে গেল এবং তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করলো।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তাদের লাশগুলো মরুভূমির উপর পড়েছিল, আল্লাহ পাক বালুর ঝড় প্রেরণ করলেন এবং আদ জাতির লোকদের মৃত লাশগুলো বালুর নীচে চাপা পাড়লো।

এ ঘূর্ণিঝড় আট দিন সাত রাত অব্যাহত ছিল, এরপর ঝড় তাদেরকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

সাধারণতঃ বাতাস একটি পরিমাণ মোতাবেক-চলে, কিন্তু সেদিন আল্লাহ্ পাকের গজবী বাতাস কত দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। আর এভাবে দুর্ধর্ষ, আকাশ-চুম্বি ইমারত নির্মাণকারী, শক্তিধর, আদ জাতির নাম-নিশানাও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেল। পরবর্তী আয়াতে তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

'এভাবেই আমি পাপীষ্ঠ জাতিগুলোকে শাস্তি দিয়ে থাকি'।

১ হুদ জাতির ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন, তাফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ২৮৭-৮৯
২

এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেভাবে আদ জাতির প্রতি আজাব আপতিত হয়েছে, সে অবস্থা তোমাদেরও হতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! লোকেরা মেঘমালা দেখে খুশী হয়, বৃষ্টিপাতের আশা করে, কিন্তু আপনি মেঘমালা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং আপনার চেহারা মোবারকে দুশ্চিন্তার আলামত লক্ষ্য করা যায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আয়েশা! আমার আশংকা হয় যে, হয়তো ঐ মেঘমালায় আল্লাহ পাকের আজাব রয়েছে। (পূর্ব কালে) একটি জাতির উপর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় এসেছিল, কিন্তু প্রথমে মেঘমালা দেখে তারা উপলব্ধি করেছিল, এ মেঘমালা থেকে আমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে (কিন্তু ঐ মেঘমালাই তাদের জন্যে আজাব বহন করে এনেছিল)।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দেখতেন যে, তীব্র গতিতে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বাতাস থেকে আর যা এর মধ্যে আছে তা থেকে কল্যাণ কামনা করি এবং এই বাতাস যা বহন করে এনেছে তা থেকেও কল্যাণ কামনা করি। আর আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু এই বাতাস বহন করে এনেছে তার অকল্যাণ থেকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, সাধারণতঃ যা দেখলে মানুষ বৃষ্টিপাতের আশা করে, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, মেঘমালা দেখেই তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ অবস্থায় তিনি একবার বাইরে যেতেন আবার ভেতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি শুরু হতো, তখন তাঁর চেহারা মোবারকে দুশ্চিন্তার ছাপ দূরীভূত হতো।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এ অবস্থাটা উপলব্ধি করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি এরশাদ করলেন, হে আয়েশা! সম্ভবতঃ এ মেঘমালা সেরকমই, যেমন আদ জাতি মেঘ দেখে বলেছিল, এর দ্বারা আমরা বৃষ্টি পাব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখে এভাবে দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহ! তোমার রহমত কামনা

করি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, 'হে আয়েশা! আমি কি করে নিশ্চিন্ত হই, একটি জাতিকে এ বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করা হয়েছে'।

আবু দাউদ, নাসায়ী, এবনে মাজা সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই আকাশে মেঘ দেখতেন, তখনই নিজের কাজ ছেড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এর অকল্যান থেকে (আল হাদীস)'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই তুফান দেখতেন, তখনই দু' জানু একত্রিত করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! এ তুফানকে রহমতে রূপান্তরিত কর, একে আজাবে পরিণত করোনা'।[১]

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন তিনি তাঁর সব কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাজ হলেও। এরপর এ দোয়া পাঠ করতেন

اللهم انى اعوذبك من شر ما فيه

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে'।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা- ৪৫৯-৬০

২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা- ২৭
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৪৮

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ
كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ۟۲۶ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى
وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۟۲۷ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا
عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۟۲۸ وَاِذْ صَرَفْنَآ
اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۟۲۹

তরজমা

(২৬) আর আমি তাদেরকে ঐসব বিষয়ে ক্ষমতা দান করেছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করিনি এবং আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর (এক কথায় সব কিছু) দান করেছিলাম, কিন্তু কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি, কেননা তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করতো, আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো।

(২৭) আর নিশ্চয় আমি তোমাদের চার পার্শ্বের জনপদগুলোকে ধ্বংস করেছি। আর আমি বারংবার আমার নিদর্শন সমূহকে বর্ণনা করেছি, যেন তারা সৎপথের দিকে ফিরে আসে।

(২৮) তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে নিজেদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল; তারা কেন (বিপদ মুহূর্তে) তাদেরকে সাহায্য

করলোনা? বরং তারা তাদের পূজারীদের থেকে উধাও হয়ে গেল, বস্তুতঃ এটিই ছিল তাদের নিজেদের মনগড়া মিথ্যা, আর তারা যা রচনা করতো, এটি তাই।

(২৯) আর (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে, যখন আমি জ্বীনদের একটি দলকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করি, যারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করছিল, যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তখন একে অন্যকে বলতে লাগল, নীরবে শ্রবণ কর। যখন পবিত্র কোরআন পাঠ শেষ হলো তখন তারা নিজেদের জাতিকে সতর্ক করার জন্যে ফিরে গেল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শক্তিধর আদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে সাধারণতঃ সকল যুগের কাফের মুশরেক বিশেষতঃ মক্কার কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ

আর আমি আদ জাতি সহ অন্যান্য জাতিকে যে ক্ষমতা দান করেছিলাম তা তোমাদেরকে দান করিনি। তাদেরকে ধনবল, জনবল, বাহুবল তোমাদের চেয়ে শতগুণ বেশী প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা যখন আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান হয় এবং তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করে, তখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। আর সে শাস্তির কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের শক্তি-সামর্থ কোন কাজে আসেনি, তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব, তোমরা তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, কেননা পূর্বকালের অবাধ্য জাতিগুলোর ন্যায় তোমরাও আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের বিরোধিতা করছো এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করছো, তোমাদের এ দৌরাত্মের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা ভেবে দেখ।

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً

'আর আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছিলাম'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণের জন্যে তাদেরকে শ্রবণ শক্তি দান করেছিলাম, যেন তা দ্বারা তারা উপদেশ গ্রহণ করে, এমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখার জন্যে তাদেরকে দান করেছিলাম

নয়ন যুগল, যেন তারা সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনে, এমনিভাবে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে এবং আল্লাহ্ পাকের মারেফাত হাসিল করার জন্যে তাদের দান করেছিলাম অন্তর যেন তাঁর সৃষ্টি- নৈপুণ্য দেখে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

কিন্তু এসব উপকরণ দ্বারা এ হতভাগ্যরা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারেনি, এসব নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তারা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীই করেছে, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ

'কিন্তু কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোন কাজেই আসেনি', কেননা তারা এ সমস্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করেছে।

إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ

এজন্যে যে, সত্য গ্রহণের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিধান সমূহকে অমান্য করেছে, এমনকি যখন তাদেরকে আল্লাহর নবী তাদের অপকর্মের পরিণতিতে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেন, তখন তারা ঐ আজাবকে বিদ্রুপ করে। তারা বলে, যদি কোন আজাব এসে আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে তবে তা আসুক এখনই, বিলম্ব কিসের? অবশেষে সেই আজাব তাদের উপর আপতিত হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করলো।

তাই পরবর্তী বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

'আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো'। অর্থাৎ সে আজাবই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করলো। এভাবে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতিগুলো তাদের চরম অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ধরা-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আয়াতের প্রতি বিদ্রুপ করার অর্থ হলো তারা বলেছিল, "এখনই আসুক সে আজাব"।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ
وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

'আর নিশ্চয় আমি তোমাদের চারপার্শ্বের জনপদগুলোকে ধ্বংস করেছি, আর আমি বারংবার আমার নিদর্শন সমূহকে বর্ণনা করেছি, যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে'।

এ আয়াতেও পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় বিভিন্ন যুগে আল্লাহ পাকের অবাধ্য জাতিগুলোকে ধ্বংস করার কথা এরশাদ হয়েছেঃ হে মক্কাবাসী! তোমাদের আশপাশের অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের শেরক কুফর ও নাফরমানীর কারণে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, مَا حَوْلَكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের আশ-পাশের" কথাটির অর্থ হল, মক্কার অদূরেই সামুদ জাতি আদ জাতি এবং হযরত লুত (আঃ)-এর জাতি বাস করতো। আল্লাহ পাক বারে বারে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এসব জাতি সৎপথে ফিরে আসেনি; তাই তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন। আদ জাতিকে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে, সামুদ জাতিকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে এবং হযরত লুত (আঃ)-এর জাতি সদুম বাসীকে প্রথমে পাথর বর্ষণ করে এবং পরে জমিনকে উল্টিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার চারপার্শ্বের এ সব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণই ছিল মক্কাবাসীর একান্ত কর্তব্য।

আদ জাতি ছিল আহকাফে, তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সামুদ জাতি, তোমরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে পাও, অতএব, তাদের ঘটনা থেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তোমাদের রয়েছে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ
بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

'তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে নিজেদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল তারা কেন (বিপদ মূহুর্তে) তাদেরকে সাহায্য করলো না? বরং তারা তাদের পূজারীদের থেকে উধাও হয়ে গেল। বস্তুতঃ এটিই ছিল তাদের নিজেদের মনগড়া মিথ্যা, আর তারা যা রচনা করতো এটি তাই'।

অনেক কাফের তাদের হাতের বানানো প্রতিমার পূজা করে বলতো, এরা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারবো। তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত

হয়েছে যে, মহাবিপদের সময় তোমাদের ঐসব উপাস্যরা কোথায় ছিল, তোমাদের মহা বিপদের দিনে কেন তারা সাহায্য করতে আসলোনা?

বস্তুতঃ যারা একথা মনে করে যে ঠাকুর দেবতাদের পূজা অর্চনা তাদের জন্যে উপকারী হবে, তাদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিছক মনগড়া এবং ভ্রান্ত ধারণা, এ সম্পর্কে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

'আর (হে রসূল!) স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আমি জ্বীনদের একটি দলকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করি, যারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করছিল, যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হল, তখন তারা একে অন্যকে বলতে লাগলো, নীরবে শ্রবণ কর, যখন পবিত্র কোরআন পাঠ শেষ হল, তখন তারা নিজেদের জাতিকে সতর্ক করার জন্যে ফিরে গেল'।

শানে নজুল

এবনে আবি শায়বা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "বতনে নাখলা" নামক স্থানে কোরআনে করীম পাঠ করছিলেন, তখন কয়েকজন জ্বীন উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে নীচে অবতরণ করলো এবং একে অন্যকে বললো, নীরবে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। এ জ্বীনদের সংখ্যা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল রাজবাআ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।[১]

প্রিয়নবী (দঃ)-এর দরবারে জ্বীনেরা হাজির হল

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মসনদে ইমাম আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ ঘটনা হল নাখলা নামক স্থানের। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামাজ আদায় করছিলেন, তখন জ্বীনেরা আকাশ পথ থেকে নীচে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৬১

অবতরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে দন্ডায়মান হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শোনাবার জন্যে কোরআন পাঠ করেননি, তিনি তাদেরকে দেখেননি। ঘটনার বিবরণ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে "ওকাজ" নামক বাজারের দিকে গমন করছিলেন, সে সময় এ ঘটনা ঘটে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত জ্বীন ও শয়তানরা আসমানের দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাদের নিকট থেকে কোন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারতো এবং সেই খবর তিলকে তাল বানিয়ে তাদের অনুগামীদের নিকট পৌঁছে দিত এবং তারা মানুষের নিকট গায়েবী খবর দিয়ে বাহবা নিত। কিন্তু যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করলেন, তখন থেকে জ্বীন ও শয়তানদের এই অভিযান বন্ধ হয়ে গেল, আসমানের দুয়ারে বসে গেল কঠিন প্রহরা। তাদের কেউ আর আসমানের দ্বারের কাছেও যেতে পারেনা, যদি কাউকে কখনও দেখা যায়, তবে তাদের উপর বর্ষিত হয় উল্কা-বৃষ্টি। এমন অবস্থায় তারা উপলব্ধি করে; এমন কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে, যার পরিণতিতে এ অবস্থা হয়েছে, তাই কি ঘটেছে, তার খোঁজে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জ্বীনেরা ছড়িয়ে পড়ে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তাদের মধ্যে যে দলটি আরব দেশের দিকে যায় তারাই এসে দেখে 'বতনে নাখলা' নামক স্থানে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করছেন। আর ঐ সময়ে জ্বীনেরা সেখানে একত্রিত হয়। তারা কোরআনে করীমের পাঠ শ্রবণ করে মনযোগ সহকারে, পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ও সত্যতা তাদের মনকে আকৃষ্ট করে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, পবিত্র কোরআনের প্রতি তথা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, তারা অনুধাবন করে যে, পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার কারণেই তাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে এবং এজন্যেই আসমানের দ্বারে কঠিন প্রহরা বসে গেছে।

আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে জ্বীনদের অবতরণের এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন। সূরায়ে জ্বীনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১৭

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হযরত মসরুক (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে রাত্রে জ্বীনেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছে, ঐ রাত্রে সর্ব প্রথম কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের খবর দিয়েছিল? তখন মসরুক (রঃ) বললেন, আমাকে আপনার পিতা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, একটি বৃক্ষ জ্বীনদের আগমনের কথা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিল।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) লিখেছেন, এটি ছিল সর্ব প্রথম ঘটনা, এরপরও জ্বীনেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে বারে বারে আসে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) প্রদত্ত বিবরণই এর প্রমাণ।

হযরত আলকামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, সে রাত্রে (জ্বীনদের উপস্থিতির সময়) আপনাদের কেউ কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, না কেউ ছিলেন না। সারা রাত্রই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য ছিলেন। আমি বারবার দুশ্চিন্তা করেছি যে, কোন দুশমন কি তাঁকে ধোকা দিয়েছে? সমস্ত রাতই আমি এ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সুবহে সাদেকের কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেরা নামক গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন, আমরা তাঁকে আমাদের উদ্বেগের কথা জানালাম, তিনি এরশাদ করলেন, আমার নিকট জ্বীনদের প্রতিনিধি এসেছিল, আমি তার সঙ্গে গমন করি এবং জ্বীনদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনাই। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে সে স্থানে নিয়ে যান এবং আমাকে তাদের চিহ্নগুলো দেখিয়ে দেন।

জ্বীনদের মজলিশ সম্পর্কে এবনে মাসউদ (রাঃ)এর বর্ণনা

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা আজ রাত আমার সঙ্গে থাকতে পারে, আজ রাতে আমাকে জ্বীনদের ব্যাপারে মশগুল থাকতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকায় গমণ করে নিজের কদম মোবারক দ্বারা জমীনের উপর একটি চিহ্ন দিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, এখানেই অবস্থান কর। এরপর তিনি তশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছু দূর

যাওয়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কোরআনে করীম পাঠ করতে লাগলেন। এরপর তাঁর চারিপার্শ্বে জ্বীনদের বহুদল এসে একত্রিত হলো, কিছুক্ষণ পর আকাশে মেঘমালা যেমন খন্ড খন্ড হয়ে এদিক সেদিক চলে যায়, তেমনি তারাও চলে গেল। অবশেষে খুব সামান্য সংখ্যকই রয়ে গেল। ভোর পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে ছিলেন, এরপর আমার নিকট তশরিফ আনেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে স্থানে বসিয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, খবরদার! এখান থেকে বের হবেনা, অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? তিনি আরজ করেন, না আল্লাহর শপথ! আমার কয়েকবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমি লোকদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু আমি শুনছিলাম, আপনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, "তোমরা বসে যাও"। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমার আশংকা ছিল, যদি তুমি এখান থেকে একটু বের হও, তবে তাদের কেউ তোমাকে শেষ করে না ফেলে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিছু দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। লোকগুলো ছিল কৃষ্ণ বর্ণের, অপরিচিত, ভয়াবহ, সাদা ধবধবে পোষাক পরিহিত, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "এরা ছিল "নাসীবায়েন" নামক স্থানের জ্বীন", তারা আমার নিকট তাদের খাদ্যের ব্যাপারে আরজী পেশ করেছিল, আমি তাদেরকে হাড় এবং গোবর দিয়েছি। আমি আরজ করলাম, এর দ্বারা তাদের কি উপকার হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হাড়গুলো যখন তারা স্পর্শ করবে, তখন তা গোশতে পরিণত হবে এবং গোবরগুলোর মধ্যে সে খাদ্য পাবে যা খাওয়ার কারণে গোবর হয়েছে। অতএব, কোন ব্যক্তি যেন হাড় এবং গোবর দ্বারা শৌচকর্ম না করে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১৯-২০

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ
اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ
مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى
الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(৩০) তারা বলেছিল, হে আমাদের জাতি! আমরা এমনি একটি কিতাবের পাঠ শুনতে পেয়েছি, যা মুসার পরে নাজিল হয়েছে, যা পূর্বের সমস্ত কিতাবকে সমর্থন করে, যা সত্য ও সরল পথের দিকে হেদায়েত করে।

(৩১) হে আমাদের জাতি! আল্লাহ পাকের দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ পাক তোমাদের গুণাহ মাফ করবেন এবং মর্মান্তিক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রেহাই দেবেন।

(৩২) আর যে আল্লাহ পাকের আহবায়কের প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে (কোথাও পলায়ন করে) আল্লাহ পাকের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না, তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জ্বীনদের একটি দল পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছিল। মক্কার অদূরে "বতনে নাখলা" নামক স্থানে ফজরের নামাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখনই তারা তাঁর নিকট থেকে সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীর আচরণে অত্যন্ত ব্যাথিত হলেন, কোন অবস্থাতেই যখন তারা ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হল না, তখন তিনি ইসলামের আহবান নিয়ে তায়েফ নামক স্থানে সফর করেন। তায়েফের কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম–জুলুম অত্যাচার করে। তায়েফ থেকে মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন কালে যখন তিনি বতনে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন জ্বীনদের এ ঘটনা ঘটে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন যে, জ্বীনদের কি নেক আমলের সওয়াব হয়? কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, নেক আমলের জন্যে তাদের কোন সওয়াব নেই, তবে দোযখ থেকে নাজাতের ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর তাদেরকে বলা হবে–

كونوا ترابا...

অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় তোমরা মাটি হয়ে যাও।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। তাঁর দলীল হল পরবর্তী আয়াতের একটি বাক্যঃ

وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ পাকের আহ্বানে সাড়া দাও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জ্বীনদের জন্যে কি সওয়াব রয়েছে? তিনি বলেছেন হ্যাঁ, সওয়াব আজাব উভয়টিই রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার পাহাড়ের উপর ছিলাম, এমন সময় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, চলনে মনে হয় এই ব্যক্তি জ্বীন। সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, আমার নাম হামা এবনে হীম এবনে লাকিম এবনে ইবলিস। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইবলীস ও তোমার মধ্যে তোমার পিতা ও পিতামহ এই দু'জনের দুরত্বই রয়েছে, তাহলে তোমার

বয়স কত? সে বললো, পৃথিবীর যা বয়স তার চেয়ে একটু কম, আমি তখনও পৃথিবীতে ছিলাম যখন হযরত আদম (আঃ)–এর পুত্র কাবীল হাবিলকে হত্যা করে, এরপর পৃথিবীর অনেক ঘটনা যা সে দেখেছে তার বর্ণনা দিয়েছে। এরপর সে বলেছে, আমাকে ঈসা এবনে মরিয়ম বলেছেন, যদি তুমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ কর, তবে তাঁকে আমার ছালাম পৌছে দিও, আমি তাঁর সালাম আপনার নিকট পৌছালাম এবং আপনার প্রতি ঈমান আনলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এবং তোমার প্রতিও সালাম। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে? হামা নামক জ্বীনটি বললো, আমাকে হযরত মুসা (আঃ) তওরাত শিখিয়েছেন, আর হযরত ঈসা (আঃ) ইঞ্জিল শিখিয়েছেন, আপনি আমাকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে দশটি সূরা শিক্ষা দিলেন।[১]

قَالُوا يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

জ্বীনদের যে দলটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা তাদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে বললো, হে আমাদের জাতি! আমরা এমনি এক কিতাব শ্রবণ করে এসেছি, যা মুসা (আঃ)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে, আর যে কিতাব তার পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহকে সমর্থন করে এবং যে কিতাব সত্যের দিকে আহ্বান করে এবং সরল–সঠিক পথ প্রদর্শন করে, অতএব এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনা এবং যাঁর মাধ্যমে এ আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছে, তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের কর্তব্য।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, জ্বীনদের এ দলটি ছিল ইহুদী; কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى (এ কিতাব মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে) এ বাক্যাংশের অর্থ হলো, এ কিতাব হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়তকে মনসুখ বা রহিতকারী এবং ইতিপূর্বে যত আসমানী গ্রন্থ নাজিল

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

হয়েছে, সেগুলোর সত্যতা বর্ণনাকারী। এই কিতাবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই কিতাব হক্ব বা সত্যের দিকে আহবান করে এবং সরল–সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় অর্থাৎ সঠিক আকীদা বিশ্বাসের শিক্ষা দেয় এবং সঠিক বিধান প্রবর্তন করে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পূর্বে যে সব আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে তৌরাতেই বিধি-নিষেধ বা শরীয়তের আহকাম সর্বাধিক পরিমাণে ছিল। বণী ইসরাঈলের সমস্ত নবীগণ ঐ গ্রন্থেরই অনুসারী ছিলেন, এমনকি হযরত ঈসা (আঃ)–ও একথা বলেছিলেন যে, আমি তৌরাতে কোন পরিবর্তন করতে আসিনি; বরং আমি এসেছি তাকে পরিপূর্ণ করতে। আর এ তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে মুসা! আমি তোমার পর তোমারই ন্যায় একজন নবী প্রেরণ করবো"।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যুগ থেকে জ্বীনদের মধ্যে তৌরাতই ছিল সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত আসমানী কিতাব। আর "বতনে নখলা" নামক স্থানে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে জ্বীনদের যে দলটি পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছিল, তারাও ছিল তৌরাতে বিশ্বাসী। পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে তারা উপলব্ধি করেছিল যে, পবিত্র কোরআনও তৌরাতের ন্যায় আসমানী গ্রন্থ, আর এ কারণেই তারা তাদের জাতির নিকট গিয়ে বলেছে,

سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى

'নিশ্চয় আমরা এমনি এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে'।

يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সত্য ধর্মের পথ-নির্দেশ করে এবং সরল–সঠিক পথ দেখায়। জ্বীনের ঐ দলটি তাদের জাতিকে সম্বোধন করে বলে,

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

তোমরা এই নবীর আহবানে সাড়া দাও, তাঁর প্রতি ঈমান আন, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদের গুণাহ সমূহ মাফ করে দেবেন এবং পূর্বে কৃত অন্যায়ের শাস্তি থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রেহাই দেবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে যেসব গুণাহ হয়েছে, সেগুলো মাফ করবেন, কিন্তু যে সব গুনাহ বন্দার সঙ্গে সম্পর্কীয় বা হক্কুল এবাদের অর্ন্তভুক্ত, সেগুলো ঈমান আনয়নের কারণে মাফ হবেনা, যার হক্ব বিনষ্ট করা হয়, যে পর্যন্ত সে মাফ না করে।

বর্ণিত আছে যে, জ্বীনদের এ দলের তবলীগের কারণে আরো সত্তুর জন জ্বীন ইসলাম কবুল করে এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন "বাতহা" নামক স্থানে ছিলেন। তিনি তাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ সমূহ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকার তাগিদ করেন।

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

'আর যে আল্লাহ পাকের আহবায়কের প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে (কোথাও পলায়ন করে) আল্লাহ পাকের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে পারবেনা, আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা, তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'।

অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর রসূলের আহবানে সাড়া না দেয়, তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, তাঁর অনুসরণ না করে তবে সে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পাবেনা, কেননা আল্লাহর আজাব থেকে পলায়ন বা আত্মগোপন করে থাকার কোন স্থান পৃথিবীতে নেই। যদি আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সে কখনও আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণের আওতামুক্ত হতে পারবেনা, অবশ্যই তার শাস্তি হবে।

এ ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জ্বীন ও মানব জাতি উভয়ের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জ্বীনদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, তাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, আর কোরআনে করীমে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যাতে জ্বীন ও মানব জাতিকে একই সঙ্গে সম্বোধন করা হয়েছে।

যেমনঃ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ (হে জ্বীন ও মানবজাতি!)

জ্বীনেরা জান্নাতে যাবেনা

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, জ্বীনেরা তাদের ঈমান ও নেক আমলের কারণে দোজখের আজাব থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্বীন মোমেন হলেও জান্নাতে যেতে পারবেনা, কেননা তারা ইবলিসের বংশধর। আর ইবলিসের বংশধররা জান্নাতে যেতে পারবেনা, তবে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, জ্বীন যদি ঈমানদার হয়, তবে তাকে ঈমানদার মানুষের ন্যায় বিবেচনা করা হবে।[১]

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর নবীর আহবানে সাড়া দেবেনা, তাকে আল্লাহর আজাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা। এ ব্যাপারে সে কোন সাহায্যকারীও পাবেনা।

اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের রসূলের আহবানে সাড়া দেবেনা, তাঁর কথা মানবেনা, তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে; কেননা, হেদায়েত শুধু আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। আর একথা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-২৬

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا
بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ
كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ
بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩৩) তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে আল্লাহ পাক আসমান সমূহ এবং জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কেন সক্ষম হবেন না? নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৩৪) আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, (সেদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এ দোজখ কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় এটি সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি আস্বাদন কর।

(৩৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসূলগণ। আর তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, তাদেরকে যে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে; সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের একটি মুহূর্ত মাত্র (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে। (আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে) তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়াই (রসূলের দায়িত্ব)। অতএব, তারাই ধ্বংস হবে যারা নাফরমানী করবে।

তফসীরুল কোরআন

ইহুদীরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মাত্র ছয় দিনে আসমান জমীন সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)। ইহুদীদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

'তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে আল্লাহ্ পাক আসমান সমূহ এবং জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কেন সক্ষম হবেন না? নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। এ কারণেই আসমান জমীন সৃষ্টির পর তাঁর ক্লান্তি বোধ করার প্রশ্নই ওঠেনা। যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে জীবিত করা কোন কঠিন কাজই নয়। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানব জাতিকে তিনি একত্রিত করবেন। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয়। তিনি সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর মৃতকে জীবিত করা এমন কোন বড় কাজ নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই মৃতকে জীবিত করা হয়। যদি তা অসম্ভব হতো তবে প্রথমবার সৃষ্টি করাও সম্ভব হতোনা। অতএব, এ সম্পর্কে সন্দেহ করা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۗ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, (সেদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এ দোজখ কি বাস্তব সত্য নয়? এটি সে দোজখই, যার সত্যতা তোমরা পৃথিবীতে অস্বীকার করতে।

قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا

তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই, শপথ হে আমাদের পরওয়ারদেগার!

তখন তারা যত শপথই করুক না কেন এবং সত্যকে যতবারই স্বীকার করুক না কেন, তাদের জন্যে তা আদৌ উপকারী হবেনা, কেননা এ জীবনে কর্ম এবং পরজীবনে ফল।

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি তোমরা আস্বাদন কর। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

(হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসূলগণ।

অর্থাৎ (হে রসূল!) যদি আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার আহবানে সাড়া না দেয়, আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আপনার প্রতি নির্যাতন করে, তবে এটি নতুন কিছু নয়, কেননা ইতিপূর্বে বহু নবী রসূলগণের সঙ্গে এমন ব্যবহারই করা হয়েছে। হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরাউন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরুদ এবং বহু দূরাত্মা কাফের যুগে যুগে নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, কিন্তু তাঁরা হাল ছেড়ে দেননি, বরং সবর করেছেন, (হে রসূল!) আপনিও এমনিভাবে সবর করুন।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ প্রসঙ্গে

আলোচ্য আয়াতে কোন্ কোন্ রসূলকে "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে।

এবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীই ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পৃথিবীতে এমন কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁর মধ্যে এ গুণটি ছিলনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) ব্যতীত সমস্ত নবী রসূলগণই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করেছিলেন, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

"(হে রসূল!) আপনি ইউনুস (আঃ)-এর ন্যায় হবেন না", অর্থাৎ তাঁর ন্যায় তাড়াহুড়া করবেন না'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী রসূলগণের উল্লেখ সূরা আনআমে রয়েছে। তাঁদের সংখ্যা হলো আঠার। তাঁরা হলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত হারুণ (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত আলয়াসা (আঃ), হযরত লুত (আঃ), এ সমস্ত নবী রসূলগণের উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এরাই সে সব লোক যাঁদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন অতএব, তাঁদেরই অনুসরণ কর"।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, أُولُوا الْعَزْمِ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী রসূলগণ হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী হলেন ছয় জন। (১) হযরত নূহ (আঃ), তিনি তাঁর জাতির অকথ্য নির্যাতনে সবর অবলম্বন করেছেন। (২) হযরত ইব্রাহীম (আঃ), নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল, তিনি তাতে সবর করেছিলেন। (৩) হযরত ইসহাক (আঃ), তিনি জবেহ করার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, হযরত ইসহাক (আঃ)-ই ছিলেন জবীহুল্লাহ, ইসমাঈল (আঃ) নন (অথচ এ কথাটি অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থী, তাঁদের মতে জবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। (৪) হযরত ইয়াকুব (আঃ), তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হারিয়ে যাওয়ার এবং নিজের অন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। (৫) হযরত ইউসুফ (আঃ), তিনি অরণ্যের কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এবং কারাগারে অবস্থানের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। (৬) হযরত আইয়ুব (আঃ), তিনি কুষ্ঠ রোগের কারণে চরম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সবর অবলম্বন করেছেন। হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি "উলুল আজম" রসূলের সংখ্যা হলো ৩১৩ জন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর মত হল যাঁদেরকে জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তাঁরাই হলেন "উলুল আজম" নবী রসূল।[১]

১। আদদুররুল মনসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উলুল আজম বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী রসূল ছিলেন পাঁচজন; যাঁদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত দেয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন, হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের কথা বিশেষভাবে একটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّإِبْرَاهِيْمَ
وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

এমনিভাবে এ পাঁচজন নবীর উল্লেখ অন্য আয়াতেও রয়েছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى

যাহোক, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, যেহেতু এই পাঁচ জন নবীর উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তাই তাঁরাই হলেন أُوْلُوا الْعَزْمِ "উলুল আজম" বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন ছয় জন। হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। উপরোল্লিখিত আয়াতে হযরত আদম (আঃ) ব্যতীত আর পাঁচ জনের উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শরীয়তের বাহক ছিলেন। তাঁদের পরে যাঁরা নবী হয়েছেন তাঁরাও এঁদেরই শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। আর হযরত আদম (আঃ) সর্বাগ্রে আগমন করেছেন। তাঁকে প্রদত্ত শরীয়তের উপরই তিনি আমল করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার মসরুক (রঃ) বলেছেন, আমাকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে দুনিয়ার প্রতি সামান্য আকর্ষণও সমীচিন নয়। হে আয়েশা! আল্লাহ পাক উলুল

আজম ব্যক্তিদের জন্যে দুনিয়ার কষ্টের উপর সবর করা এবং লোভনীয় মোহনীয় বস্তু সমূহ পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করেছেন, আমার প্রতিও সে আদেশই হয়েছে যা অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণের প্রতিও হয়েছিল, আল্লাহ্ পাক আমার জন্যে তাই পছন্দ করেছেন, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।[১]

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

(হে রসূল!) আপনি সবর করুন যেভাবে অন্যান্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবীগণ সবর অবলম্বন করেছেন।)

তাই আমিও তাঁদের ন্যায় সবর অবলম্বন করবো, যেমনটি তাঁরা করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, সে দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে রয়েছে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, যাঁকে তার সম্প্রদায় প্রহার করতে করতে রক্তাপ্লুত করে ফেলেছিলো, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে মাফ করে দিও, এরা জানেনা। এ ঘটনা স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই যা তায়েফ নামক স্থানে ঘটেছিল, কিন্তু তিনি নিজেকে গোপন করে এভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।[২]

وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا
إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

আর (হে রসূল!) তাদের (আজাবের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, তাদেরকে যে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, সেদিন তাদের মনে হবে তারা যেন দিনের একটি মুহূর্ত মাত্র (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে। (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে) তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়াই (রসূলের দায়িত্ব) অতএব, তারাই ধ্বংস হবে, যারা নাফরমানী করবে।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, দুরাত্মা কাফেরদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি অবশ্যই হবে, হে রসূল!

১। তফসীরে আদদুররুল মনসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৬৫-৬৬

আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, যথা সময়ে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, আপনি এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। দৃঢ় সংকল্প নবী রসূলগণ ইতিপূর্বে যেভাবে কাফের মুশরেকদের জুলুম অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করেছেন হে রসূল! আপনিও সে নীতিই গ্রহণ করুন। অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি অতি সত্বর আজাব নাজিল হওয়ার দোয়া করবেন না, আজাবের জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে আর সে নির্দিষ্ট সময়ে আজাব অবশ্যই আসবে। অতএব, কাফেরদের শাস্তির ব্যাপারে ব্যাকুল হবেন না, সবর অবলম্বন করুন।

কাফেররা যেহেতু কেয়ামতের উপরে বিশ্বাস করতো না, এজন্যে তারা কেয়ামতের জন্যে তাড়াহুড়া করতো। কিন্তু যখন কেয়ামত এসে পড়বে তখন তাদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না। তাদের মনে হবে দুনিয়ার জীবন অতি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেছে।

لَمْ يَلْبَثُوٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

তাদের মনে হবে তারা যেন দিনের একটি মুহূর্ত মাত্র পৃথিবীতে অবস্থান করেছে। (কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে দুনিয়ার জীবনকে তারা অতি সামান্য মনে করবে)।

بَلٰغٌ

আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং ভাল-মন্দ বুঝিয়ে দেয়া রসূলের কর্তব্য, এ কর্তব্য সম্পাদিত হলো; অর্থাৎ এই যে উপদেশ দেয়া হলো, অথবা এই যে সূরা নাজিল হলো বা এই কোরআনের যে মহান বাণী প্রচারিত হলো, এটিই রসূলের কাজ যা তিনি করেছেন।

কিন্তু এতদসত্বেও যারা রসূলের উপদেশ মানেনা, যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তারাই ধ্বংস হবে, তারাই নিপাত যাবে। মূলতঃ যারা কৃতকর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে ধ্বংস করে তথা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় শুধু তারা আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়। আল্লাহ পাক ন্যায় বিচার করে থাকেন, অবিচার করেন না।

একটি দোয়া

আলোচ্য আয়াতের কয়েকটি বাক্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি দোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে; তেবরানী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত

হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তুমি কিছু পেতে চাও অথবা নাজাত লাভ করতে প্রয়াসী হও তবে এই দোয়া পাঠ করবেঃ[১]

لا اله الا الله وحده لا شريك له العلى العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السموات والارض ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحاها كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ هل يهلك الا القوم الفاسقون اللهم انى اسئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৪/৮/৯৬ মোতাবেক ১৮ই রবিউল আউয়াল রোজ রবিবার রাত সাড়ে ৯টায় সূরায়ে আহকাফের তফসীর রচনা শেষ হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫১
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৩৬

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা মোহাম্মদ

سورة محمد وهي مدنية ثمان وثلثون اية واربع ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) যারা অস্বীকার করেছে (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে) আর যারা আল্লাহ পাকের পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ পাক তাদের কর্মকে ব্যর্থ করেছেন।

সূরায়ে মোহাম্মদ প্রসঙ্গে

এই সূরা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ, এতে ৪ রুকু ও ৩৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ

এই সূরাকে "সূরাতুল কেতাল"ও বলা হয়, কেননা এতে জেহাদের বিবরণ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, একটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটিই মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো-

وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً .... فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের সফরে যখন মক্কা শরীফ

থেকে রওয়ানা হন, তখন বারংবার মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি প্রিয় শহর, আর আমার নিকটও তুমি অত্যন্ত প্রিয় শহর, যদি মক্কাবাসী আমাকে বাধ্য না করতো তবে আমি কখনও এই শহর থেকে হিজরত করতাম না"। তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

যেহেতু এ আয়াতখানি হিজরতের সফরে মক্কার অদূরে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় পৌঁছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানী করে, যারা পাপীষ্ঠ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। একথার উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কুফরী ও নাফরমানী সত্ত্বেও যারা গরীব দুঃখীকে সাহায্য করে, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে, তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এরই জবাবে আল্লাহ পাক সূরার প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতাকেও মানেনা, তদুপরি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বরবাদ হয়ে যায়; কেননা, ঈমান ও এখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোন নেক আমলই কবুল হয়না।

সূরার মূল বক্তব্য

এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমন, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্য-সাধনায় বাধা দেয়, তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ। এরপর জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কখন আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর

মক্কার কাফেরদের ধ্বংসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মদীনা মোনাওয়ারার মোনাফেকদের ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার পরিসমাপ্তিতে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রাহে জেহাদের আহবান জানানো হয়েছে, কেননা জেহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি পৃথিবীতে বিজয় এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরার আমল

যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে আবে জমজম দ্বারা ধৌত করে পান করে, সে মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে ঐ পানি দ্বারা গোসল করে, সে অনেক রোগ থেকে বিশেষতঃ চর্ম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

স্বপ্নের তাবীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তার নিকট হযরত আজরাঈল (আঃ) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে আসবেন এবং তার হাশর হবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে।

শানে নজুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরাই ধ্বংস হবে। একথার উপর এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা নিরন্নকে খাবার দেয়, যারা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, সেলায়ে রেহমী করে তাদের সকল সৎ কাজই বিনষ্ট হয়ে যাবে? অথচ কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

"যে সামান্যতম সৎকাজও করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে"।

এ প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যারা অস্বীকার করেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে, এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতাকে, শুধু তাই নয়, বরং তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ পাক তাদের সকল আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা, কোন সৎকাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান। যেহেতু তারা কাফের এবং বিদ্রোহী, জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, তাই তাদের কোন সৎকর্মই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

যে কর্মের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা না হয়, তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না। তবে দুনিয়াতে তাদের এসব কল্যাণকর কাজের জন্যে সুনাম হতে পারে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) আলোচ্য আয়াতের اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবেঃ আল্লাহ পাক কাফেরদের গোপন চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছেন। মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার এটিই অনিবার্য শাস্তি।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। (দুই) অথবা এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।[১]

বস্তুতঃ অমুসলিমরা যে সব কাজকে সৎকাজ এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, কেয়ামতের দিন সে কাজগুলোর কোনই গুরুত্ব হবেনা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকাজই যে গ্রহণযোগ্য হয়না, সেদিন তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো সৎকাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তথা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার জন্যে তার কুফরী ও নাফরমানীই যথেষ্ট; অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দান এর শর্ত নয়, তবে মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা শুধু কুফরী ও

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৩৬

নাফরমানীতেই যে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষকে ঈমান আনয়নেও বাধা দিত এবং কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করতো।[১]

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় মাগরেবের নামাজে এ সূরার প্রথম আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করতেন।[২]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ (২)
ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (৩)
فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۤ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ
اَوْزَارَهَا ڔ ذٰلِكَ ڔ وَلَوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (৪)
سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (৫) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (৬)

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা- ১০১২

২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৪১

তরজমা

(২) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস করেছে, আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য। আল্লাহ পাক তাদের গুণাহ মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন।

(৩) আর তা-এজন্যে যে, কাফেররা বাতিলের অনুসারী হয়েছে, আর মোমেনগণ তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসারী হয়েছে, এভাবেই আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।

(৪) অতএব, তোমরা যখন রণাঙ্গনে কাফেরদের মোকাবেলা করবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর (হত্যা কর)। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে, তখন তাদেরকে সুদৃঢ়রূপে বেধে ফেল (বন্দী কর)। এরপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, অন্যথায় তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে। এটিই বিধান। তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা নিতে চান। আর যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ দেয়, আল্লাহ পাক কখনো তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেবেন না।

(৫) তিনি অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন।

(৬) আর আল্লাহ পাক তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে করীমের বর্ণনা-শৈলীর এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, যেখানে ঈমান ও নেক আমলের কথা বলা হয়, সেখানেই মাগফেরাত ও সওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত ও উত্তম রিজক"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

"আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আমি তাদের গুণাহ সমূহ দূরীভূত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার দান করবো"।

ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদের জন্যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে"।

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

আর যারা ঈমান এনেছে সে সব বিষয়ের প্রতি, যা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়তের প্রতি ঈমান এনেছে, এর দ্বারা শরীয়তে মোহাম্মদীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শরীয়তে মোহাম্মদীয়ায় ঈমানের প্রতি গুরুত্ব

এতে একথা প্রমাণিত হয়, শরীয়তে মোহাম্মদীয়ার প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ব্যতীত কারো ঈমানই পরিপূর্ণ হয়না। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে দু'বার امنو শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় বার اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ বলে শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নের তাগিদ করা হয়েছে। যেভাবে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যারা কাফের হয়েছে, এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে তথা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে। তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ হয়েছে। আর কাফেরদের বিপরীতে মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে, তাঁর শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং তা মেনে চলছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মোমেন। এর তাৎপর্য

হলো এই, শরীয়তের কোন বিষয়কে মানা আর কোন বিষয়কে অস্বীকার করা ঈমান বিরোধী কাজ, কেননা বিদায় হজ্বের দিনে আরাফার ময়দানে পবিত্র কোরআনের যে আয়াতখানি নাজিল হয়েছে তাতে ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের দ্বীনকে, আর তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি, আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি"।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, ইতিপূর্বে মানুষ একই শরীয়ত মেনে চলতে বাধ্য ছিলনা, কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর সমগ্র মানব জাতির জন্যে একই শরীয়ত, একই জীবন বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে এ বিধান মেনে চলতে হয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত যেমন চিরদিনের জন্যে, তেমনি তাঁর শরীয়তও চিরস্থায়ী। এ শরীয়ত পূর্বেকার সকল শরীয়তকে রহিত করে, কিন্তু এ শরীয়তকে রহিতকারী আর কোন শরীয়ত কখনো আসবেনা।

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং শরীয়তে মোহাম্মদী মেনে চলে, তাদের জন্যে সুসংবাদ হলো এই যে, আল্লাহ পাক তাদের গুণাহ মাফ করে দেবেন। তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন, অর্থাৎ দুশমনের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং পাপাচার এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের তৌফিক দান করবেন, এরপর আখেরাতে তারা লাভ করবে চিরশান্তি।

আলোচ্য আয়াতে (وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়না। নাম মোবারকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া তাই একান্ত জরুরী।[১]

وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক আজীবন তাদের হেফাজত করবেন।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا বলে মক্কার মোশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; আর اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মদিনায়ে মোনাওয়ারার আনসারগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এভাবে নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দুনিয়ার সব কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সকল মোমেনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ঈমানের বরকত

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো মুসলমান ও কাফের উভয়ই গুণাহর কাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু ঈমান ও নেক আমল থাকার কারণে এবং সত্য ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার বরকতে মুসলমানদের সৎ কাজগুলো আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় এবং ঈমানের কারণে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মাফ করেন, কিন্তু কাফেরদের ঈমান না থাকার কারণে তথা সত্য ধর্মকে অস্বীকার করার কারণে তাদের গুণাহ মাফ হওয়া তো দূরের কথা, তাদের কৃত কল্যাণকর কাজগুলোও বিনষ্ট হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আখেরাতে নাজাত লাভের জন্যে তথা চির শান্তি নিকেতন, জান্নাত লাভের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। এর কোন বিকল্প নেই, সৎকাজ যে-ই করুক না কেন, তার শুভ-পরিণতি হলো সুনাম, তা মুসলমান কাফের সকলেই লাভ করে। কিন্তু সৎকাজ দ্বারা পরকালীন জীবনে উপকৃত হতে হলে ঈমান ব্যতীত গত্যন্তর নেই। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কাফেরদের মধ্যে কারো কারো সৎকাজও থাকে, কিন্তু কুফরী অবস্থায় আল্লাহ পাক কোন সৎকাজই কবুল করেন না।[২]

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন,তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-(৪), পৃষ্ঠা-১৩৮-৪১

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-(৬), পৃষ্ঠা-৫১

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ

আর তা এজন্যে যে, কাফেররা বাতিলের অনুসারী হয়েছে, আর মোমেনগণ তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসারী হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে "বাতিল" শব্দটি দ্বারা শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফেররা শয়তানের অনুসরণ করেছে, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের "বাতিল" শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতের হক্ব শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআন বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ মোমেনগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তাদের জীবন-সাধনাকে সার্থক করেছে, পক্ষান্তরে কাফেররা শয়তানের অনুসারী হয়ে জীবন-সাধনাকে শুধু ব্যর্থ করেনি; বরং ধ্বংস করেছে এবং বিপদগ্রস্ত হয়েছে।[১]

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

'এভাবেই আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন'।

অর্থাৎ মানুষ যেন ভাল-মন্দ এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, এবং জীবন-সাধনায় সরল সঠিক পথ গ্রহণ করতে পারে, এজন্যে আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত দ্বারা সব কিছু বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন, যাতে করে গোমরাহীর অমানিষা কেটে যায়, সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়।

সত্য-অসত্যের সংঘাত চিরন্তন

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হক্ব ও বাতিল তথা সত্য-অসত্যের সংঘাত অনিবার্য, আর তা কোন সাময়িক বিষয় নয়; বরং তা চিরস্থায়ী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নমরুদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের চক্রান্ত এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের দৌরাত্ম-এ সত্যেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমান ও কাফেরদের সংঘাতের কথা বলে মুসলমানদের জন্যে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- (২৬), পৃষ্ঠা- ৩৮।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

"অতএব, তোমরা যখন রণাঙ্গনে কাফেরদের মোকাবেলা করবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর (তাদেরকে হত্যা কর), অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে, তখন তাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেল (বন্দী কর), এরপর ইচ্ছা হয় তোমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, আর ইচ্ছা হয় মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিও, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে। এটিই বিধান যা অবশ্য পালনীয়। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যে তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা নিতে চান"।

জেহাদের আদেশ

এ আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সত্যদ্রোহী দূরাত্মা কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।

فَضَرْبَ الرِّقَابِ

কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর, অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা কর। অন্যান্য অঙ্গে আঘাত করলে মানুষ আহত হয়, নিহত হওয়া জরুরী নয়, তাই গর্দানে আঘাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য, দুশমন যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, অথবা যে কোনভাবে কাফেরদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন অবস্থাতেই পলায়ন করা বৈধ নয়; কেননা এটি কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই বীর বিক্রমে, অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করা কর্তব্য।

حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করবে, তখন তাদেরকে সুদৃঢ় ভাবে বেধে ফেল তথা তাদেরকে বন্দী কর; তখন ইচ্ছা হলে তাদের প্রতি

অনুগ্রহ করতে পার, আর ইচ্ছা হলে কোন প্রকার মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার, অথবা মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছাড়তে পার, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ এবং فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ আয়াত দ্বারা।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং এবনে জোরায়েজও (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

আওজায়ী (রঃ)ও এ মত পোষণ করতেন।

একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)–ও এ মতই সমর্থন করতেন। অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াত মনসুখ নয় মোহকাম। যদি বন্দী কাফের হয়, পুরুষ হয়; নারী নয়, পাগল নয় তবে তা রাষ্ট্র প্রধানের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে বন্দীকে হত্যা বা মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে গোলাম বানিয়ে নিতে পারেন, কিংবা তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে মুক্তিপণ ব্যতীতই তাকে মুক্তি দিতে পারেন। অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ সাপেক্ষে তাকে ছেড়ে দিতে পারেন। অথবা মুসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময়ও করা যেতে পারে। এ মত পোষণ করেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম।

হযরত হাসান বসরী (রঃ), আতা (রঃ), সুফিয়ান সওরী (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), শেখ এসহাক (রঃ), প্রমুখ তফসীরকারগণ এ মতই পোষণ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً নাজিল করেন।

ইমাম বা রাষ্ট্রপতির অধিকার থাকে এর যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করার। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এ মতের উপর আমল করেছেন এবং তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও একই পন্থা অনুসরণ করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত

হোদায়বিয়ার চুক্তির সময় কোন মুক্তিপণ ব্যতীতই বন্দীদেরকে আজাদ করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আশিজন লোক "তানয়ীম" নামক পাহাড় থেকে অবতরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে তাদেরকে বন্দী করা হয়। এরপর তিনি তাদেরকে মুক্তিদান করেন। আর এ সম্পর্কেই নাজিল হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

(মুসলিম শরীফ)

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অর্থাৎ যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, দুশমনকে সম্পূর্ণ পরাভূত করার পর মুসলিম বাহিনী ব্যতীত আর কেউ যখন না থাকে, অথবা যদি দুশমন শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اوزار শব্দটির অর্থ হলো গুণাহ্ অর্থাৎ যুদ্ধবাজ মোশরেকরা যদি তাদের গুণাহ্র বোঝা ফেলে দেয় তথা কুফরী ও নাফরমানী থেকে তওবা করে মুসলমান হয়।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, حرب শব্দটির অর্থ হল তোমাদের যুদ্ধ। আর اوزار শব্দটির অর্থ হল মোশরেকদের গুণাহ অর্থাৎ তোমাদের লড়াই ও জেহাদের কারণে মোশরেকরা যদি পাপাচার পরিহার করে, তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়।

মূলতঃ দুশমনকে আঘাত করা বা বন্দী করা মুক্তিপণ ব্যতীত রেহাই দেয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে আযাদ করা- এসব কর্মের ফল হবে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া এবং দুশমনদের শক্তি শেষ হয়ে যাওয়া, আর যুদ্ধ করার শক্তি না থাকা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অবস্থা তখন হবে যখন হযরত ঈসা (আঃ) আরতরণ করবেন।

হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকবে এবং বিজয়ী হবে, এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (আবু দাউদ শরীফ)।

আল্লামা বগভীর বর্ণনায় একথাটি সংযোজিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন থেকে আল্লাহ পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন, তখন থেকে জেহাদ অব্যাহত রয়েছে, এমনকি উম্মতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে।

আয়াতের মর্মকথা

যেহেতু সত্য-মিথ্যার সংঘাত অনিবার্য, তাই যখন কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়াই হবে, তখন মুসলমানদের কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরষা রেখে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করা। অবশেষে তুমুল যুদ্ধের পর যখন দুশমনের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়বে এবং কাফেরদের অনেকে বন্দী হয়ে আসবে, তখন জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে বন্দী বিনিময় করা বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে রেহাই দেয়া, অথবা মুক্তিপণ ব্যতীত তাদেরকে মুক্ত করা, অথবা গোলাম-বাঁদী বানিয়ে রাখা বা তাদেরকে নিজেদের নিকট জিম্মি করে রাখা বা তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া-প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক এসব বিষয়ে খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মুক্তিপণ আদায় করে কাফেরদেরকে মুক্তি দিলে মুসলমানদের আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি মুক্তিপণ ব্যতীত কাফেরদেরকে মুক্ত করা হয়, তবে এ উদারতা তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং ইসলামকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যে পর্যন্ত না যুদ্ধ বন্ধ হয়, সে পর্যন্ত মুসলমানদের অস্ত্র সংবরণ করার অনুমতি নেই; বরং যে কোন মূল্যে জেহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা।

ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ এটিই বিধান (যা উল্লেখ করা হল), তা যথাযথভাবে পালন করা তোমাদের কর্তব্য। আর আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যে তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা নিতে চান (এজন্যে জেহাদের আদেশ দিয়েছেন)। আর যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ দেয়,আল্লাহপাক কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেবেন না। তাদেরকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছিয়ে দেবেন। এটি আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি যে, যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অবশ্যই তার শুভ-পরিণতি দান করবেন, কখনও এমন হবেনা

যে আল্লাহর রাহের শহীদ তার যোগ্য মর্তবা পাবেনা।

এ আয়াতে জেহাদের আদেশের হেকমতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, আর তা হল, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কাফেরদেরকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারতেন, যেমন আদ ও সামুদ জাতিকে আসমানী গজব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জেহাদের আদেশের মধ্যে দু'টি বিশেষ হেকমত রয়েছে। (১) আল্লাহ পাক পরীক্ষা করতে চান যে, কে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে চায়, আর কে এ আদেশের ব্যাপারে অবহেলা করে। (২) জেহাদের আদেশ দিয়ে কাফের মোশরেকদেরকেও আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দিতে চান। আদ ও সামুদ জাতির ন্যায় যদি তাদেরকেও আসমানী গজব দ্বারা ধ্বংস করা হয়, তবে তারা কখনও আত্ম-সংশোধনের সুযোগ পেত না।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ④

আর যারা আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করে তারা অমরত্ব লাভ করে, চিরঞ্জীব হয়, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের মর্তবা অতি উচ্চে। আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করবেন মহান প্রতিদান।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এস্ফেহানী তারগীবে এবং বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন; প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শহীদ তিন প্রকার। (১) সে ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে নিজের জান-মাল নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হয় এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যদি এ ব্যক্তি এ অবস্থায় প্রাণ দেয়, তবে তার সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং তাকে কবরের আজাব থেকেও রক্ষা করা হবে। কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। জান্নাতী হুরগণ তাঁর স্ত্রী হবে, তাঁকে সম্মানের ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে, তাঁকে মুকুট পরানো হবে। (২) ঐ ব্যক্তি যে সওয়াবের আশায় জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহ পাকের রাহে বের হয়, সে দুশমনকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করতে চায় না, এই ব্যক্তি যদি জেহাদে মৃত্যুবরণ করে তবে সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। (৩) সে ব্যক্তি যে নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং দুশমনকে হত্যা করতে প্রয়াসী হয় এবং নিজের প্রাণও উৎসর্গ করতে চায়, কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তি তরবারী কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় হাজির হবে। যখন লোকেরা উপবিষ্ট থাকবে, তখন এই শহীদগণ

বলবে, আমরা আল্লাহর জন্যে প্রাণ দিয়েছি, আমাদের জন্যে প্রশস্ত স্থান ছেড়ে দাও, তাই তারা আরশের নীচে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট হবে। আর শহীদগণ মানুষের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হতে দেখবেন, তাদের মৃত্যু চিন্তাও থাকবে না, আর ইসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিলেও তারা ভীত হবেন না এবং পুলসেরাত পার হওয়ার চিন্তা তাদের থাকবেনা, যা তারা চাইবে তাই তারা লাভ করবে, যে ব্যাপারে তারা সুপারিশ করবে, তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, জান্নাতের যে অংশ তারা পছন্দ করবে, সেখানেই তাদেরকে থাকতে দেয়া হবে।

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত- وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে আল্লাহ পাক তাদের এ সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।) ওহোদের যুদ্ধের দিন নাজিল হয়েছে।[১]

এমন অবস্থায় যখন অনেক মুসলমান আহত এবং রক্তাপ্লুত ছিলেন এবং শহীদগণের দেহ রণাঙ্গনে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, আর মোশরেকরা তাদের মূর্তির নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। তার প্রতি-উত্তরে মুসলমানগণ নারায়ে তকবীর "আল্লাহু আকবার এবং আল্লাহু আ'লা ও আযাল্ল" উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, মোশরেকরা বলেছিল, "আমাদের ওজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের ওজ্জা নেই"। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ

"আল্লাহ পাক আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোন অভিভাবক নেই"

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝

'আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন'।

অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাক তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। দুনিয়াতে যে সব মুজাহেদ শাহাদত বরণ করেননি, তাদেরকেও শহীদদের ফিরিস্তিতে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং শহীদদের সওয়াব তাদেরকে দান করা

১. তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-(৬), পৃষ্ঠা-৫৩

হবে; কেননা, তাঁরাও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে এবং আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করার লক্ষ্যেই ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, আখেরাতে তাদের অবস্থা ভাল করার পন্থা হলো, যারা শাহাদত বরণ করেছেন বা যারা শহীদ হননি, আল্লাহ পাক তাদের সকলের গুণাহ মাফ করবেন এবং তাদের নেক আমল কবুল করবেন। যাদের কোন হক্ব তাদের দায়িত্বে থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ পাক সওয়াব এবং উত্তম বিনিময় দ্বারা সন্তুষ্ট করে দেবেন।

আবু নায়ীম হযরত সাহাল এবনে সাদের সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিন প্রকার লোকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার ঋণ পরিশোধ করবেন।

(১) সে ব্যক্তি, যে আশংকা করে, দুশমন মুসলিম দেশের উপর হামলা করবে এবং তার কোন শক্তিও নেই, এমন অবস্থায় সে ঋণ করে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করে এবং শক্তি অর্জন করে, আর ঋণ পরিশোধের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার ঋণ পরিশোধ করবেন।

(২) সে ব্যক্তি, যার কোন মুসলমান ভাইয়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত মুসলমানের কাফনের ব্যয়ভার গ্রহণের শক্তি তার না থাকে, এমন অবস্থায় ঋণ করে সে কাফনের কাপড় ক্রয় করে এবং ঋণ পরিশোধের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করবেন।

(৩) সে ব্যক্তি, যার ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হয়, এমন অবস্থায় ঋণ করে সে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে, যেন তার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার ঋণ পরিশোধ করবেন।

তেবরাণী এ পর্যায়ে আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন যখন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে, জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীদেরকে দোজখে প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা পরস্পরের হক্ব ছেড়ে দাও, এর বিনিময়ে সওয়াব প্রদান আল্লাহ পাকের দায়িত্বে রয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) শহীদগণের উচ্চ মর্তবার বর্ণনায় মসনদে আহমদে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৭৩-৭৪

সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণকারীকে ছয়টি নেয়ামত দান করা হয়ঃ

(১) শহীদের রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত গুণাহ মাফ হয়ে যায়।

(২) তাকে জান্নাতের আবাসস্থল দেখিয়ে দেয়া হয়।

(৩) হুরদের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পাদন করা হয়।

(৪) মহা বিপদেও সে নিরাপদ থাকে।

(৫) কবর আজাব থেকে তাকে রক্ষা করা হয়।

(৬) তাকে ঈমানের অলংকারে অলংকৃত করা হয়।

سَيَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ

"আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন"।

তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন, এর আরো একটি ব্যাখ্যা হলো এই যে, শহীদগণ জান্নাতে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান নিজে নিজে এভাবে চিনে ফেলবে, যেভাবে দুনিয়াতে তাদের বাড়ী-ঘর চিনত।[১]

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

'আর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেকে জানিয়ে দিয়েছেন'।

অর্থাৎ জান্নাতে কারো কোন প্রকার নির্দেশনা ব্যতীতই প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে পৌছে যাবেন, যেন তারা জন্মলগ্ন থেকেই এ স্থানে বসবাস করে আসছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সে আল্লাহ্ পাকের! যিনি আমাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে নিজের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, বাড়ী–ঘরকে এতটা চিনতে পারনা, যতটা জান্নাতীগণ তাদের স্ত্রীদেরকে এবং তাদের ঘরকে চিনতে পারবে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা- ২৬, পৃষ্ঠা-৩২
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৭৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

তরজমা

(৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ পাককে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখবেন।

(৮) আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে সর্বনাশ এবং আল্লাহ পাক তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।

(৯) তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক যা নাজিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের আমলকে বরবাদ করেছেন।

(১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা এবং দেখেনা যে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কী হয়েছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, আর এ কাফেরদের জন্যেও রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

(১১) তা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদের নির্দেশের পাশাপাশি এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে সাহায্য করার তথা দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧

হে মোমেনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য কর, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ কর, আল্লাহ পাকও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের মনোবল অটুট রাখবেন, দুশমনের মোকাবেলায় তোমাদের অটল-অবিচল রাখবেন। যেভাবে দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুশমনের মোকাবেলায় অটল-অবিচল রাখবেন, ঠিক তেমনিভাবে পুলসিরাতেও তোমরা আনায়াসে পার হয়ে যাবে, পুলসিরাতে তোমাদের পদস্খলন হবে না। অথবা এর অর্থ হল, যদি তোমরা আল্লাহর দলকে সাহায্য কর, তথা যারা দুনিয়াতে আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করে তাদেরকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। দুশমনের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে অটল-অবিচল রাখবেন।

আলোচ্য আয়াতে মোমেনগণকে সম্বোধন করে দ্বীন ইসলামের বা আল্লাহর রসূলের সাহায্য করার জন্যে মোমেনদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং যারা দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে এগিয়ে আসবে তাদেরকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মোমেনদেরকে সাহায্য করার তাৎপর্য হল, ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করা, মোমেনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে অটল-অবিচল রাখা।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٨

'আর যারা কাফের তাদের ধ্বংস অনিবার্য'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, تعسا শব্দটির অর্থ হল, তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকবে।

আর আবুল আলীয়া বাক্যটির অর্থ বলেছেন, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের ব্যর্থতা অবধারিত।

তফসীরকার এবনে যায়েদ বলেছেন, কাফেরদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হল দুনিয়াতে বিভ্রান্ত হওয়া, আখেরাতে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মূলতঃ কোন লোক যদি হোচট খেয়ে পড়ে যায়, আর কেউ তাকে উঠাতে না

চায়, তবে সে অবস্থাকে تسعا বলা হয়।

وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

আর আল্লাহ পাক তাদের আমলকে বরবাদ করে দেবেন, কেননা তারা শয়তানের অনুগামী ছিল।

ذٰلِكَ

তাদের এই অবনতি শুধু এজন্যে যে,

بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

আল্লাহ পাক যা নাজিল করেছেন, তা কোরআনে করীম; তারা তা অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েছেন।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾

'তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? তাহলে তারা দেখত, ইতিপূর্বে কাফেরদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এ কাফেরদেরও অনুরূপ পরিণতিই হবে'।

পূর্বকালে কাফেরদেরকে হত্যা করা হয়েছে, কোথাও বন্দী করা হয়েছে, আর কোথাও আসমানী গজব দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আর এ কাফেরদের তথা যার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছে, তাদেরও অনুরূপ শাস্তি হতে পারে। যদি তারা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করতো, তবে পূর্বকালের কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কেননা, ইতিপূর্বে ভূমিকম্প ঝড়-তুফান প্রভৃতি দ্বারা কোন কোন অবাধ্য জাতির মূলোৎপাটন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, তাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন, আখেরাতেও তাদের অনুরূপ শাস্তি হবে।[১]

আর যেহেতু শাস্তির মূল কারণ হল তাদের কুফরী, নাফরমানী এবং সত্যদ্রোহীতা, আর তা পূর্বের কাফেরদের ন্যায় এ কাফেরদের মধ্যেও সমভাবে বর্তমান রয়েছে, তাই পূর্বের কাফেরদের ন্যায় এদের শাস্তিও অনিবার্য।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, বর্তমান যুগে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- (২৬), পৃষ্ঠা- ৪৫
তফসীরে ববির, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৫০

উপায়ে পৃথিবীর বহু দেশে পূর্বের জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এতে বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণের কার্যকারিতা প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাফল্যকে বড় করে দেখানো হয়, কিন্তু পবিত্র কোরআন এক্ষেত্রে যে পথ-নির্দেশনা দিচ্ছে তা হলো এই যে, পূর্বকালের জাতিগুলোকে আল্লাহ পাক তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করেছেন, অতএব, তোমরা তাদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর, কুফরী ও নাফরমানী পরিহার কর। আরো একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যনীয় যে, পূর্বকালে কুফরী ও নাফরমানীর কারণে যাদের শাস্তি হয়েছে, অনুরূপ শাস্তি এ কাফেরদেরও হতে পারে। এ সাদৃশ্য অপরাধ এবং শাস্তির ব্যাপারেই সীমিত, তবে একই প্রকার শাস্তি হওয়া জরুরী নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? যদি তা করতো তবে স্বচক্ষে দেখতে পেত যে, পূর্বকালের কাফেরদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছিল।

বস্তুতঃ নাজাতের পথ একটিই, আর তা হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও একীন, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

এর কারণ এই যে মোমেনদের অভিভাবক হলেন স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, আর নিশ্চয় কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকই মোমেনদের সাহায্য করেন, কিন্তু কাফেরদের কোন সত্যিকার অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই, মোমেনদের অভিভাবক বা প্রকৃত বন্ধু এক আল্লাহপাক, তিনিই তাদেরকে পথ-নির্দেশনা দান করেন। অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আল্লাহ পাক মোমেনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন, আর শয়তান হলো কাফেরদের অভিভাবক, সে তাদেরকে হেদায়েত থেকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়, তারাই দোজখবাসী, তারা তাতে চিরদিন থাকবে।

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا
تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ
قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾
اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ
اتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১২) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আহার-বিহার করে, দোজখই হবে তাদের আবাসস্থল।

(১৩) আর (হে রসূল!) কাফেররা যে জনপদ (মক্কা) থেকে আপনাকে বের করেছে, তার চেয়ে অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের সাহায্য করার কেউ ছিলনা।

(১৪) বলতো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম রয়েছে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যার কুকীর্তিগুলো তার নিকট শোভনীয় মনে হয় এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন ও কাফেরদের দুনিয়ার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে উভয়ের আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ -

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ

অর্থাৎ যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে আল্লাহ পাকের প্রতি, তার রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করে এবং ঈমান মোতাবেক সৎ কাজ করে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন বেহেশতে বাস করার তৌফিক দান করবেন, যাতে রয়েছে মনোরম উদ্যান, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা সমূহ প্রবাহিত রয়েছে এবং যাতে রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত, যা কেউ পৃথিবীতে দেখেনি, যার কথাও কেউ শ্রবণ করেনি এবং পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করেনি।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা থাকে সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত, যারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করে, খাদ্য-দ্রব্যের প্রতি তাদের লোভ সীমাহীন, যিনি রিজক দাতা, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর ব্যাপারে তাদের গাফলত অপরিসীম, কখনও তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আর এ সত্যও উপলব্ধি করেনা যে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা অহরহ ভোগ করছে এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও তারা চিন্তিত হয়না।

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ⑫

এদেরই আবাসস্থল হলো দোজখ, কেননা তারা সারা জীবন কখনো চিরস্থায়ী জীবনের তথা আখেরাতের কথা চিন্তাও করেনি। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহারই ছিল তাদের কাম্য, দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধিই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এমনি অবস্থায় তাদের পরিণতি কত শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর সে পরিণতিই হলো দোজখের কঠোর-কঠিন শাস্তি। এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ
أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑬

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রসূল! মক্কাবাসী আপনার প্রতি এবং আপনার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণেই আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করতে হয়েছে, কিন্তু তারা জানেনা যে, তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অনেক জনপদের অধিবাসীকে আমি তাদের নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী ছিলনা। অতএব মক্কার কাফেরদের ভয়

করা উচিত, যে কোন সময় তাদের ভরাডুবি ঘটতে পারে।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ﴿١٤﴾

'বলতো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে? যার কুকীর্তিগুলো তার নিকট শোভনীয় মনে হয় এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে'।

মোমেন ও কাফেরের পার্থক্য

আলোচ্য আয়াতে মোমেন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, মোমেন আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত পবিত্র কোরআনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দলিল-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের আলোকে জীবন যাপন করে; মোমেনের অভিভাবক সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, তিনিই তার সাহায্যকারী এবং মোমেন মাত্রই আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরষা রাখে, পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। কখনো এ বিষয়ে সচেতন হয়না যে, কে তাঁকে দান করেছেন এ জীবন এবং জীবনের যথাসর্বস্ব।

বস্তুতঃ কাফেররা দাতাকে বিস্মৃত হয়, অথচ তাঁর দান নিয়ে ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে, তদুপরি সর্বদা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় তথা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, ঐ পাপাচার তাদের নিকট বড়ই মধুর, মনোমুগ্ধকর এবং শোভনীয় মনে হয়, অথচ তার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

কাফেরদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, তারা তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক জীবন যাপন করে, ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করেনা, মন যা চায় তাই করে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি লালন-পালন করছেন, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ আমরা ভোগ করে থাকি, কাফেররা তাঁর কোন ইচ্ছা ও মর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখেনা।

আধুনিককালে মানুষের জীবন-ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনার বাস্তব রূপ লক্ষ্য করা যায়। মরমী কবি তাই বলেছেনঃ

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں اس میں آفاق

"কাফেরের পরিচয় হলো এই যে, সে এই পৃথিবীতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আর মোমেনের পরিচয় হলো এই যে, পৃথিবী তারই মাঝে হারিয়ে যায়"।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا
أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ
فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ
إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ
اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৫) মোত্তাকী, পরহেজগার লোকদেরকে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত; তাতে রয়েছে এমন স্বচ্ছ পানির নহর সমূহ, যা কখনো বিকৃত হয়না, এবং তাতে রয়েছে দুধের নহর সমূহ, যার স্বাদ থাকে সর্বদা অপরিবর্তনীয়, রয়েছে তাদের জন্যে সুস্বাদু সুরার ফল্গুধারা, আরো রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহর, আর তাতে রয়েছে সকল প্রকার ফলমূল, এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ক্ষমা; এমন মোত্তাকী পরহেজগারগণ কি তাদের ন্যায় হতে পারে? যারা চিরদিন দোজখে থাকবে এবং যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

(১৬) আর তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা (হে রসূল!) আপনার কথা শ্রবণ করে, এরপর আপনার নিকট থেকে বের হয়ে জ্ঞানবান লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে, "এই মাত্র তিনি কী বললেন"? এরাই সে সব লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ পাক মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলেছে।

(১৭) আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সঠিক পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে মোত্তাকী পরহেজগার হওয়ার তৌফিক দান করেন।

(১৮) তবে কি তারা শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে কেয়ামত তাদের নিকট অতর্কিতভাবে এসে পড়ুক, কেয়ামতের আলামত সমূহ তো এসেই পড়েছে, যখন কেয়ামত আসবে, তখন কেমন করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে?

তফসীরুল কোরআন

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ

এ আয়াতে ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে জান্নাতে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, তার কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে। তাতে চারটি নহর রয়েছে; পানির নহরে রয়েছে জীবনী-শক্তি, আর এ পানির স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ কোন কিছুই কখনো বিকৃত

হয়না। দ্বিতীয় নহরটি দুধের, যা পুষ্টি সমৃদ্ধ, সর্বদা যা থাকে অপরিবর্তনীয়। তৃতীয় নহরটি হলো পবিত্র সুরার, যাতে রয়েছে আনন্দবোধ এবং চতুর্থ নহরটি হলো মধুর, যাতে রয়েছে সুস্থতা এবং নিরাময় শক্তি।

হযরত মাবিয়া এবনে সাইদা বর্ণনা করবেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মধ্যে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং সুরার সমুদ্র, এরপর প্রত্যেকটি সমুদ্র থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে (বায়হাকী, তিরমিজী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের নহর সমূহ কস্তুরীর পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয় (এবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, তেবরানী, এবনে আবি হাতেম)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হয়তো তোমরা ধারণা করবে, জান্নাতের নহর সমূহ জমিনের গর্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং তা সমতল ভূমির উপরই প্রবাহিত হবে। আর জান্নাতী নহর সমূহের দু' তীরে মুক্তার তৈরী তাঁবু থাকবে, আর তার মাটি হবে খাঁটি কস্তুরী।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সায়হুন" এবং "জায়হুন", "ফোরাত" এবং "নীল" এ চারটিই জান্নাতের নহর।

হযরত আমর এবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, চারটি নহর জান্নাতের, নীল, ফোরাত, সায়হুন, জায়হুন। আর চারটি পাহাড়ও জান্নাতের পাহাড়, ওহোদ, তুর, লোবনান, ওয়ারকান। জান্নাতের মধ্যে "নীল" নামে যে নহরটি থাকবে, তা হবে মধুর নহর। আর "দিজলা" নামে যে নহরটি থাকবে তা হবে দুধের নহর। আর "ফোরাত" নামক নহরটি হবে সুরার নহর, এবং "সায়হুন" হবে পানির নহর।[১]

জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া কর

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৭৮-৭৯

আল্লাহ পাকের নিকট আরজী পেশ কর, তখন অবশ্যই জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে আরজী পেশ করবে, কেননা এটি সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চে তার স্থান। আর জান্নাতুল ফেরদাউস থেকেই নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। আর তার উপরই আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে। তেবরানীতে রয়েছে, হযরত লাকীত এবনে আমের যখন একটি প্রতিনিধি দলে এসেছিলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি জানতে চাইলেন, জান্নাতে কি কি রয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পরিচ্ছন্ন মধুর নহর, পবিত্র সুরার নহর, এমন সুরা যাতে নেশা নেই। দুধের নহর, যে দুধের স্বাদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে এবং স্বচ্ছ পানির নহর, যার পানি কখনো বিকৃত হয়না।[১]

وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَٰتِ

'আর মোত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে জান্নাতে সর্ব প্রকার ফলমূল'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে এমন কোন ফল নেই, যা জান্নাতে নেই মিষ্ট হোক বা টক (এবনে আবি হাতেম, এবনুল মুনজের)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেছেন, জান্নাতে যে ফল রয়েছে, দুনিয়াতে শুধু তার নামই আছে (জান্নাতী ফলের স্বাদ এবং বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফলে নেই (এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম)।

হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতী ব্যক্তি যখনই কোন বৃক্ষ থেকে ফল ছিড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে আরেকটি ফল লেগে যাবে।

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

এই সমস্ত নেয়ামতের উপর বাড়তি নেয়ামত হলো আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদেরকে মাফ করে দেবেন। জান্নাতবাসীগণ তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবেন। এরপর কখনো আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। দুনিয়ার মুনিবরা কখনো কর্মচারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো থাকে অসন্তুষ্ট, কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

১। তফসীর এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৩৫

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

জান্নাতবাসীগণের জন্যে সংরক্ষিত নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করার পর আলোচ্য আয়াতাংশে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই ভাগ্যবান লোকেরা কি সে ভাগ্যাহত লোকদের ন্যায় হবে? যারা চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে; যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের নাড়ী–ভূঁড়িকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। জান্নাতীগণ কখনো দোজখীদের ন্যায় হবেনা, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ....

"দোজখীরা এবং জান্নাতবাসীগণ কখনো এক সমান হতে পারেনা। জান্নাতবাসীগণই হবে সফলকাম, কিন্তু দোজখীরা হবে ব্যর্থ এবং বিপদগ্রস্ত"।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّٰىٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

'আর তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, (হে রসূল!) যারা আপনার কথা শ্রবণ করে, কিন্তু যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা জ্ঞানবান লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে, এইমাত্র তিনি কী বললেন? এরাই সেসব লোক, আল্লাহ পাক যাদের অন্তরকে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের প্রবৃত্তির পেছনেই ছুটে চলেছে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমতঃ মোমেনদের জন্যে জান্নাতে সংরক্ষিত নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

শানে নজুল

এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মোমেন এবং মোনাফেক সকলেই একত্রিত হতো, তিনি যা এরশাদ করতেন, মোমেনগণ মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতেন এবং স্মরণ রাখতেন। পক্ষান্তরে, মোনাফেকরা শ্রবণ করতো ঠিকই, কিন্তু স্মরণ রাখতোনা। যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার

থেকে তারা বের হয়ে আসত, তখন তারা মোমেনগণকে জিজ্ঞাসা করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এখন কী বলছিলেন? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا

অর্থাৎ এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিশে উপস্থিত হয়, প্রকাশ্যে মনে হয় যে তারা তাঁর কথা মনযোগ সহকারেই শ্রবণ করে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আদৌ তাঁর কথায় মন দেয়না, মজলিশ থেকে বের হওয়ার পরই তারা সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করে, এই মাত্র তিনি কী বলছিলেন? এর দ্বারা তারা হয়তো বোঝাতে চায়, আমরা তাঁর মজলিশে হাজির হলেও তাঁর কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করিনা, অর্থাৎ তাঁর কথায় আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেইনা, মোনাফেকদের এ ধৃষ্টতার কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাংকিত করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ

"এরাই সে সব লোক, আল্লাহ পাক যাদের অন্তরকে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন, এরাই তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে"।

এ আয়াতে মোনাফেকদের নির্বুদ্ধিতা, এবং দুর্ভাগ্যের বিবরণ রয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হওয়া সত্ত্বেও তারা মনযোগ সহকারে তাঁর কথা শ্রবণ করতোনা এবং তাঁর হেদায়েত মেনে নিতনা, কেননা তারা ছিল নির্বোধ এবং হতভাগা।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

আর যারা সঠিক পথে রয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের সুবুদ্ধি ও হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তৌফিক দান করেন। তারা হেদায়েতের উপর অটল অবিচল থাকে, তাই তাদের সততা, সত্যবাদিতা সহ যাবতীয় গুণাবলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা তাদের সম্মুখে হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত হতে

থাকে। মোমেনদের প্রতি এটি হয় আল্লাহ পাকের মহান দান যে তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক আমল করার তৌফিক লাভ করে।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দোজখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ বলেছেন যে আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর সওয়াব দান করবেন।[১]

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

'তবে কি তারা শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কেয়ামত তাদের নিকট অতর্কিতভাবে এসে পড়ুক, কেয়ামতের আলামত সমূহ তো এসেই পড়েছে, যখন কেয়ামত আসবে, তখন তারা কেমন করে উপদেশ গ্রহণ করবে'?

পবিত্র কোরআনের মহান বাণীতে রয়েছে উপদেশ, যারা ভাগ্যবান, তারা এ উপদেশ মেনে চলে। পক্ষান্তরে, যারা হতভাগা, তারা হঠকারিতার আশ্রয় নেয়; অর্থাৎ মুখে ঈমানের দাবীদার হয়, প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হয়না। তবে কি তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে? যা অতর্কিতভাবে তাদের নিকট এসে পড়বে, তখন কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ প্রকৃতই যখন কেয়ামত আসবে, তখন উপদেশ গ্রহণের আর সুযোগ থাকবেনা। ইতিমধ্যেই কেয়ামতের বহু আলামত প্রকাশিত হয়েছে। কোরআনে করীমের অন্যত্র আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

(সূরা কমর)

"কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ......

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৮১

"মানুষের জন্যে হিসাবের সময় ঘণিয়ে এসেছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় বিমুখ হয়ে আছে"।

فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا

'কেয়ামতের আলামত সমূহ তো এসেই পড়েছে '।

কেয়ামতের আলামত

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কেয়ামতের বহু আলামত ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। (১) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব। কেননা তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবেনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদতের অঙ্গুলি এবং তার পার্শ্বের অঙ্গুলি দেখিয়ে বলেছেন, এ দু'টি আঙ্গুল যেভাবে পাশাপাশি রয়েছে, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের পাশাপাশি আমি প্রেরিত হয়েছি। (২) চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া যা, মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় ঘটেছে। (৩) হেজাজে একটি অগ্নি বের হওয়া, যা ৬৫৪ হিজরীতে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় সংঘটিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এমন একখানি হাদীস বর্ণনা করবো, যা আমি ব্যতীত তোমাদের নিকট আর কেউ বর্ণনা করবেন না, আমি শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের আলামত হলো, এলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্যপানও বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এলম কমে যাবে, মূর্খতার প্রাধান্য বিস্তার হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার সময় একজন গ্রামীন ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, কেয়ামত কবে হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি আরজ করলো, আমানত বিনষ্ট করার অর্থ কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যখন অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পিত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হয়,

যখন কারো আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হয়, যখন যাকাতকে জরিমানা মনে করা হয়, যখন এলম হাসিল করার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু হয়, যখন মানুষ তার স্ত্রীর কথা মত চলে এবং মায়ের অবাধ্য হয়, যখন বন্ধুকে নিজের একান্ত আপন মনে করে এবং পিতা থেকে দূরে থাকে, মসজিদ সমূহে শোরগোল হতে থাকে (ঝগড়া হতে থাকে), এবং পাপাচারে লিপ্ত লোকেরাই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রভাবশালী হয়ে যায়। মানুষের সম্মান শুধু এজন্যে করা হয়, যেন তার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা হয়, গায়িকাদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় এবং গান বাজনার উপকরণও বৃদ্ধি পায়, মদ্যপান বেড়ে যায়, এ উম্মতের পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের পূর্বসুরীদের লানত দেয়, এমন সময়ে তোমরা অপেক্ষা কর আগুনে টর্নেডো, ভূমিকম্প, জমিন ধ্বসে যাওয়া, আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণের। এভাবে একাধারে আলামত সমূহ প্রকাশিত হতে থাকবে, যেমন তসবীহের দানার রশি ছিড়ে গেলে একটির পর একটি দানা পড়ে যায়। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আমার উম্মত পনেরটি কাজ করতে থাকবে, তখন তাদের উপর বিপদ আসতে থাকবে, এরপর তিনি একটি একটি করে পনেরটি কাজের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেঃ (১) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এলম হাসিল করা হবে। (২) বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হবে, কিন্তু পিতার প্রতি জুলুম করা হবে। (৩) মদ্যপান করা হবে এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা হবে প্রভৃতি। (তিরমিজী শরীফ)

فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

'যখন কেয়ামত আসবে, তখন তারা কেমন করে উপদেশ গ্রহণ করবে"?

অর্থাৎ যারা সময় থাকতে সঠিক পথ অবলম্বন করবেনা, উপদেশ গ্রহণ করবেনা, তাদের পক্ষে উপদেশ গ্রহণের আর কোন সুযোগও থাকবেনা, আর তখন আক্ষেপ বা অনুতাপ করেও কোন লাভ হবেনা।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا
الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ
فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾
أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰىٓ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا
يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তরজমা

(১৯) অতএব, (হে রসূল!) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার নিজের ত্রুটির জন্যে এবং সমস্ত মোমেন নর-নারীদের জন্যেও, আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

(২০) আর মোমেনগণ বলে, একটি সূরা নাজিল হয় না কেন? এরপর যখন কোন সুস্পষ্ট বিষয়ের সূরা নাজিল হয় এবং তাতে জেহাদের নির্দেশ থাকে, (হে রসূল!) আপনি দেখবেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যু-ভয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছে, তাদের পরিণাম শোচনীয়।

(২১) তাদের জন্যে উচিত ছিল আনুগত্য এবং ন্যায়সঙ্গত বাক্য, অতএব যখন জেহাদের সিদ্ধান্ত হয় তখন যদি তারা আল্লাহ পাকের নিকট সত্য থাকত (আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো), তবে তা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক

হতো।

(২২) এরপর তোমাদের নিকট এ প্রত্যাশাও করা যেতে পারে যে, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর, তবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

(২৩) এরাই সে সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে করেছেন বধির এবং দৃষ্টিহীন।

(২৪) তবে কি তারা পবিত্র কোরআনে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেনা? নাকি তাদের অন্তর সমূহ তালাবদ্ধ রয়েছে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনগণের ভাগ্যবান হওয়া এবং কাফেরদের দুর্ভাগা হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করুন এবং নিজের ও উম্মতের নারী-পুরুষের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার নিজের ক্রটির জন্যে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, কেননা তিনিই স্রষ্টা, পালনকর্তা, তিনিই রিজকদাতা, তিনিই ভাগ্যনিয়ন্তা, তাঁর নির্দেশেই সমগ্র সৃষ্টি-জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। আর যখন তাঁর ইচ্ছা হবে, তখন তাঁর নির্দেশেই সমগ্র সৃষ্টি জগতের লয় ঘটবে। অতএব, তিনি ব্যতীত কেউ এবাদতের যোগ্য নেই।

আলোচ্য আয়াতের فاعلم শব্দটির ف অক্ষরটির তাৎপর্য হলো এই, (হে রসূল!) আপনি যখন এ বিষয়ে অবগত হলেন যে, মোমেনগণ হলো ভাগ্যবান এবং কাফেররা নিঃসন্দেহে হতভাগা, অতএব আপনি এ সত্য জেনে রাখুন যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আপনার নিজের ক্রটির জন্যে ও সমস্ত মোমেন নর-নারীর জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন নিস্পাপ, এতদসত্বেও তাঁকে

ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত, তাই কোন মানুষই আল্লাহ পাকের বন্দেগীর হক্ব আদায় করতে পারেনা। এজন্যে নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীর হক্ব আদায়ে অক্ষম মনে করে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর উম্মতের জন্যেও এ নির্দেশ রয়েছে। হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করতেন (মুসলিম শরীফ)।

হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অধিক পরিমাণে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করা এবং এস্তেগফার করা তোমাদের কর্তব্য, কেননা ইবলিস বলেছে, আমি মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি এবং তারা আমাকে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং অধিক পরিমাণে এস্তেগফারের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে। আমি যখন এ অবস্থা লক্ষ্য করলাম, তখন মানুষের অন্তরে আমি প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস করলাম এবং তারা নিজেদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত মনে করতে থাকল।

হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর পুত্র ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) দেখলেন, হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত রয়েছেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন একটি কথা জানি, যদি কেউ মৃত্যুর সময় তা বলে, তবে আল্লাহ পাক তার মৃত্যু-যন্ত্রণা দূরীভূত করে দেবেন এবং তার চেহারা নূরাণী হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যা তার জন্যে আনন্দদায়ক হবে। সে কথাটি কি, তা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিনি। যে কোন সময় জিজ্ঞাসা করতে পারবো, এ ধারণার বশবর্তী হয়েই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কিন্তু এ অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সে কথাটি আমার জানা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, ঐ কথার চেয়ে বড় কোন কথা নেই, পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে যা বলেছিলেন তা হলো, আপনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই) বলুন, হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ একথাটিই ছিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর

প্রতি তার পূর্ণ আস্থা থাকে, তবে শুরুতে অথবা শেষে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[১]

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ

'আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে'।

মোমেন পুরুষ হোক কি নারী, সকলের জন্যে হে রসূল! আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তাদেরকে এমন আমল করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন, যা তাদের মাগফেরাতের কারণ হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট দয়া রয়েছে যে, তিনি উম্মতের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন নবীকে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন "মুস্তাজাবুত দাওয়াত", অর্থাৎ তাঁর দোয়া সর্বদা কবুল হতো। এজন্যে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ তাঁর এ দোয়াও কবুল হবে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

'আল্লাহ পাক তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন'।

আলোচ্য আয়াতের এ দু'টি শব্দ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, متقلبكم এর অর্থ হলো, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করা।

আর مثواكم অর্থ হলো, আখেরাতে জান্নাত অথবা দোজখের দিকে যাওয়া।

মোকাতেল (রঃ) এবং এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, متقلبكم এর অর্থ হলো, দিনে কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকা, আর مثواكم এর অর্থ হলো, রাত্রিকালে বিছানায় যাওয়া।

একরামা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল মানুষের জন্ম লগ্নের বিভিন্ন অবস্থা আর مثواكم অর্থ হলো কবরের অবস্থান। এর মর্ম হলো, আল্লাহ পাক তোমাদের জীবনের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন আর যে অবস্থাতেই থাকনা কেন, অবশেষে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এবং জান্নাত অথবা দোজখ- এর যে কোন একটিতে তোমাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১০), পৃষ্ঠা- ৪৮৩-৮৪

অবস্থান হবে। জীবন-সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলে তোমাদের জন্যে জান্নাত সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করলে তথা কুফরী ও নাফরমানী করলে তার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি দোজখ অবধারিত।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

'আর ঈমানদারগণ বলে, এমন একটি সূরা কেন নাজিল হয়না, যাতে জেহাদের নির্দেশ থাকে। এরপর যখন কোন স্পষ্ট সূরা নাজিল হয় এবং তাতে জেহাদের নির্দেশ থাকে (হে রসূল!) আপনি দেখবেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মুমূর্ষ ব্যক্তির ন্যায় আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছে, তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়'।

মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানগণ যখন অতিষ্ঠ এবং তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তখন তাঁরা আকাংখা করতেন যে, যদি পবিত্র কোরআনের এমন কোন সূরা নাজিল হতো, যাতে জেহাদের আদেশ থাকত, তাহলে কাফেরদের মোকাবেলা করার একটা ব্যবস্থা হতো, কিন্তু যখন এমন সূরা নাজিল হল, যাতে জেহাদের আদেশ রয়েছে, তখন মোনাফেকরা মহাবিপদে পড়ল, মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে যে অবস্থা হয়, ঠিক সে অবস্থা দেখা দিল তাদের, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শংকিত চিত্তে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতে লাগল, জেহাদের কথা শ্রবণ করে তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেল, চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের বিপদ আসন্ন, তাদের পক্ষে যা উচিৎ ছিল, তা হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং কার্যক্ষেত্রে সে আনুগত্যের প্রমাণ উপস্থাপন করা। যদি তাদের কথায় তারা সত্যবাদী হতো তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো, অর্থাৎ যদি তারা জেহাদে অংশ নিত, তবে তা তাদের জন্যে ভাল হতো

অথবা এর অর্থ হলো, যদি তারা তাদের ঈমানের ব্যাপারে আন্তরিক হতো এবং আল্লাহর রসূলের অনুসরণেও তারা আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসত, তবে তা তাদের জন্যে অতি উত্তম হতো, কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই মুসলিম জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবির, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা- ৬৩

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

'এরপর তোমাদের নিকট এ প্রত্যাশাও করা যেতে পারে যে, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর, তবে পৃথিবীতে অশান্ত সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরাই সে সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ পাক লানত করেছেন এবং তাদেরকে করেছেন বধির এবং দৃষ্টিহীন'।

অর্থাৎ আজ যাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমরা সোচ্চার, যদি তোমরা ক্ষমতার অধিকারী হও, তবে তোমরা যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবেনা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করবেনা, তার কি নিশ্চয়তা রয়েছে? মনে রেখ, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে বিনষ্ট করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লানত করেন, তাদেরকে বধির করে দেন এবং অন্ধ করে দেন।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, فان توليتم এর অর্থ ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে অর্থাৎ তোমরা যদি জেহাদের ব্যাপারে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তবে পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বিপন্ন হবে।

মূলতঃ আল্লাহ পাক জেহাদের যে আদেশ দিয়েছেন, তার পেছনে রয়েছে অনেক হেকমত, বিরাট এবং মহৎ উদ্দেশ্য, আর তা হলো সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করা। কিন্তু যারা জেহাদ থেকে বিমুখ হয়, তারা সমাজ ও জাতীয় জীবনের অশান্তি দূরীভূত করতে সমর্থ হয়না। তাই আল্লাহ পাকের লানত হয় তাদের প্রতি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে আবু দাউদ শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন গুণাহ এত বড় নয় এবং এত মন্দও নয়, যার শাস্তি অতি শীঘ্র হয়, সে গুনাহ হল, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

মসনদে আহমদে অন্য একখানি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার বয়স এবং রিজক বৃদ্ধি পাক, তার কাজ হলো সেলায়ে রহমী করা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে মানুষের দুঃখের কথা ভুলে যায় এবং নিজের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, আত্মীয়-স্বজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত হয়, তাদের অন্তর অন্ধ ও বধির হয়, তারা সরল সঠিক পথ পায়না।[১]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

'তবে কি তারা পবিত্র কোরআনে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেনা? নাকি তাদের অন্তর সমূহ তালাবদ্ধ রয়েছে'?

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে যে, মহামূল্যবান উপদেশ রয়েছে, তার উপর চিন্তা ও গবেষণা করা এবং সে উপদেশ সমূহের উপর আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। আর পবিত্র কোরআনে যে সব কাজকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে সব কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। যারা তা না করে, তারা যেন তাদের মনের কপাটকে তালাবদ্ধ করে রেখেছে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে তা উন্মুক্ত করা হয়না, আর এই তালা লৌহ বা পিতলের নির্মিত নয়; বরং তা হলো গাফলতের তালা। পৃথিবীর যে কোন মানুষ যদি এ সত্য উপলব্ধি করে যে, ইতিপূর্বে আমি এ পৃথিবীতে ছিলাম না, আল্লাহ পাকই আমাকে এ জীবন দান করেছেন, আর এ জীবন চিরস্থায়ীও নয়, এখানের অবস্থানকাল আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাঁর হুকুম হওয়া মাত্র এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে আমাকে বিদায় নিতে হবে, সে আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করতে পারেনা। তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমেই সে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে। আর পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহ পাকের হুকুমনামা, মানবজীবনের উন্নতি এবং সাফল্য পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণেই রয়েছে নিহিত।

১। আত্মীয়-স্বজনের হক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৭

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا
عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ
وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا
مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

তরজমা

(২৫) নিশ্চয় যাদের সম্মুখে সরল সঠিক পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে উল্টো পথে চলে, শয়তানই তাদের কাজকে শোভনীয় করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাক।

(২৬) এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক যা নাজিল করেছেন, যারা তা অপছন্দ করে, এরা তাদেরকে বলে, "কোন কোন বিষয়ে অবশ্য আমরা তোমাদের কথাও মেনে নেব"। আর আল্লাহ পাক তাদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

(২৭) কেমন দশা হবে তাদের সে সময়ে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখ-মন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করতে করতে তাদের প্রাণ সংহার করবে।

(২৮) এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় পথে চলেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাদের আমলকে নিস্ফল করে দিয়েছেন।

(২৯) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কি মনে করে যে আল্লাহ পাক তাদের মনের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেক ও মোশরেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তারা কি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে ভেবে দেখে না? না-কি তাদের অন্তরের দ্বার তালাবদ্ধ রয়েছে?

আর এ আয়াতে মোনাফেকদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে যে, ইসলামকে সত্য মনে করে স্বীকার করার পর মোনাফেকরা কুফরী ও নাফরমানীর দিকে ফিরে গেছে। অথচ সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শয়তান তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে, জেহাদে যোগদান করলে তাদের মৃত্যু অবধারিত মনে করে জেহাদ থেকে তারা পলায়নপর হয়েছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)।

আর হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم বাক্যটি দ্বারা আহলে কিতাবের কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তারা তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী পাঠ করেছে এবং তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে সত্য বলে জেনেছে, কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হয়, তখন তারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেননা শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে। তফসীরকার কাতাদা (রঃ)ও এ মতই পোষণ করতেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ

অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দিয়েছে। অথবা এর অর্থ হল, শয়তান তাদেরকে সুদীর্ঘ আশা-আকাংকায় মত্ত রেখেছে অর্থাৎ তাদের মনে একথা এসেছে, এই পৃথিবীতে অনেক দিন থাকবো, আপাততঃ আনন্দ উল্লাস করি, পরে কোন সময় ঈমান আনবো।[১]

এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, দুনিয়াতে কখনও সুদীর্ঘ আশা-আকাংখায় মত্ত থাকা উচিত নয়।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শফিক বলখী (রঃ) বলেছেন, তিনটি কথায় মানুষের ধ্বংস

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১০), পৃষ্ঠা- ৪৯০
তফসীরে কবীবর, খন্ড-(২৮), পৃষ্ঠা- ৬৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-(৬), পৃষ্ঠা-৭৩
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-(২৬), পৃষ্ঠা- ৭৪

রয়েছে। (১) পরে তওবা করে নেবে এই আশায় পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, (২) জীবন সুদীর্ঘ, পরে কোন সময় তওবা করা যাবে এই আশায় তওবা না করা, (৩) তওবা না করে আল্লাহ পাকের রহমতের আশা রাখা।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

'এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা অপছন্দ করে, এরা তাদেরকে বলে,"কোন কোন বিষয়ে অবশ্য আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব", আর আল্লাহ পাক তাদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন'।

মূলতঃ মোনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে কাফেরদের সাথে। মোনাফেকরা কাফেরদেরকে বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলবো, আমাদের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই, যদিও আমরা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা বলি, কিন্তু আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আমরা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করছি, কিন্তু আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথা মোনাফেকরা ইহুদী কাফেরদেরকে বলেছে, অথবা মোনাফেকদের একদল মোশরেকদেরকে বলেছে।

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

তারা একথাও বলেছে যে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলবো, তোমাদের পরামর্শের উপর আমল করবো, যেমন তোমাদের কথা মতে আমরা মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, অথবা এর অর্থ হল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় আমরা একে অন্যের সাথী থাকবো।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইহুদী ও মোনাফেকদের সকল গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, আর তিনিই তা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।[১]

[১] তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১০), পৃষ্ঠা- ৪৯০-৯১

মোনাফেকরা কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, তাদের মধ্যে গোপন পরামর্শ চলতো, তারা মনে করতো, তাদের এসব গোপন চক্রান্ত কখনো প্রকাশ পাবেনা, কিন্তু তারা জানতো না যে, আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা, রাতের অন্ধকারের পরামর্শ হোক, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা হোক, আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন. তিনি এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন"।

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرِ

"আল্লাহ পাক তোমাদের চোখের চুরি সম্পর্কেও অবগত এবং তোমাদের মনের গহনের গোপন কথাও তিনি জানেন"। আর এ সত্যটিই আলোচ্য আয়াতে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ

'আর আল্লাহ পাক তাদের গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

কেমন দশা হবে তাদের সে সময়ে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করতে করতে তাদের প্রাণ সংহার করবে।

মোনাফেকদের দ্বিমুখী নীতির স্বাদ তারা তখন ভোগ করবে, যখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে প্রহার করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পাপাচারে লিপ্ত অবস্থায় যাদেরই মৃত্যু হয়, ফেরেশতাগণ তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠ-দেশে প্রহার করতে থাকে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ তাদের দেহের সম্মুখে এবং পশ্চাতে ফেরেশতাগণ প্রহার করতে থাকে। যারা মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের কাছে থাকে, তারাও এ প্রহার উপলব্ধি করেনা, কিন্তু পাপীষ্ঠদেরকে মধ্যলোকে যাবার প্রথম পর্যায়ে প্রহার করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মোনাফেকদের কী অবস্থা হবে তখন, যখন মুমূর্ষু অবস্থায় তাদেরকে ফেরেশতাগণ প্রহার করতে থাকবে? তাদের মোনাফেকী এবং দ্বিমুখী নীতির শাস্তি তারা তখনই ভোগ করবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٢٨

তাদের এ শাস্তির কারণ এই যে, তারা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় পথে চলেছে এবং তাঁর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের আমলকে নিস্ফল করে দিয়েছেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এ শাস্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ জীবন আল্লাহ পাকের দান, মানুষের মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সবই আল্লাহ পাকের দান, এ দানের ব্যবহার বিধি, নিয়ম-কানুন আল্লাহ পাকই প্রবর্তন করেছেন, অতএব, জীবন পরিচালনা তথা সঠিকভাবে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ পাক প্রদত্ত জীবন-বিধান মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু পৃথিবীতে অনেকেই আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান অমান্য করে, যা অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধেরই শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে, আর সংক্ষেপে এর কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে যে, মোনফেকরা আল্লাহ পাকের অপ্রিয় পথকে পছন্দ করেছে, নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে, যে কাজে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি রয়েছে, তা তারা করেছে। আর যা আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় কাজ তা করতে তারা কখনো প্রস্তুত হয়নি। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কাজকে নিস্ফল করে দিয়েছেন, আখেরাতে তাদের কোন ভাল কাজই উপকারী হবেনা, তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পছন্দনীয় কাজ

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পছন্দনীয় কাজ হলো ঈমান, এখলাস, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ, কিন্তু এ হতভাগা মোনাফেকরা এসব কাজকে কখনো পছন্দ করেনি, তাই তাদের শাস্তি অনিবার্য।[১]

তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-(২৬), পৃষ্ঠা- ৭৬

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ পাক তাদের মনের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না'?

মোনাফেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, তারা মুখে ঈমানের দাবীদার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, ইসলামের দুশমন কাফেরদের সঙ্গেই তাদের নিবিড় সম্পর্ক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিশে বসে তারা যা শুনতো, তা জানিয়ে দিত কাফেরদেরকে, এভাবে তারা দু'দিকই রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করতো। তারা মনে করতো, তাদের গোপন কথা কেউ জানবেনা, মুসলমানদের প্রতি তাদের মনে যে বিদ্বেষ ছিল, তা-ও গোপন থাকবে, তাই তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কাফেরদের সঙ্গে মিলে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করে, একদিন তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে। আল্লাহ পাকই একদিন তাদের বিদ্বেষমূলক আচরণের কথা প্রকাশ করে দেবেন, তখন তাদেরকে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(৩০) আর আমি ইচ্ছে করলে (হে রসূল!) আপনাকে এসব লোক (মোনাফেকদের) দেখিয়ে দিতে পারতাম, আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং তাদের কথার ধরণেও তাদেরকে আপনি চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৩১) আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি (প্রকাশ্যে) জেনে নেই, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহেদ? এবং কে সবর অবলম্বনকারী? আর আমি যেন তোমাদের খবরও সঠিকভাবে জেনে নেই।

(৩২) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, আর তাদের সম্মুখে সরল-সঠিক পথ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও তারা রসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। আল্লাহ পাক তাদের সকল আমল বরবাদ করে দেবেন।

(৩৩) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং রসূলের অনুগত হও, আর নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করোনা।

তফসীরুল কোরআন

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ط

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের উল্লেখ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের চেহারা দেখিয়ে দিতে পারতাম, তাদের পরিচিতি আপনার নিকট বর্ণনা করতে পারতাম, কিন্তু এটি আল্লাহ পাকের হেকমতের খেলাফ, তবে আপনি তাদের আচার–আচরণে এবং কথা-বার্তার ভঙ্গীতে তাদের পরিচয় পেয়ে যাবেন। এজন্যে হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কথা গোপন করে, আল্লাহ পাক তার চেহারা এবং রসনায় তা প্রকাশ করে দেন।

হাদীস শরীফে একথাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক কয়েকজন মোনাফেকের নাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে আল্লাহ পাকের হামদ বর্ণনার পর এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক মোনাফেক রয়েছ, আমি যার নাম উল্লেখ করবো, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। এরপর তিনি এরশাদ করেন, "হে অমুক! তুমি দাঁড়িয়ে যাও, "হে অমুক! তুমি দাঁড়িয়ে যাও"।

এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একে একে ৩৬ জন মোনাফেকের নাম উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র মজলিশ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের আচার-আচরণেই তাদেরকে চিনতে পেরেছিলেন, তাঁর দিব্য দৃষ্টিতেই তাদের প্রকৃত অবস্থা তিনি দেখেছিলেন, অথবা তাদের কথার ধরণেই তিনি তাদের পরিচয় পেয়েছিলেন।

অথবা এ আয়াত নাজিল হবার পর আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মোনাফেকদের সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে কারো কোন কিছু গোপন থাকেনা, দিবালোকের ন্যায় থাকে সবই সুস্পষ্ট।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাজিল হবার পর মোনাফেকদের কোন কিছুই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গোপন ছিলনা, তিনি তাদেরকে ভালভাবেই চিনতেন, একবার আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক জেহাদে ছিলাম, আমাদের সঙ্গে কিছু মোনাফেকও ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন, তাদের আচরণ সম্পর্কে লোকেরা অভিযোগ করেছিল, এক রাতে তারা ঘুমিয়ে ছিল, ভোরে জাগ্রত হওয়ার পর দেখা গেল, তাদের চেহারায় লেখা রয়েছে هذا منافق (এ ব্যক্তি মোনাফেক)।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা মোনাফেকদেরকে চিনতে পারতাম হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা রাখার কারণে, কেননা তারা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা রাখতো। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকেও একথা বর্ণিত আছে।[১]

মোনাফেকরা ইঙ্গিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কথা-বার্তা বলতো, আর এমন শব্দ ব্যবহার করতো, যার একাধিক অর্থ হয়। প্রকাশ্যে মনে হতো যে, তারা স্বাভাবিক কথাই বলছে, কিন্তু তাদের কুমতলব নিহিত থাকত তাতে। তাই আল্লাহ পাক মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

'আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

১. তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-(২৬), পৃষ্ঠা- ৭৭-৭৮

অর্থাৎ তোমাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মকান্ড আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষ করে থাকেন, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের অন্তরে কী ভাবনার অবতারণা হয় তা-ও তিনি জানেন। যেহেতু তিনি তোমাদের নিয়ত এবং ইচ্ছা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি তোমাদের আমলের যথোপযুক্ত বদলা দান করবেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ

'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে (জেহাদের আদেশ দ্বারা) পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি (প্রকাশ্যে) জেনে নেই, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহেদ? এবং কে সবর অবলম্বনকারী'?

তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদের জন্যে অনুপ্রাণিত আর জেহাদের জন্যে কে জান মাল উৎসর্গ করতে প্রয়াসী, কে চরম সংকটে সবর অবলম্বন করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তা জেহাদের বিধান পালনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে।

وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ۝٣١

'আর যেন আমি সঠিকভাবে তোমাদের খবর জেনে নেই'।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, পরীক্ষা সাধারণতঃ সে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে পরীক্ষার্থীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, কিন্তু আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, তাঁর পরীক্ষা গ্রহণের তো কোন প্রয়োজন নেই। তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, আল্লাহ পাক সৃষ্টিজগতের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের পূর্বে তার সম্পর্কে তিনি যেমন জানতেন, অস্তিত্ব লাভের পরও তিনি অনুরূপভাবে জানেন। কিন্তু এর উপর তিনি আদেশ দেননা; বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে সত্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তারই ভিত্তিতে তাঁর আদেশ জারী হয়। যেমন এ মোনাফেকদের কথাই বলা যেতে পারে, আল্লাহ পাক তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কিন্তু আল্লাহ পাকের এলমের উপর ভিত্তি করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিশ থেকে তাদেরকে বহিঃস্কার করা হয়নি; বরং যখন তাদের মোনাফেকী, দ্বিমুখী নীতি এবং দুরভিসন্ধি প্রকাশ পেয়েছে, তখন তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অথবা আলোচ্য نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ বাক্যটির অর্থ হবে, আমি তোমাদের পরীক্ষা নিতে চাই যেন আমার হাবীব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেনে নেন, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহেদ এবং কে জেহাদের কঠিন বিপদাপদে অবিচলিত থাকে

বস্তুতঃ চকচকে হলেই স্বর্ণ হয়না, পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার এবং মুসলমানদের বন্ধু হওয়ার যে সংবাদ দিয়ে থাক, তার সত্যতা যাচাই করে নেব।

প্রত্যেক মুসলমান এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত যে, আল্লাহ পাক "আল্লামুল গুয়ুব", অর্থাৎ তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সমগ্র সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। কিন্তু এখানে তিনি প্রকাশ করতে চান, কে প্রকৃত মোমেন আর কে মোনাফেক, কে মুজাহেদ আর কে মুজাহেদ নয়, কে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকরী, আদর্শে অটল, অবিচল, আর কে চিত্তের দুর্বলতায় পতিত?

এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের نَعْلَمَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন لِنَرَىٰ অর্থাৎ আমি চাক্ষুষ দেখে নিতে চাই কে মুজাহেদ আর কে বিপদে ধৈর্য ধারণকারী।[১]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পথে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আর তাদের সম্মুখে সরল-সঠিক পথ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা, বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে যে কাফেরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো মদীনায়ে মোনাওয়ারার বনী কোরায়যা এবং বণী নজীরের ইহুদী এবং মক্কার কাফের, কেননা ইহুদীদের বারজন সর্দার বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের এক হাজার সৈন্যের খাবারের ব্যবস্থা করেছে। এভাবে মদীনা শরীফের ইহুদীরা ইসলামের শত্রুতায় মক্কার হানাদার কাফেরদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ তাদের এ ষড়যন্ত্র, অবাধ্যতা এবং নাফরমানী তাঁর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর,(উর্দু) পারা- (২৬), পৃষ্ঠা-৪১

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

"আর আল্লাহ পাক তাদের আমলকে ব্যর্থ করে দেবেন"। তাদের কোন কাজই আখেরাতে তাদের জন্যে উপকারী হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা বদরের যুদ্ধে কাফেরদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেছে।

অন্য আয়াতেও তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

'নিশ্চয় যে কাফেররা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, যেন মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে পারে, এটিই হবে তাদের আক্ষেপের কারণ, এরপর তারা হবে পরাজিত'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং রসূলেরও অনুগত হও, আর নিজেদের আমলকে বিনষ্ট করোনা'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তফসীরকার আতা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সন্দেহ, মোনাফেকী, অহংকার প্রভৃতি চারিত্রিক দোষের মাধ্যমে নিজেদের আমলকে বরবাদ করোনা।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো "রিয়া" বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে তোমরা নিজেদের আমলকে ব্যর্থ করোনা।

আর হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা কবীরা গুণাহে লিপ্ত হয়ে নিজেদের নেক আমল সমূহকে বিনষ্ট করোনা।

সাহাবায়ে কেরাম এ ধারণা পোষণ করতেন, যে কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতো এবং তাতে বিশ্বাস করতো, কোন গুণাহ তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কাফেরদের সৎকাজ যেমন তাদের কোন উপকারে আসবেনা, তেমনি মোমেনের মন্দ

কাজও তার জন্যে ক্ষতিকর হবেনা।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে, কেননা এ আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য পোষণ কর এবং নিজেদের নেক আমল সমূহ বিনষ্ট করোনা।

এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত শংকিত হলেন এবং এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে পাপাচারের কারণে নেক আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

আল্লামা বগভী (রঃ) আবুল আলীয়ার সূত্রে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, হে মোমেনগণ! তোমাদের ঈমান এবং ইসলামের যে খেদমত তোমাদের দ্বারা হয়, তাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কোন প্রকার এহসান মনে করোনা। যদি তা কর তবে তোমাদের সকল নেয়ামত বরবাদ হয়ে যাবে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হবার পর যেহেতু সকলেরই ধারণা হলো যে, যে কোন কবীরা গুণাহের কারণে জীবনের যাবতীয় নেক আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে- এ কারণে সকলেই অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে শেরক করাকে মাফ করবেন না, তবে অন্যান্য গুণাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করতেও পারেন"।[২]

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং আখেরাত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে, মোনাফেকী এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে তোমাদের নেক আমল সমূহ বিনষ্ট করোনা।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১০), পৃষ্ঠা- ৪৯৪

২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-(২৬), পৃষ্ঠা- ৭৯

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তৌহীদ, রেসালত ও আখেরাতের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ মানুষের জীবনের যাবতীয় নেক আমল বাতিল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, কেননা নেক আমল দরবারে এলাহীতে কবুল হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণ ঈমান পূর্বশর্ত। কিন্তু ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার পরও যদি কারো মধ্যে সামান্য মোনাফেকীর ভাব থাকে, তবে তা-ও তার ধ্বংসের কারণ হয়। যদি ঈমান নিখুঁত হয়, মোনাফেকীও না থাকে কিন্তু "রিয়া" বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করার প্রবণতা থাকে, তবে এ প্রবণতা সৎকাজগুলোকে বাতিল করে দেয়। কেউ কেউ আত্মপ্রচারে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে, তাতে "রিয়ার" ভাব বর্তমান থাকে, শরীয়তের ভাষায় রিয়াকে "শেরকে খফী"বা গোপন শেরক বলা হয়। এটি এখলাস বিরোধী কাজ, আর এখলাস হলো শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। এতে লোক দেখানোর কোন সুযোগ নেই। যদি কেউ কোন সৎকাজ সুন্দরভাবে করে, কিন্তু তার মনের নিভৃত কোণে এ ভাবনার উদয় হয় যে, আমার এ কাজ সমাজের লোকেরা পছন্দ করবে আর এজন্যে সে মনে মনে খুশী হয় যে, এতে সমাজে আমার সুনাম হবে। এ সুনাম লাভের আকাংখাটিই হলো "রিয়া"। আর এটিই এখলাস বিরোধী কাজ যা হয় আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمْ

'আর তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বাতিল করোনা'।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম বিশেষভাবে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ কর। এরপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয়েছে, এমন কাজ করোনা, যার দ্বারা তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا
وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

তরজমা

(৩৪) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে, এরপর কাফের অবস্থায়ই মরে গেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না !

(৩৫) অতএব, তোমরা কাপুরুষ হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করোনা, তোমরাই প্রাধান্য লাভ করবে। আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তিনি কখনো তোমাদের আমল সমূহকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।

(৩৬) দুনিয়ার জীবন তো খেলাধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন। আর তিনি তোমাদের অর্থ-সম্পদ চান না।

(৩৭) যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ তলব করতেন, এরপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে তা কামনা করতেন, তবে তোমরা কৃপণতা করতে। আর (এমন অবস্থায়) আল্লাহ পাক তোমাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন।

(৩৮) তোমরাই সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় করার জন্যে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কোন কোন লোক কার্পণ্য করছে। তোমাদের মধ্যে যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি, আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের হয়েছে তথা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করেছে, আল্লাহর নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে মানেনি এবং মানুষকে আল্লাহর পথ গ্রহণে বিরত রেখেছে এবং কাফের অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

'আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে কুলায়েববাসী সম্পর্কে, কিন্তু এর হুকুম সকলের জন্যে, কেননা তারা কাফের, তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ গ্রহণে বিরত রেখেছে, তাই তাদের জন্যে এ শাস্তির ব্যবস্থা।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

অতএব, তোমরা সাহসহারা হয়োনা, কাপুরুষ হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করোনা, তোমরাই প্রাধান্য লাভ করবে, আল্লাহ পাক যে তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর তিনি তোমাদের আমল সমূহকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সৎ সাহস অর্জনের, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরষা রাখার তাগিদ করা হয়েছে। কাফেরদের আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত না হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে কাপুরুষের ন্যায় কাফেরদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিওনা, এতে তাদের দৌরাত্ম আরো বৃদ্ধি পাবে। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে আরো পশ্চাতে ফেলে দেবে। কাজেই কোন অবস্থাতেই মুসলমানগণ দুর্বলতা প্রদর্শন করতে পারবেনা; বরং বীর বিক্রমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জেহাদ চালিয়ে যাবে।

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ

"আর তোমরাই হবে বিজয়ী", কেননা

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

'স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জয়মুক্ত করবেন, তাঁর সাহায্য তোমাদের জন্যে থাকবে সংরক্ষিত। আর তিনি কখনো তোমাদের আমল সমূহকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর নেক আমলকেও বিনষ্ট করা হবেনা; বরং তার পূর্ণ বিনিময় বা শুভ পরিণতি দান করা হবে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো, পূর্ণ সম্মান সহ যদি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব আসে তবে তা মুসলমানদের স্বার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামক স্থানে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের সঙ্গে শান্তি–চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আল্লাহর রাহের মুজাহেদগণের আমল কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হতে দেবেন না, তবে মুসলমান মাত্রকে আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধান মেনে চলতে হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তোমাদের আমলের সওয়াব কম করবেননা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মোকাতেল (রঃ) কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদের নেক আমলের হক্ব বিনষ্ট করবেন না,'

অর্থাৎ তোমাদের আমলকে কখনো ব্যর্থ হতে হবেনা, তোমাদের আমলের শুভ-পরিণতি বা সওয়াব অবশ্যই তোমরা লাভ করবে।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ

দুনিয়ার জীবন খেলা-ধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের জিকর এবং তাঁর বন্দেগী না থাকে, তবে সে জীবন–সাধনা ব্যর্থ। আর শুধু ব্যর্থই নয়; বরং আখেরাতে তা হবে মহাবিপদের কারণ। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, আল্লাহ পাকের জিকর ব্যতীত, কেননা দুনিয়ার অনেক কিছুই মানুষকে আখেরাতের স্মরণ থেকে গাফেল করে থাকে। অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো দুনিয়ার খেল-তামাসায় মেতে না থেকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকা। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ......

"সময়ের শপথ! দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জনের শিক্ষা দেয়"।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে, ঈমান এবং সৎকাজ ব্যতীত প্রত্যেকটি মানুষই সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জীবন-সাধনাকে সার্থক করার একমাত্র পন্থা হলো, এক আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করা এবং সৎকাজ করা। এর কোন বিকল্প নেই, এতদ্ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই, আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

'আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাননা'।

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন এবং তাকওয়া পরহেজগারীর নীতি অবলম্বন কর তথা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন কর এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে আত্মরক্ষা কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের ঈমান এবং পরহেজগারীর সওয়াব তোমাদেরকে আখেরাতে দান করবেন। আর এমন অবস্থায় তোমাদের দুনিয়ার এ জীবন-সাধনা সার্থক হবে, কেননা তোমরা এ জীবনে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করতে পারবে।

পবিত্র কোরআনে মোমেনদের জীবন-সাধনার সার্থকতার জন্যে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, কোথাও اجر كريم। অর্থাৎ উত্তম বিনিময়, কোথাও اجر كبير বা বিরাট প্রতিদান, আর কোথাও اجر عظيم। বা মহান প্রতিদান দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এভাবে কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে ঈমান ও সৎকাজ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের অর্থ-সম্পদ চান না, এর কোন প্রয়োজনও তাঁর নেই, যদিও তোমাদের অর্থ-সম্পদ সহ যথাসর্বস্ব আল্লাহ পাকেরই দান, এসব কিছুর মালিকানা একমাত্র তাঁরই, কেননা আল্লাহ পাকই দান করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ। অতএব, সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর রাহে ব্যয় করার জন্যে আদেশ দেয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে, কিন্তু তিনি তা করেন না, বরং তিনি অতি সামান্য পরিমাণই কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে বলেন, কেননা আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্যে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে, আর তা তোমাদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়, অথচ এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে তার অশেষ সওয়াব দান করেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, ইসলামের অভ্যুত্থাণকালে মুসলমানগণ আল্লাহর পথে যে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক বিভিন্ন দেশ জয় করার মাধ্যমে তাঁদের ব্যয় করা সম্পদের বহুগুণ বেশী ফিরিয়ে দিয়েছেন। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। পারশ্য বিজয়ের পর যেদিন যুদ্ধ-লব্ধ বিপুল সম্পদ বা গণীমত মদীনায়ে মোনাওয়ারায় আনা হয়, সেদিন এক বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হলো, সম্পদের পাহাড় যেন মদীনায়ে মোনাওয়ারায় তৈরী হয়েছে, পারশ্য সম্রাটের রাজ মুকুটটি সম্মুখেই পড়েছিল, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন বৃদ্ধ সাহাবী মুকুটটির পার্শ্বেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি সম্মুখেও অগ্রসর হচ্ছেন না, পিছুও হটছেন না, তখন তাঁর দৃষ্টি ছিল সেই রাজমুকুটটির দিকে নিবদ্ধ, একটু পরই হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কাছে ডাকলেন, পারশ্য রাজের মুকুটটি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন, সেই আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি বললেন, صدقت يا رسول الله (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি সত্য বলেছেন) কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করছিলেন, তখন কাফেররা তাঁর ব্যাপারে একশত উট প্রদানের যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, তার প্রলোভন এড়াতে না পেরে আমি তাঁর অনুসরণ করি, যখন তাঁর খুব নিকটে চলে আসি, তখন আকস্মিক ভাবে আমার ঘোড়ার পা মাটিতে ধ্বসে যায়। আমি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হই, তখন আমার ঘোড়া চলতে থাকে। পরে আমি পুনরায় আমার উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রতিবারই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ অন্যায় কাজের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আবেদন করলাম, (ভবিষ্যতের জন্যে) আমাকে একটি নিরাপত্তা বাণী লিখে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে সুরাকা! তুমি সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন সামনে আসছে, যখন পারশ্য সম্রাটের রাজমুকুট তোমার মাথায় শোভা পাবে"। আজ তাই আমার জন্যে এক বিশেষ আনন্দঘন ক্ষণ, আমি ধন্য, আমি তৃপ্ত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তা বাস্তবিকই আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

'যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ তলব করেন, এরপর চরম পর্যায়ে তা, কামনা করেন তবে তোমরা কৃপণতা করতে, তখন তিনি তোমাদের মনের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিতেন'।

এ আয়াতে পবিত্র কোরআন মানব-স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছে। অর্থ-সম্পদ সকলের প্রিয়, সকলেই চায় তা আঁকড়ে ধরে রাখতে। আল্লাহ পাকই মানুষকে অর্থ-সম্পদ দান করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন যে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর, তবে মানুষ তাতেও কৃপণতা প্রকাশ করে। মানুষের মনের নিভৃত কোণে অর্থ-সম্পদের প্রতি যে আসক্তি নিহিত রয়েছে, তার প্রকাশ ঘটে। এজন্যে তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক জানতেন যে, অর্থ-সম্পদ কামনা করা হলে মানব অন্তরে সংরক্ষিত বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে, তাই তিনি একথা বলেছেন। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ
وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

'তোমরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাকের রাহে ব্যয় করার জন্যে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে, তোমাদের মধ্যে যারা কার্পন্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতিই, আল্লাহ্ পাক অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনে বিমুখ হও, তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের স্থলে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবেনা'।

আল্লাহর রাহে দানের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়; আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোম্যদের দান চাননা, তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তিনি যখন তোমাদেরকে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার আহবান জানান, তখন তোমাদের উপকারার্থেই এমন আহবান জানান, তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর রাহে ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর, তা যাকাত বাবদ হোক, কিংবা জেহাদ বা মানবতার কল্যাণের অন্য কোন দিক হোক।

فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ

তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, অথচ যে কার্পণ্য করে, তাকেই ভোগ করতে হবে কার্পণ্যের পরিণতি, পক্ষান্তরে, যে আল্লাহর রাহে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক দান করে, তার উপকার সে-ই লাভ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার নিকট তার নিজস্ব অর্থ-সম্পদ থেকে তার উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ অধিকতর প্রিয়?

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা এই যে, আমাদের নিজস্ব ধন-সম্পদই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ তা-ই, যা তোমরা আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে আখেরাতে প্রেরণ করছো, আর তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ হলো, যা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমরা দুনিয়াতে রেখে যাবে। (বোখারী শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, শুধু সে সম্পদই তার থাকে। পক্ষান্তরে, যে সম্পদ দুনিয়াতে রেখে যায় তা হয় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের। অতএব, আল্লাহর রাহে দান করাই হলো বাস্তববাদী, কল্যাণকামী, বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী মানুষের কাজ।

এ পর্যায়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক দিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে, একজন বলে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তুমি তার বদলা দিও। আরেকজন ফেরেশতা বলে, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কার্পন্য করে, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ হে আদম সন্তান! ব্যয় কর, (আল্লাহর রাহে ব্যয় কর) তাহলে আমি তোমার প্রতি ব্যয় করব (তোমাকে দান করবো)।

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ

আর আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, তাঁর কোন প্রয়োজন কারো কাছে নেই,, সকলেই তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী, আল্লাহ পাকের কোন প্রয়োজনই নেই, এমনকি তোমাদের এবাদত-বন্দেগী এবং সদকা-খয়রাতেরও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, আর তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাঁর রহমতের মোহতাজ, তাঁর রহমত ব্যতীত কোন মানুষ ক্ষণিকের জন্যেও বাঁচতে পারেনা।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

'যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবেনা'।

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে অনিচ্ছুক হও, আল্লাহর বিধান মেনে নিতে বিমুখ থাক, তবে জেনে রেখ, তোমাদের দান খয়রাতের উপর তাঁর কাজ বন্ধ থাকেনা, আল্লাহ পাকের মর্জি হলে তিনি তোমাদের স্থলে এমন জাতি নিয়ে আসবেন, যারা তাঁর আহবানে সাড়া দেবে এবং যারা তোমাদের ন্যায় হবেনা, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নেবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ আয়াতে যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা কোন্ ভাগ্যবান জাতি! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উপর হাত রেখে বললেন, এর জাতি (পারশ্য জাতি)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ যদি ঈমান সুদূর নক্ষত্রলোকেও থাকে, তবুওপারশ্যের লোকেরা তা সেখান থেকে নিয়ে আসবে।

সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের খেদমতে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তার পরেও পৃথিবীতে এমন লোক এসেছেন, যারা ইসলামের খেদমতে অসাধারণ এবং বিস্ময়কর ভূমিকা রেখেছেন, এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের ইমাম আবুহানিফা (রঃ) অন্যতম।

আলহামদুলিল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে দ্বীন ইসলামের খেদমত করে গেছেন, তার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। আর এজন্যে তাঁদের স্থলে অন্য জাতি নিয়ে আসার প্রয়োজনও হয়নি, তবে পারশ্যবাসী যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তাঁরা দ্বীন ইসলামের খেদমতে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা দেখে একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক প্রয়োজনে তাঁরা আরবদের বিকল্পও হতে পারতেন। হযরত শেখ জালালুদ্দিন সয়ুতি (রঃ), ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)-এর সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

* আলহামদুলিল্লাহ! সূরা আহকাফের তফসীর সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! কবুল কর। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫০৬-০৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত, আল্লামা কান্দলভী (র), খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- ২৬, পৃষ্ঠা-৮২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাত্হ

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (১) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ

مَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (২) وَّ

يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا (৩) هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ

قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (৪) لِّيُدْخِلَ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا

عَظِيْمًا (৫)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) নিশ্চয় আমি (হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি।

(২) (হে রসূল!) আল্লাহ পাক যেন আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

(৩) আর আল্লাহ পাক আপনাকে পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য করতে চান।

(৪) তিনিই মোমেনদের অন্তরে দান করেছেন প্রশান্তি, যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়, আসমান জমীনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকেরই, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

(৫) তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক মোমেন নারী-পুরুষদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাতে চান যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে, তারা ঐ জান্নাতে চিরদিন বাস করবে। আর তিনি তাদের গুণাহ্ সমূহ মাফ করে দেবেন। আর তা আল্লাহ পাকের নিকট এক বিরাট সাফল্য।

সূরায়ে ফাত্হ প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে, হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জুমার নামাজ শেষে এ সূরা নাজিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে, তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মদীনা মোনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন ভ্রমণকালেই এ সূরা নাজিল হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর "তারীখে" এ বর্ণনা দিয়েছেন।

এবনে আবি শায়বা এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

আবু দাউদ এবং নেসায়ী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যখন "সোলহে হোদায়বিয়ার" পর মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল করেছেন, যা আমার নিকট পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল কিছু থেকে প্রিয়।

ইমাম আহমদ (রঃ) লিখেছেন, যে স্থানে এ সূরাটি নাজিল হয় তার নাম হলো "কোরাউল গমীম"। উষ্ট্রের উপর চলমান অবস্থায়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করেন। তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তফসীরকারগণ পবিত্র কোরআনের সূরা সমূহের মধ্যে যে সূরা হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে সে সূরাকে মক্কী সূরা বলেন; আর যে সূরা হিজরতের পর নাজিল

হয়েছে, সে সূরাকে মদনী সূরা বলেন, নাজিল হওয়ার স্থান যেখানেই হোক না কেন। এদিক থেকে বিচার করলে এ সূরা মদনী সূরার অন্তর্ভূক্ত। এ সূরায় ৪ রুকু, ২৯ আয়াত রয়েছে। এর বাক্য এবং অক্ষরসংখ্যা যথাক্রমে ৫৬০ ও ২,৪০০।

এ সূরার আমল

পবিত্র মাহে রমজানের চাঁদ দেখার পর এ সূরা তিনবার পাঠ করলে সারা বছর স্বচ্ছলতা থাকবে।

এ সূরা লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে নিয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণ করলে আল্লাহ পাক এর বরকতে বাহককে নিরাপদ রাখবেন এবং বিজয় দান করবেন। এতদ্ব্যতীত নৌকা বা জাহাজে আরোহন করে এ সূরা পাঠ করলে আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন।

স্বপ্নের তাবীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাত্হ পাঠ করতে দেখে, আল্লাহ পাক তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা ছিল, জেহাদের প্রেক্ষিতে মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ করা হয়েছে, অবশেষে তাদের ব্যর্থতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। প্রকৃত মোমেনদের গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। মোমেনদের এখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলীর কারণে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে যে সুস্পষ্ট এবং মহান বিজয় দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যখন এ সূরা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয়ের জন্যে মোবারকবাদ জানান। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর উপস্থিত মুসলমানগণকে বিজয়ের সুসংবাদের জন্যে মোবারকবাদ দান করেন।

যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে মক্কার অদূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি–চুক্তি সম্পাদিত হয়; আল্লাহ পাক এ শান্তি চুক্তিকেই "প্রকাশ্য বিজয়" বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সূরায় সে ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে–"সূরাতুল ফাত্‌হ"। "ফাত্‌হ" শব্দের অর্থই হলো বিজয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যদিও মক্কা বিজয় হয় এ ঘটনার দু' বছর পর, কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যে শান্তি–চুক্তি হয়েছিল, তা-ই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছে। আর এজন্যেই আলোচ্য সূরায় হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে মহব্বত এবং আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে প্রাণপণ জেহাদের শপথ গ্রহণ করেছেন, তজ্জন্যে আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথাও ঘোষণা করেছেন এ সূরায়।[১]

তফসীরুল কোরআন

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ①

"নিশ্চয় আমি (হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"।

পটভূমি

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে "ছায়ী" করছেন, অর্থাৎ তিনি ওমরাহ পালন করছেন। অবশ্য স্বপ্নে দিন তারিখের কোন উল্লেখ ছিল না। এর কিছুদিন পরই তিনি চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। মক্কাবাসী এ সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবেনা, যদিও পৃথিবীর কোন মানুষকে তারা হজ্ব ও ওমরাহ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৭১
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৮-৯০

পালনে বাধা দিতনা এবং এ-ও তারা স্বীকার করতো যে, হজ্ব ও ওমরার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কোন অধিকার তাদের নেই, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের যে বিদ্বেষ ছিল, তার কারণেই তারা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে মোতাবেক মার্চ, ৬২৮ খৃষ্টাব্দে এই সফর করেন। তখন মুশরেকদের হাতেই ছিল মক্কা শরীফের নিয়ন্ত্রণ, মক্কা থেকে মাত্র ৯ মাইল দূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র কাফেলা এসে পৌঁছল, তখন তাঁর উটটি আপনা আপনিই বসে গেল, কিছুতেই সে অগ্রসর হলোনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন উপলব্ধি করলেন যে, এটি আল্লাহ পাকের মর্জিরই বিষয়, অকারণে সে এভাবে বসে পড়েনি, তিনি এরশাদ করলেনঃ

حبسها حابس الفيل

"একদিন আবরাহা বাদশার হাতিকে যিনি অগ্রসর হতে দেননি, তিনিই এ উটটিকেও অগ্রসর হতে বিরত রেখেছেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা না দিতে আহ্বান করলেন, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে মক্কাবাসীর নিকট তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে মক্কাবাসীকে এই সংবাদ দেন, আমরা শুধু ওমরাহ সম্পাদন করে ফিরে যাব, মক্কায় অবস্থান করবোনা, আমরা কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইচ্ছা রাখিনা। সকল মুসলমানই এহরামের পোষাক পরিহিত ছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসী কোন কথা মানতে সম্মত হলোনা; বরং তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূত হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বন্দী করল, যা আর্ন্তজাতিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থী একটি গর্হিত কাজ। এদিকে হোদায়বিয়ায় এ সংবাদ প্রচারিত হয় যে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে মক্কাবাসী প্রথমে বন্দী এবং পরে শহীদ করেছে। এমন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে জেহাদের বয়আত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করলেন যে, যদি হযরত ওসমান (রাঃ) বন্দী অবস্থায় থাকেন, তবে তাঁকে মুক্ত করতে হবে, আর যদি শহীদ হয়ে থাকেন তবে তাঁর খুনের বদলা নিতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে জেহাদের বয়আত গ্রহণের খবর মক্কায় পৌঁছতে বিলম্ব হলোনা, মক্কাবাসী প্রমাদ গুণল, তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাদের মনে পড়ল বদর, ওহোদ এবং খন্দকের রণাঙ্গণের কথা। তাই অনতিবিলম্বে তারা হযরত

ওসমান (রাঃ)-কে মুক্তি দিল এবং সন্ধি-প্রস্তাব সহ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলো। অনেক আলোচনার পর দশ বছর মেয়াদী একটি "যুদ্ধ নয় চুক্তি" স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত হলো এবং অবশেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

হোদায়বিয়া নামক স্থানে এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুসলমানগণকে মদীনা মোনাওয়ারায় ফিরে যেতে হয়, কেননা চুক্তিতে রয়েছে, মুসলমানগণ এবার ওমরাহ না করেই প্রত্যাবর্তন করবে, তবে পরবর্তী বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরীতে ওমরাহ পালন করবে। মদীনা মোনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যেই সূরা ফাত্হ নাজিল হয়, যার প্রথম আয়াতই হলো–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

(নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি।)

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ফাতহ বা বিজয় দ্বারা কি মক্কা বিজয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? নাকি হোদায়বিয়ার চুক্তিকেই বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে? তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কাতাদা (রঃ)–এর সূত্রে আবু জাফর রাজী হযরত আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর দ্বারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমার বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু মক্কা বিজয় ছিল সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত, আর হোদায়বিয়ার চুক্তিই হলো মহান মক্কা বিজয়ের ভূমিকা মাত্র, তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ "আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি তথা মক্কা বিজয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছি।

হোদায়বিয়ার সন্ধিই সুস্পষ্ট বিজয়

তবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), এবনে সা'দ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ), হাকেম (রঃ), এবনুল মুনজের (রঃ), এবনে মরদবিয়া (রঃ), বায়হাকী (রঃ), জুহরী (রঃ) এবং তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট বিজয় বলে হোদায়বিয়ার সন্ধিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত মাজমা এবনে হারেসীয়া আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হোদায়বিয়া থেকে "কোরাউল গমীম" নামক স্থানে পৌঁছে দেখি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। অনেক লোক তাঁর চার পার্শ্বে সমবেত, তিনি তখন এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন। একজন সাহাবী আরজ

করলেন, এটিই কি বিজয়? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটিই হলো সুস্পষ্ট বিজয়।

হযরত আবুবকর (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলামে হোদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোন বিজয় হয়নি। আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত বরা (রাঃ)-এর সূত্রেও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলার কারণ হলো, এটি ছিল খায়বর বিজয়, মক্কা বিজয় সহ অন্যান্য সকল বিজয়ের ভূমিকা।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায়, "ফাত্হ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, কোন বন্ধ জিনিষকে উন্মুক্ত করা বা কোন বাধাকে অপসারিত করা, কাফেরদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর পথে যে বাধা ছিল, তা হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অপসারিত হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "ফাতহ" এর অর্থ হলো, চূড়ান্ত ফয়সালা করা, এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছি যে, (হে রসূল!) আপনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন।

ইমাম শা'বী (রঃ) লিখেছেন, এটি হোদায়বিয়ার সন্ধিই ছিল, যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বাপর সকল ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়েছে। এমনিভাবে এ হোদায়বিয়ার সন্ধির কারণেই খায়বর বিজয় সম্ভব হয়েছে, এরপর মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম জুহরী (রঃ) বলেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোন বিজয় হয়নি, কেননা এ সন্ধির কারণেই মোশরেকরা মুসলমানদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়েছে, মুসলমানদের সাথে কথা বলার, ইসলামী আচরণ লক্ষ্য করার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, ফলে তিন বছরের মধ্যে বহু মুশরেক মুসলমান হয়েছে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধি যুদ্ধ ব্যতীতই সুস্পষ্ট বিজয়ে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ এ সন্ধিই বিজয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।

বয়জাভী (রঃ) লিখেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধিকে এজন্যে বিজয় বলা হয়েছে যে, এ সন্ধি এমন সময় হয়, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুশরেকদের উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, আর এজন্যেই সন্ধির আবেদন এসেছিল,

মোশরেকদের তরফ থেকে, আর এ সন্ধিই হয়েছিল মক্কা বিজয়ের কারণ। এ সন্ধি হওয়ার পরই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা আরব তথা সমগ্র বিশ্বের দিকে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন এবং এরপর বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম তিরমিজী (রঃ) নাসায়ী (রঃ) এবং ইবনে হাব্বান (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা এক সফরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁর নিকট একটি কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি, আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলাম যে, কেন আমি বারংবার প্রশ্ন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিলাম। এরপর আমি উটের উপর বসে অগ্রসর হলাম, এমনকি সকলের আগে চলে গেলাম। আমার আশংকা হলো, হয়তো আমার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত নাজিল হবে, আমি তখনই এক ব্যক্তির আওয়াজ শ্রবণ করলাম, সে আমার নাম ধরে ডাকছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলাম। তিনি এরশাদ করলেন, আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে, এ সূরাটি আমার নিকট পৃথিবীর সব কিছু থেকে প্রিয়, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হাকেম হযরত মাসওয়ার এবনে মাখরামা এবং মারওয়ান এবনে হাকামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ সূরা মক্কাশরীফ এবং মদীনা শরীফের মধ্যস্থলে হোদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তম হিজরীতে মুসলমানগণকে আল্লাহ পাক খায়বরের বিজয় দান করেন, আর হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক সপ্তম হিজরীতেই জিলক্বদ মাসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওমরাহ করেন এবং নিরাপদে, নির্বিঘ্নে মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মক্কার কাফেররা, তাই অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা অভিযান করেন। আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে এ অভিযানে বিজয় লাভের সৌভাগ্য প্রদান করেন।

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

'(হে রসূল!) আল্লাহ্ পাক যেন আপনার অতীত এবং ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয় লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সকল যুগেই একটি প্রথা প্রচলিত রয়েছে, যে সেনাপতি বিজয়ী হয়ে ফিরে, তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর নির্যাতিত উৎপীড়িত অবস্থায় অব্যাহত রাখেন। আর এ উদ্দেশ্যেই অবশেষে তাঁকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় চলে যেতে হয়। হিজরতের যষ্ঠ বর্ষে তথা সংগ্রামের উনিষতম বর্ষে আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্পষ্ট বিজয়ের সুসংবাদ দান করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী, প্রিয় রসূল, লক্ষাধিক নবী রসূলগণের তিনিই দলপতি, তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়তম ব্যক্তি, তাঁকেই আল্লাহ পাক তাঁর দীদার নসীব করেছেন, তিনিই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সর্বকালের মানুষের হেদায়েতের দায়িত্ব পেয়েছেন, সুদীর্ঘ উনিশ বছর ধরে কাফেরদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার পর বিজয় লাভের এ শুভ মুহূর্তে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চারটি বিশেষ সম্মান এবং উচ্চমর্যাদা দান করেছেন, আলোচ্য আয়াতে সে সম্মানের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

لِيَغْفِرَ

(১) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, তাই তাঁর এ উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সারা জীবনে যদি কোন ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়ে থাকে, বা ভবিষ্যতে হয় তবে তা আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবীগণ নিস্পাপ, নিঃস্কলংক, কিন্তু মানুষ হিসেবে যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার জন্যে আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই ক্ষমা ঘোষণা করলেন যে, আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হলো. দুনিয়া বা

আখেরাতে কখনও এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা।

হাদীস শরীফে রয়েছে, কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থায় যখন মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট সুপারিশের জন্যে হাজির হবে, তখন তিনি তাঁর দ্বারা যে ভুল হয়েছিল, তা স্মরণ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে অপারগতা পেশ করবেন। তিনি বলবেন,

لست لها

"আজকের এই কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য আমি নই"। এমনিভাবে অন্যান্য নবী রসূলগণের নিকটও মানুষ যাবে, তাঁরাও একই জবাব দেবেন, অবশেষে মানুষ এ আবেদন নিয়ে হাজির হবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট, তিনি প্রথমতঃ সুপারিশ করার ব্যাপারে নিজের অপারগতা পেশ করবেন, এরপর পরামর্শ দেবেন যে, তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হও, তিনি এমন মহান ব্যক্তি, যাঁর ভূত-ভবিষ্যত সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে। বোখারী শরীফে রয়েছে এর বিবরণ।

ولكن ائتو محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر (বোখারী শরীফঃ পৃষ্ঠা- ১১০৮)

"কিন্তু তোমরা সকলে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহ পাকের এমন বন্দা, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন"।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ পরামর্শের তাৎপর্য হলো, কেয়ামতের এ কঠিন দিনে শাফাআত করার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, কেননা তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁর আগের এবং পরের সমস্ত ত্রুটি আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন; ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিষয়ে তাঁর জবাবদেহী করার কিছুই নেই, তাই তিনি নিঃশংক চিত্তে সমগ্র মানব জাতির জন্যে আজ সুপারিশ করতে পারবেন। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا اول شافع واول مشفع

"(কেয়ামতের দিন) আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশ করবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম গ্রহণ করা হবে"।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হবেন সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়েরই সুসংবাদ রয়েছে।

(২) وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

আর যেন আল্লাহ পাক আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দেন, অর্থাৎ শুধু যে আল্লাহ পাক আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল গুণাহ মাফ করবেন, তাই নয়; বরং আপনাকে আল্লাহ পাক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সকল নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে দান করবেন, আর সে নেয়ামত হলো নবুওয়ত ও রেসালত, পবিত্র কোরআন, অসংখ্য মোজেযা এবং পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা অন্য সব ধর্ম মতের উপর বিজয় লাভ করবে।

(৩) وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

আল্লাহ পাক আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে "সীরাতুল মস্তাকিম" বা সরল-সঠিক পথ দান করবেন, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই, ভুল–ভ্রান্তির কোন আশংকা নেই। যে পথে চললে মানুষ জীবনকে সার্থক সুন্দর এবং সফলকাম করতে পারে, সে জীবন বিধানই আল্লাহ পাক আপনাকে দান করবেন।

'আর (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকে পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য করতে চান'। ফলে আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত হবে এবং দলে দলে লোক আপনার প্রতি ঈমান আনবে, আর এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আসবে আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, এখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে অর্থাৎ বিদায় হজ্বের মুহূর্তে তিনি এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেছিলেন, অথচ যখন

মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেন, তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। এর মাত্র আট বছর পর দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তিনি মক্কা বিজয় করেছিলেন, আর মাত্র দু'বছর পর ঐতিহাসিক আরফার ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণ দিয়েছিলেন, অতএব দশ বছরের ব্যবধানে অতি অল্প সংখ্যক থেকে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছিলেন, যা সম্ভব হয় আল্লাহ পাকের সাহায্যের বরকতে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরই খায়বর এবং মক্কা বিজয় হল, এরপর হোনায়েন এবং তায়েফও মুসলমানদের করতলগত হয় এবং এরপর হেজাজ, নাজদ, ইয়ামন এককথায় সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এর পাশাপাশি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তদানীন্তন পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পারশ্য রাজ, রোমক সম্রাট এবং মিশরের রাজা মেকাওকাস সহ অনেকের কাছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, মিসর সহ অন্যান্য বহু দেশ মুসলমানদের আয়ত্বাধীন হয়। এভাবে আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বের এক বিরাট অংশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার তৌফিক দান করেন। এটিও ছিল আল্লাহ পাকের নেয়ামত পরিপূর্ণ করার, তাঁর সাহায্য করার এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ
اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾

"তিনি মোমেনদের অন্তরে দান করেছেন প্রশান্তি, যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়। আসমান জমীনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকেরই, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সমস্ত সুসংবাদের উল্লেখ রয়েছে, যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল, আর এ আয়াতে এমন কারামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে, যা সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, তিনি মুসলমানদের অন্তরে এক প্রকার শান্তি নাজিল করেন, ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে তাঁরা অবিচলিত থাকেন এবং এভাবে আল্লাহর রাহে জান মালের কোরবাণী পেশ করার সুযোগ লাভ করেন।

যেহেতু প্রকাশ্য দৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো কাফেরদের অনুকূলে মনে হচ্ছিল, মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল যে, এটি দুর্বলের সন্ধি, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল এসবের পরিণামের প্রতি, তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সবর অবলম্বনের এবং সংযত থাকার উপদেশ দিলেন। তখন মুসলমানদের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনার ভাব সৃষ্টি হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথায় হযরত ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের উত্তেজনা প্রশমিত হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের এ নজিরবিহীন আনুগত্য তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হলো, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণের বরকতে মুমেনের কলবে নূর সৃষ্টি হয়, তার কলব নূরানী হয়, ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সাহাবায়ে কেরামের মন আহত ছিল, তখন এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হলো, আল্লাহ পাক হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করলেন, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, এ পৃথিবীর সব কিছু থেকে আমার নিকট এ আয়াত সমূহ অধিক প্রিয়।

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটিই কি বিজয়? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় انا فتحنا থেকে فوزا عظيما পর্যন্ত নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের سكينة শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের কারণে মানব মনে এক প্রকার শান্তি এবং সান্ত্বনা আসে, সে সান্ত্বনাকেই এ আয়াতে سكينة বলা হয়েছে।

إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

অর্থাৎ মুসলমানদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ পাকের প্রতি মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা এবং একীন পূর্বেই ছিল, এ ঘটনার কারণে তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়, আর এ ঘটনায় এমন নতুন কিছু যোগ হয়েছে, যা ঈমান ও একীনের মাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধির একটি ঘটনা হোদায়বিয়াতে ঘটেছিল

আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, তৌহীদের প্রতি স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্যে এবং মানুষকে তৌহীদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে, যখন লোকেরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তথা ঈমান এনেছে, তখন নামাজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এরপর পর্য্যায়ক্রমে যাকাত, রোজা, হজ্ব এবং এরপর জেহাদ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এভাবে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে, প্রতি দিন ওহীর মাধ্যমে নতুন নতুন বিধান আসত, লোকেরা তা মেনে নিত, এভাবে তাদের ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।[১]

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আর আসমান জমীনের সৈন্য বাহিনী আল্লাহ পাকেরই'।

এ কথার তাৎপর্য হলো, কেউ যেন একথা মনে না করে যে মুসলমানগণের দুর্বলতার কারণেই হোদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আসমান জমীনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকেরই, তাই কোন প্রকার দুর্বলতার কারণে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; বরং হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, বিশেষ হেকমতের কারণেই আল্লাহ পাক হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

'আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়'।

অর্থাৎ তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাঁর কোন ফেরেশতাকে প্রেরণ করে নিজেই মক্কাবাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর হেকমতের কারণে মোমেনদেরকে জেহাদের আদেশ দিয়েছেন, যেন মোমেনগণ জেহাদের সওয়াব লাভ করতে পারে এবং কাফেরদেরকেও হঠাৎ ধ্বংস না করে ঈমান আনয়নের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫১২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯২

পেশ করলেন যে, আমরা কী পাব? তখন পরবর্তী আয়াত নাজিল হলোঃ

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

অর্থাৎ মোমেন নর-নারীকে এমন জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, আর তাদের গুণাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٥

'আর তা আল্লাহ পাকের নিকট এক বিরাট সাফল্য', যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

"অতঃপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, সে অবশ্যই সফলকাম হয়।

এমনিভাবে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

"দোজখবাসী এবং জান্নাতবাসী কখনও এক সমান হতে পারেনা, জান্নাতবাসীগণই সফলকাম"।

আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তারা মহান সাফল্য লাভে ধন্য হয়।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ
الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَ
غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٦﴾
وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٧﴾
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٩﴾

তরজমা

(৬) আর আল্লাহ পাক সে সব মোনাফেক নর-নারী এবং মুশরেক নর-নারীকেও শাস্তি দিতে চান, যারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের প্রতি বিপদের ঘূর্ণি-চক্র আপতিত হোক, অধিকন্তু আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি, আর আল্লাহ পাক তাদেরকে লানত করেছেন, তাদের জন্যে তিনি দোজখ তৈরী করে রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস-স্থল।

(৭) আসমান ও জমীনের সৈন্যবাহিনী সমূহ আল্লাহ পাকেরই, আর আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(৮) হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।

(৯) যেন তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর, আর তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ পাঠ কর, তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ পাকের

ঘোষণায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথায় ঈমানের কারণে তাদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা এসেছে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক যেভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় এবং শান্তি দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মোনাফেক এবং কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর তা হবে তাদের মোনাফেকী এবং সত্যদ্রোহীতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ
الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ

'আর আল্লাহ পাক সে সব মোনাফেক নর-নারী এবং মুশরেক নর-নারীকে শাস্তি দিতে চান, যারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে'।

বর্ণিত আছে যে, মোমেনগণ যখন হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তখন মোনাফেক ও মুশরেকরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপ করতে লাগলো এবং আল্লাহ পাকের শানে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করলো, যেমন তারা বলতে শুরু করলো, আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মোমেনদেরকে সাহায্য করবেন না, কোন কোন মোনাফেক বললো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না। অথবা মন্দ ধারণার অর্থ হলো, তারা আল্লাহ পাকের সংগে অন্য অনেক কিছুকে শরীক মনে করতো।

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেক এবং মুশরেকদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, আজাবের ঘোষণার ক্ষেত্রে মুশরেকদের পূর্বে মোনাফেকদের উল্লেখ রয়েছে, কেননা মুশরেকদেরকে সকলেই ইসলামের দুশমন জানে, ইসলামের প্রতি তাদের দুশমনী প্রকাশ্য, কিন্তু মোনাফেকদের কুফরী ও নাফরমানী তারা কখনো প্রকাশ করেনা, সর্বদা তারা নিজেদের অবস্থা গোপন রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মোনাফেক হলো ইবলিস শয়তানের ন্যায়, ইবলিস যখন মানুষকে প্রতারণার জন্যে আসে, তখন সে আদৌ একথা প্রকাশ করেনা যে, আমি তোমার শত্রু, বরং সে বন্ধু বেশেই আসে, এমনিভাবে মোনাফেকরা নিজেদেরকে মোমেন বলে

দাবী করতো, প্রকাশ্যে তাদেরকে ইসলামের শত্রু মনে করাও কঠিন ছিল, কিন্তু তারা ঈমনদার না হয়েও ঈমানের দাবীদার ছিল, এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পূর্বে মোনাফেকদের উল্লেখ করেছেন।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মোনাফেকদের এ মন্দ ধারণা ছিল যে, অল্পসংখ্যক মুসলমান কাফেরদের দেশে গমন করে মহাবিপদের সন্মুখীন হবে। পরাজয় তো অবধারিত, তদুপরি হয়তো কেউ জীবিত ফিরেও আসতে পারবেনা। আর কাফেররা এ মন্দ ধারণা করে যে, ওমরাহ করার যে কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়, বরং ওমরার নামে মক্কা দখলের উদ্দেশ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সফর করছেন। মোনাফেক ও কাফেরদের এসব ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা পরবর্তীকালে বাস্তবে প্রমাণিত হয়। এরপর মোনাফেক ও কাফেরদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছেঃ

عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ

'তাদের প্রতি বিপদের ঘূর্ণি–চক্র আপতিত হোক'।

মোনাফেক ও কাফেররা ধারণা করেছিল যে, মুসলমানদের উপর বিপদ আসন্ন, কিন্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিপদ মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং মোনাফেক ও কাফেরদের উপরই বিপদ ও ধ্বংসের ঘূর্ণি-চক্র আপতিত হবে, আর তা তাদের মোনাফেকী এবং নাফরমানীরই শাস্তি, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ পাকের গজবও তাদের উপর পড়বে এবং আল্লাহ পাকের লা'নতও রয়েছে তাদের প্রতি। আর আখেরাতে হবে তাদের প্রতি কঠিন কঠোর শাস্তি, কেননা আল্লাহ পাক তাদের জন্যে দোজখ তৈরী করে রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস–স্থল।

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেক ও কাফেরদের জন্যে চারটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

(১) তাদের উপর বিপদাপদের ঘূর্ণি–চক্র আপতিত হবে, কখনও এর থেকে তারা রেহাই পাবেনা,

(২) তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গজব অবধারিত,

(৩) তারা হবে অভিশপ্ত, রহমত থেকে বঞ্চিত, কোপগ্রস্ত। এ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এরপর আখেরাতের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪

(৪) আর আল্লাহ পাক তাদের জন্যে দোজখ তৈরী করে রেখেছেন তা অত্যন্ত মন্দ আবাস-স্থল।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

'এবং আসমান জমীনের সৈন্য-বাহিনী সমূহ আল্লাহ পাকেরই, আর আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী, তিনি মহাজ্ঞানী',

বস্তুতঃ আসমান জমীনে এক আল্লাহ পাকেরই একচ্ছত্র ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত, ইসলাম ও মোমেনদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত দুশমনদের শাস্তি বিধান করা কোন কঠিন কাজই নয়, কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি মহাজ্ঞানীও, তিনি সুবিবেচকও, সকলের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে তিনি শাস্তির আদেশ প্রদান করেন, তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করেন না, ক্ষেত্র বিশেষে তিনি অবকাশও দান করে থাকেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এ আয়াত সমূহে দু'টি স্থানে প্রায় একই প্রকার ঘোষণা রয়েছে, প্রথমে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

এবং আল্লাহ পাকের জন্যেই আসমান জমীনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমূহ, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। আর আলোচ্য আয়াতেও অনুরূপ ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, আল্লাহ পাকই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থা করেন, তিনি তাঁর হেকমত বা সুবিবেচনা মোতাবেক যেমন ইচ্ছা তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। আর আলোচ্য আয়াতেও ঘোষণা করা হয়েছে, আসমান জমীনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকের, তবে যেহেতু এতে পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তাই عَزِيْزًا حَكِيْمًا বলা হয়েছে, তিনি মহা পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইসলামের দুশমনদের যে কোন স্থানে শাস্তি দিতে পারেন, তবে তিনি সুবিবেচকও, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ এবং বিবেচনা প্রসূত।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াত সমূহে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়নি। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে جنود বা সৈন্যবাহিনী বলে রহমতের সৈন্যবাহিনী উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে আজাবের সৈন্যবাহিনী উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٨ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩

'হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি স্বাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, যেন তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর, আর তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর তসবীহ্ পাঠ কর, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক'।

পূর্ববর্তী আয়াতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করার পর চারটি এমন নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আর এ আয়াতে এমন নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে দান করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানব জাতির কাছে, সাক্ষী রূপে এবং মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ দাতা হিসেবে, আর কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হিসেবে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমরা সাহায্য কর এবং তাঁর সম্মান কর, তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা উপলব্ধি কর, আর এ সত্যও উপলব্ধি কর যে, তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দান করা এবং যারা ঈমান আনেনা, নেক আমল করেনা, তাদেরকে সতর্ক করা। আর তোমরা যেন সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামের মহিমা বর্ণনা কর তথা তসবীহ্ পাঠ কর।

তফসীরকারগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতেই ঈমান ও নেক আমলের জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন, আর কাফেরদেরকে দুনিয়াতেই তিনি ভয়-প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু স্বাক্ষ্য প্রদানের যে দায়িত্ব তাঁর প্রতি রয়েছে তা তিনি পালন করবেন কেয়ামতের কঠিন দিনে, সেদিন উম্মতের আমল সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য করা, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ পাকের মহিমা বর্ণনা করার তাৎপর্য হলো, সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে তন্ময় থাকা।

কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, সকাল–সন্ধ্যা তসবীহ পাঠ করার তাৎপর্য হলো নামাজ আদায় করা।

আলোচ্য আয়াতের تُعَزِّرُوْهُ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরো কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, এ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা সাহায্য করা বা তা'যীম করা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই হতে পারে, আর تسبحوه এর সর্বনামটি দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার দায়িত্ব আল্লাহ পাকের সম্পর্কেই পালন করা যেতে পারে। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ সর্বনামগুলো দ্বারা আল্লাহ পাক ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারেন। যদি আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয় তবে সম্মান করা এবং সাহায্য করার তাৎপর্য হবে দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। আর যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এর অর্থ হবে তাঁর মহান আদর্শের বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। আর আল্লামা জমখশরী লিখেছেন, সকল সর্বনাম দ্বারাই আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আপনাকে আপনার উম্মতের উপর স্বাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছি, আল্লাহ পাকের তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কে তাঁর এ আহবানে সাড়া দিয়েছে, আর কে তাঁর বিরোধিতা করেছে, এর উপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন।

দ্বিতীয়তঃ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়ে

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১০২২

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃতআল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৫-০৬

তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৯৬

ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬৬৩-৬৪

আল্লাহ পাকের তৌহীদে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাদের জন্যে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন, এতদসত্ত্বেও যারা ঈমান আনবেনা, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি দোজখের শাস্তির কথা ঘোষণা করবেন।

তৃতীয়তঃ কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করা, দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্য করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

চতুর্থতঃ আল্লাহ পাকের জিকর ও তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনায় সর্বক্ষণ মশগুল থাকা।[১]

তফসীরকার কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[২]

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ
اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ
الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

১ তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭

তরজমা

(১০) (হে রসূল!) যারা আপনার নিকট বয়আত (অঙ্গীকার) করে, তারা তো (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ পাকেরই নিকট বয়আত করে, আল্লাহ পাকের হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে, এরপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ পাক তাকে অচিরেই মহা পুরস্কার দান করবেন।

(১১) যে সব আরব গ্রামবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ এবং আমাদের পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। অতএব, আমাদের জন্যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে, তাদের অন্তরে তা নেই, (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক যদি তোমাদের অপকার বা উপকার করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁর বিরোধিতা করার শক্তি কার রয়েছে? তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

(১২) বরং তোমরা মনে করেছিলে, রসূল এবং মোমেনগণ আর কখনও তাঁদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসতে পারবেনা, আর তা তোমাদের মনে ভালও লেগেছিল, আর তোমরা নানা প্রকার মন্দ ধারণাও করছিলে, (এ কারণেই) তোমরা হয়েছ ধংসোন্মুখ সম্প্রদায়।

তফসীরুল কোরআন

হোদায়বিয়াতে যখন এ খবর প্রচারিত হয় যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূত হযরত ওসমান (রাঃ)-কে প্রথমে বন্দী ও পরে শহীদ করেছে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে জেহাদের বয়আত নিলেন। আলোচ্য আয়াতে সে বয়আতেরই উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

(হে রসূল!) যারা আপনার নিকট বয়আত (অঙ্গীকার) করে, তারা তো (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ পাকেরই নিকট বয়আত করে, আল্লাহ পাকের হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে'।

বয়আতের তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে যে বয়আতের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো বিশেষ অঙ্গীকার. ইসলাম বা জেহাদ সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় সাহাবায়ে কেরাম থেকে বয়আত গ্রহণ করতেন এ মর্মে যে, আমরা প্রাণপণ জেহাদ করবো, কখনো কোন অবস্থাতেই দুশমনের মোকাবেলা থেকে পিছপা হবোনা।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকের উপর হাত রেখে তাঁরা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁরা আমরণ জেহাদ করবেন। সাহাবায়ে কেরামের এ বয়আত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) মোমেনগণ আপনার হাতে হাত রেখে যে অঙ্গীকার করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সে অঙ্গীকার তারা আমার সঙ্গেই করেছে, কেননা সে অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের লক্ষ্যেই, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

(যে রসূলের অনুগত হয়, সে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।)

এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মেনে চলে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকেরই কথা মানে, বস্তুতঃ এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বয়আতের এ প্রথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই আজো অব্যাহত রয়েছে। বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মসংশোধনের জন্যে হাজির হয়, তাদেরকে তাঁরা বয়আত করেন যে, তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করবেনা, শরীয়ত বিরোধী কাজে অংশ নেবেনা।

হোদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে হাত রেখে যে বয়আত করেছিলেন, তা ইতিহাসে "বয়আতে রেজওয়ান" বলে অভিহিত। এ বয়আতকে শুধু যে আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের সাথে বয়আত বলে আখ্যা দিয়েছেন তাই নয়; বরং পরবর্তী আয়াতাংশে একথাও বলেছেনঃ

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সেদিন জেহাদের বয়আত করেছিলেন, তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাক পুরস্কারের যে ওয়াদা করেছেন, তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

আল্লাহ পাকের "হাত" বলে তাঁর এমনি একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্ণনাতীত, এমনকি, কল্পনাতীত।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের يَدُ اللّٰهِ (আল্লাহ পাকের হাত) দ্বারা আল্লাহ পাকের হেদায়েতের নেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে জেহাদের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের নেয়ামত দান করেছেন।[1]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের (১) يَدُ اللّٰهِ কথাটির অর্থ হলো نعمت الله অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেয়ামত তাদের প্রতি রয়েছে। (২) نصرت অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের সাহায্য তাদের জন্যে রয়েছে। (৩) এর অর্থ হলো, غلبت অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করেছেন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত।[2]

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তবরারি ধারণ করেছে, সে যেন আল্লাহ পাকের নিকট বয়আত করেছে, তথা আল্লাহ্ পাকের নিকট জেহাদের অঙ্গীকার করেছে। হাদীস শরীফে রয়েছে, হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন এই পাথরটিকে দাঁড় করাবেন, তার দু'টি চক্ষু থাকবে, যা দ্বারা সে দেখবে, আর তার রসনা থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে, হজরে আসওয়াদকে যে চুম্বন করেছে, তার পক্ষে সে স্বাক্ষ্য দেবে। আর ঐ চুম্বনকারী মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট অঙ্গীকারকারী বিবেচিত হবে। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-(১০), পৃষ্ঠা-৫১৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৭

ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে যে বয়আতের কথা বলা হয়েছে, তা-ই হলো "বয়আতুর রেজওয়ান" যা একটি বৃক্ষতলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[১]

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হোদায়বিয়ায় পানি সংকট দেখা দেয়, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের যার যা পানি রয়েছে, তা একটি পাত্রে নিয়ে আস। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পাত্রে তাঁর দস্তে মোবারক স্থাপন করলেন, পানি এত কম ছিল যে, তাতে তাঁর আঙ্গুল মোবারকও ডুবলনা, কিন্তু তাঁর দস্তে মোবারক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের নিজ নিজ পাত্রে পানি সংগ্রহ করলেন এবং সকলেরই প্রয়োজন মিটল।

হযরত জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেদিন আপনারা কত লোক ছিলেন? তিনি বললেন, চৌদ্দশ', তবে যদি এক লক্ষ লোকও হতো, তবু ঐ পানি সকলের জন্যে যথেষ্ট হতো।

হোদায়বিয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বোখারী (রঃ), আবদ এবনে হোমায়েদ (রঃ), আবু দাউদ (রঃ) এবং নাসায়ী (রঃ) প্রমুখ ইমাম জুহরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়া রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল সম্পন্ন করেছেন এবং চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করেছেন, এরপর "কোসওয়া" নামক উস্ত্রীর উপর আরোহন করেছেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়েছেন, উম্মে মানীয় আসমা বিনতে আমর, উম্মে আম্মারা আশহালীয়া প্রমুখও সংগে ছিলেন, মোহাজের ও আনসারগণ এবং অন্যান্য আরব গোত্রেরও কিছু লোক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, যেহেতু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি ওমরাহ করছেন, সেজন্যে মুসল-মানদের বিজয় সম্পর্কে কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিলনা, তবে সাহাবায়ে কেরামের নিকট তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিলনা, আর তা-ও খাপে ভরা ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কোরবাণীর জন্যে কিছু পশু পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে সোমবার দিন তিনি মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, দ্বিপ্রহে

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৪৭

"জুলহোলায়ফা" নামক স্থানে পৌছে জোহরের নামাজ আদায় করেন। কোরবাণীর জন্যে সত্তরটি উট নির্দিষ্ট ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে দু'টি অশ্বও ছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেশের এবনে সুফিয়ান (রাঃ) নামক সাহাবীকে কোরায়েশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন এবং ওব্বাদ এবনে বশরকে বিশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়ে অগ্রবর্তী দল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এ দলের অধিনায়ক ছিলেন সাদ এবনে জায়েদ আশহালী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর দু' রাকাআত নামাজ আদায় করেন, এবং "জুলহোলায়ফার" মসজিদের সম্মুখ থেকে তিনি উষ্ট্রীর উপর আরোহন করেন, তখন তিনি ওমরার এহরাম বেধেছেন, যেন কারো মনে এ আশংকা না থাকে যে, তিনি যুদ্ধের জন্যে মক্কাশরীফ গমন করছেন; বরং সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, কাবা শরীফের জেয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি এ সফর করছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পাঠ করেন, তাঁর এহরাম দেখে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও এহরাম বাধেন। অবশ্য কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম "জুহফা" নামক স্থানে এহরাম বেধেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "বয়দা" নামক স্থান দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে বণীবকর, মোজায়না এবং জুহায়না নামক গোত্রের আবাস স্থল ছিল, তিনি তাদেরকেও ওমরার সফরে রওয়ানা হওয়ার আহবান জানান, কিন্তু তারা নিজেদের আর্থিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল এবং একে অন্যকে তারা বললো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে বলছিলেন, যারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহনের দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ তাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হবে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ আর কখনো ফিরে আসবেন না, এরা বড় অসহায়, তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও নেই।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন "জুহফা" নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করার আদেশ প্রদান করেন, এরপর তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হতে চাই, আর তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিষ রেখে যাব, (১) আল্লাহর কিতাব (২) আল্লাহর নবীর আদর্শ, যদি তোমরা এ দু'টি জিনিষ আঁকড়ে ধরে থাক, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা।

এদিকে মক্কার কাফেররা যখন এ সংবাদ পেল যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়েছেন, তখন তারা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলো এবং বললো, "মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওমরার জন্যে সৈন্যবাহিনী সহ আমাদের নিকট আসতে চান, আরবের লোকেরা শুনবে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক প্রকার জবরদস্তি আমাদের এখানে এসে গেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধাবস্থা রয়েছে, এতে সকলেই আমাদের দূর্বলতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে, আমরা তা হতে দেবনা"। এরপর দু'শ অশ্বারোহীকে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলার জন্যে "কোরাউল গমীম" নামক স্থানে প্রেরণ করলো, এদের অধিনায়ক ছিল খালেদ এবনে ওয়ালিদ (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি), খালেদ আরবের আরো কয়েকটি গোত্রের লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয় এবং বণী সকীফ গোত্রের লোকেরাও তার সঙ্গে যোগ দেয়। এভাবে সকলে "বালদাহ" নামক স্থানে পৌছে অবস্থান নেয়, তারা একত্রিত হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করে, আর এ-ও স্থির করে যে, কোন অবস্থাতেই তাঁকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবেনা। গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে তারা দশ ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর মোতায়েন করে, তাদের একজন আরেকজনকে উচ্চস্বরে বলতো,"মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এখন এ কাজ করছেন," আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা বলতো, এভাবে কোরায়েশরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতো।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বশর এবনে সুফিয়ানকে গোয়েন্দা কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং "গাদীরুল আশতাত" নামক স্থানে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন এবং আরজ করেন, "আপনার রওয়ানা হওয়ার কথা কোরায়েশরা জেনে ফেলেছে, তারা এখন "জীতুওয়া" নামক স্থানে অবস্থান করছে, আর সকলে শপথ করে এ সংকল্প করেছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কখনও মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবেনা, আর এ উদ্দেশ্যেই খালেদ বিন ওয়ালিদকে পূর্বেই "কোরাউল গমীমে" প্রেরণ করেছে"। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "অত্যন্ত আক্ষেপ হয় কোরায়েশের অবস্থা দেখে, যুদ্ধ যেন তাদেরকে পেয়ে বসেছে, আমাকে যদি আরবদের ব্যাপারে তারা কোন প্রকার বাধা না দিত, তবে তাদের কী ক্ষতি হতো! যদি আরবরা

আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতো, তবে তাদের উদ্দেশ্যই সফল হতো, আর যদি আল্লাহ পাক আমাকে বিজয় দান করেন, তবে তারা আমাদের দলে প্রবেশ করতো এবং আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতো। যদি তারা এমন না-ও করতো, অর্থাৎ মুসলমানদের দলে প্রবেশ না করতো, তবে শক্তি থাকলে তারা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, কোরায়েশদের ধারণা কি? আল্লাহর শপথ! আমি দ্বীন ইসলামের জন্যে তাদের সাথে সর্বদা জেহাদ করতে থাকবো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ পাক এই দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন"। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা পাঠ করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ হে মুসলমানগণ! আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের কী অভিমত? আমি কি এদের সন্তান-সন্তুতির দিকে দৃষ্টিপাত করবো এবং তাদেরকে ধরে ফেলবো? অথবা নীরব হয়ে বসে থাকবো, যদি তারা আমাদের মোকাবেলায় আসে, তবে কিছু লোকের জীবনাবসান ঘটবে, অর্থাৎ তাদের একদল নিহত হবে, অথবা তোমাদের যদি এ মত হয় যে, আমরা কাবা শরীফের জেয়ারতের জন্যেই এসেছি, যদি কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সংগে লড়াই করবো। হযরত আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কাবা শরীফের উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়েছেন, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার অভিপ্রেত ছিলনা, অতএব আমরা কাবা শরীফের দিকে যেতে থাকি, যদি পথিমধ্যে কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সংগে যুদ্ধ করবো।

হযরত ওসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর এ মত সমর্থন করলেন।

এবনে আবি শায়বার বর্ণনা হলো, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কথার পর হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াদ (রাঃ) আরজ করলেন, আমরা আপনার নিকট সে কথা বলবোনা, যা বণী ইসরাঈল জাতি তাদের পয়গম্বরকে বলেছিল, "আপনি এবং আপনার প্রতিপালক যান, উভয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকবো", বরং আমরা আপনাকে বলবো, "আপনি এবং আপনার প্রতিপালক মোশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার পাশে থেকে যুদ্ধ করবো"। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তাহলে বিসমিল্লাহ বলে চল"।

এবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেন, খালেদ এবনে ওয়ালিদ তার অশ্বারোহীদের নিয়ে এত সন্নিকটে এসে গিয়েছিল যে, তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়, তাই তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওব্বাদ এবনে বশরকে অগ্রসর হয়ে কাতারবন্দী হওয়ার আদেশ দেন, ওব্বাদ (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হলেন এবং খালেদের মোকাবিলায় তাঁর অশ্বারোহীগণকে সারিবদ্ধ করলেন, এমন সময় জোহরের নামাজের সময় হলো, হযরত বেলাল (রাঃ) আজান দিলেন, একামত দিলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন, খালেদ বললোঃ তারা গাফলতের অবস্থায় ছিল, আমরা যদি নামাজরত অবস্থায় আক্রমণ করতাম, তবে সফল হতাম। যাহোক, এরপর তাদের আরেকটি নামাজের সময় আসবে, যা তাদের নিকট প্রাণ এবং সন্তান-সন্ততীদের চেয়েও অধিকতর প্রিয়, তখন আমরা হামলা করবো।

সালাতুল খওফের আদেশ

হযরত জীব্রাঈল (আঃ) জোহর এবং আছরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ পাকের এ মহান বাণী নিয়ে হাজির হলেনঃ

إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদেরকে নামাজে দাঁড় করান, তখন তাদের একদল যেন আপনার সঙ্গে নামাজে দাঁড়ায় এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সঙ্গে রাখে, এরপর যখন তারা সেজদা শেষ করে, তখন যেন তারা আপনার পেছনে যায় এবং অন্য দল যারা নামাজ আদায় করে নাই, তারা যেন আপনার সঙ্গে নামাজ আদায় করে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ অস্ত্র যেন সঙ্গে রাখে"। এ আয়াতে "সালাতুল খওফের" নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মুসলমানদের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নামাজরত অবস্থায় দুশমনের আক্রমণের আশংকা দেখা দেয়, তখন মুসলমানগণকে দু'দলে বিভক্ত করা হবে, একদল ইমামের পেছনে নামাজে দাঁড়াবে, আরেকদল থাকবে দুশমনের মোকাবেলায়, যখন প্রথম দল সেজদা শেষ করে দন্ডায়মান হবে, তখন তারা দুশমনের মোকাবেলায় চলে যাবে। আর যারা এতক্ষণ দুশমনের মোকাবিলায় ছিল, তারা ইমামের পেছনে দন্ডায়মান হবে এবং নামাজ আদায় করবে।[১]

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড- (৫), পৃষ্ঠা- ৯৯

এভাবে সেদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছরের নামাজ আদায় করলেন।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন সন্ধ্যা হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা হেম্মাসের পথে চল, কেননা খালেদ বিন ওয়ালিদ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে "কোরাউল গমীমে" রয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র ছিলেন, তিনি এই সফরে সংঘর্ষ পছন্দ করছিলেন না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমাদের মধ্যে "হানজল' নামক ঘাঁটিটি কে চেনে"? তখন বোরায়দা এবনে হাসিব বললেন, "আমি চিনি"।

মাগফেরাতের সুসংবাদ

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, আর এ হাদীসই হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা আবু নায়ীম সংকলন করেছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়ার সফরে আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হয়েছি, আমরা প্রথমে "আসফান" নামক স্থানে এসে পৌছাই, রাতের শেষ প্রহরে "হানজাল" নামক ঘাঁটির সন্মুখে পৌছি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেছেনঃ আজ রাত এ ঘাঁটিটির দৃষ্টান্ত হলো সে ফটকের, যাতে প্রবেশের জন্যে আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈল জাতিকে আদেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا.........

(তোমরা সেজদারত অবস্থায় এই ফটকে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব।)

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আজ রাত যে এ ঘাঁটিটি অতিক্রম করবে, আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করি, তবে কোরায়শরা আমাদেরকে দেখবে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ অবশ্যই নয়, তারা আমাদেরকে দেখতে পারবে না। এরপর তিনি এরশাদ করেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! সকল অশ্বারোহীকে অথবা কাফেলার সকল সদস্যকে আজ রাতে

ক্ষমা করা হয়েছে, শুধু লাল বর্ণের উষ্ট্রারোহী ঐ লোকটি ব্যতীত। সে ছিল বণী জমরার এক ব্যক্তি।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা ঐ ব্যক্তিকে বললাম, চল আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার জন্যে আরজী পেশ করবো, যেন তিনি তোমার জন্যে দোয়া করেন। সে বললো, যদি আমার হারানো উষ্ট্রীটি আমি পেয়ে যাই, তবে আপনাদের সাথীর দোয়ার চেয়েও আমার নিকট তা অধিকতর পছন্দনীয় হবে। এর একটু পর আমরা "সোরাদে" নামক স্থানের কাছাকাছি পৌছে গেলাম, তখন ঐ ব্যক্তির উষ্ট্রীটি হোচট খেয়ে পড়ে গেল এবং উষ্ট্রের পিঠ থেকে পড়ে ঐ ব্যক্তি মারা গেল। এরপর জানা যায়নি যে, কোন চতুষ্পদ জন্তু তার দেহ ভক্ষণ করে ফেলেছে কি-না।

হযরত মুসাওয়্যার এবনে মাখরামা (রাঃ) এবং মারওয়ানের সূত্রে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হোদায়বিয়ার নিকট পৌছলেন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সন্মুখস্থ পা জমীনের অভ্যন্তরে ঢুকে গেল (উটটি বসে গেল), লোকেরা বললো, চল, চল, কিন্তু উটটি পূর্ববত বসেই রইল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "উষ্ট্রীকে তিনিই উঠতে বিরত করেছেন, যিনি হাতিগুলোকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে বিরত রেখেছিলেন, শপথ সে আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমাদের প্রাণ! আজকে কোরায়েশ যে দাবীই করুক না কেন, তা আমি মঞ্জুর করবো। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ পাক যে সব বিষয়ের সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন, তা যেন লংঘন করা না হয়"। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীটিকে ধমক দিলেন, তখন সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর হোদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছলেন, সামান্য পানি ছিল, সেখানেই তিনি অবতরণ করলেন।

সাহাবায়ে কেরামের ধারণা হলো পানি অতি সামান্য, লোকেরা শীঘ্রিই শেষ করে ফেলবে, অবশেষে তাই হলো, অল্পক্ষণের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে গেলো।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর মোযেজা

কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পানির অভাবের কথা বললো, তিনি সংঙ্গে সংঙ্গে তাঁর একটি তীর বের করে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, এই তীরটিকে সে গর্তে স্থাপন কর, যেখানে পানি একত্রিত হয়। সংগে সংগে এ নির্দেশ পালন করা হলো. এরপর লোকেরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে বের হতে লাগলো।

হযরত মুসাওয়্যায় (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ পানি এত বেশী হয়েছিল যে লোকেরা অবশেষে কূপের উপরে বসে তাদের পাত্র পূর্ণ করতে লাগলো। আর যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তীর নিয়ে কূপের অভ্যন্তরে স্থাপন করেছিলেন. তিনি হলেন নাহিয়া এবনে যুন্দব (রাঃ)। তিনিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রগুলো দেখাশুনা করতেন, নাহিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন. লোকেরা যখন পানির সংকটের কথা বললো, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তলব করে একটি তীর দিলেন এবং ঐ কূপ থেকে পাত্রে করে পানি আনার নির্দেশ দিলেন, আমি পানি এনে দিলে তিনি তা দ্বারা ওজু করলেন এবং কুলি করে কুলির পানিটুকু পাত্রে ফেললেন, সেখানে একটি মাত্র কূপই বর্তমান ছিল. মুশরেকরা ইতিপূর্বে বালদাহ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখানের পানির উপর তারা নিয়ন্ত্রণ করলো. হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, পানির এ পাত্রটি নিয়ে তুমি কূপের ভেতরে প্রবেশ কর এবং পাত্রটি সেখানে উল্টে দাও এবং এই তীরটি সেখানে স্থাপন কর। আমি হুকুম তামিল করলাম, শপথ সে আল্লাহ পাকের! যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন. আমি কূপ থেকে বের হতে পারিনি. এত তাড়াতাড়ি পানি আমার উপর এসে গেছে এবং কূপটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে এবং লোকেরা উপর থেকে বসে বসে পানি নিতে শুরু করে।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হোদায়বিয়ার দিন সকলেই তৃষ্ণার্ত ছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চামড়ার তৈরী পাত্র ছিল, লোকেরা আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের পান করার এবং অজুর জন্যে কোন পানি নেই, শুধু এতটুকু রয়েছে যা এ পাত্রে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরেকটি বড় পাত্র ছিল। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ঐ পাত্রের পানি বড় পাত্রে ঢেলে দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাত মোবারক ঐ পাত্রে রাখলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে লাগলো. আমরা ঐ পানি পান করলাম এবং তা দ্বারা অজু করলাম।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নিশ্চিন্ত হলেন. তখন বোদায়েল এবনে ওয়ারকা খাজাআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়

(তিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন) তার সাথীদের মধ্যে ছিল আমর এবনে সালেম, হারাম এবনে উমাইয়া, খারেজা এবনে হুরজ এবং এজিদ এবনে উমাইয়া। সকলে এসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সালাম দেয় এবং এরপর বোদায়েল বল্যে, আমরা আপনার নিকট আমাদের সম্প্রদায় তথা কোরায়েশের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনার মোকাবেলার জন্যে সমস্ত গোত্রগুলোকে বের করে আনা হয়েছে, যারা কোরায়েশদের কথা শ্রবণ করে, হোদায়বিয়ার পানির উপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাদের সাথে ছোট-বড়, শিশু-কিশোর এবং নবজাতক ও মায়েরা ছিল, সকলে আল্লাহর নামে শপথ করেছে যে, আপনাকে তারা কাবা শরীফ পর্যন্ত যেতে দেবেনা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমরা কারো সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি, আমরা এসেছি শুধু কাবা শরীফের তওয়াফ করতে, যে কেউ এ ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দেবে, আমরা তার সাথে লড়াই করবো, যুদ্ধের কারণে কোরায়েশ এত দুর্বল হয়ে পড়েছে, যদি কোরায়েশ ইচ্ছা করে তবে আমি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তাদের সাথে শান্তি চুক্তি করতে প্রস্তুত রয়েছি, শর্ত হলো এই যে, কোরায়েশরা আমাদের এবং অন্য লোকদের ব্যাপারে কোন প্রকার নাক গলাবেনা। অন্য গোত্রের সংখ্যা কোরায়েশের চেয়ে অনেক বেশী, যদি অন্য গোত্রের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, তবে কোরায়েশের উদ্দেশ্য সফল হবে, আর যদি আমাদের বিজয় হয়, তবে কোরায়েশের অধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে তারা এই দ্বীনে প্রবেশ করতে পারবে, আর ইচ্ছা করলে তারা সকলে একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তারা আমার আহবানে সাড়া না দেয়, তবে আল্লাহ পাকের শপথ! আমি আমার কাজ, চেষ্টা ও সাধনা অব্যাহত রাখবো, এমনকি, যদি আমার প্রাণ একাও থেকে যায়, অথবা আল্লাহ পাক নিজের হুকুম জারী করেন (অর্থাৎ আমি সফল হয়ে যাই)।

বোদায়েল বললো, আমি কোরায়েশকে আপনার এসব কথা পৌছে দেবো, এরপর সে কোরায়েশকে বললো, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে আমি এসেছি, আপনাদেরকে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে চাই, একরামা এবনে আবু জেহেল এবং হাকাম এবনে আস বললো (তারা উভয়ে পরে মুসলমান হয়েছেন), আমাদেরকে তাঁর কথা শোনানোর কোন প্রয়োজন নেই; বরং তাঁকে আমাদের কথা বলে দাও, আমাদের মধ্যে একজনও যতক্ষণ জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। তখন ওরওয়া এবনে মাসউদ সাকাফী পরামর্শ দিল যে, তোমরা তাঁর কথা শ্রবণ কর, এরপর ইচ্ছে হলে মান,

অন্যথায় মানবেনা। (সাফওয়ান এবনে উমাইয়া এবং হারেস এবনে হিশাম উভয়ে পরে মুসলমান হয়েছিলেন) তাঁরা বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যা শ্রবণ করেছ, তা বর্ণনা কর, তখন বোদায়েল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করলো।

এরপর ওরওয়া বললো, "হে আমার জাতি! তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও"? তারা বললো, "অবশ্যই", ওরওয়া পুনরায় প্রশ্ন করলো, "আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই"? লোকেরা বললো, "অবশ্যই (ওরওয়া এবনে মাসউদ আবদে শামসের বংশধরদের সাথে সাতটি কোরায়েশী সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল)"। ওরওয়া পুনরায় বললো, "তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যে ওকাজবাসীকে নিয়ে এসেছিলাম, যারা আমার কথা মেনে ছিল"। লোকেরা বললো, নিঃসন্দেহে সত্য। ওরওয়া বললো, এই ব্যক্তি (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একটি ভাল কথা বলেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং আমাকে অনুমতি দাও, আমি তাঁর নিকট গিয়ে কথা বলি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওরওয়াকে সে কথাই বললেন, যা তিনি বোদায়েলকে বলেছিলেন। ওরওয়া বললা, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম!) যদি আপনি আপনার জাতির মূলোৎপাটন করে দেন তবে তা কি ভাল কাজ হবে? আপনি কি শুনেছেন, আপনার পূর্বে কোন আরব নিজেদের মূলোৎপাটন করেছে? আর যদি বিকল্প কিছু হয়, (অর্থাৎ যদি আপনি পরাজিত হন, যা অসম্ভব নয়) তাহলে আপনার পার্শ্বে যারা রয়েছে, সকলে পলায়ন করবে।

একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, তিনি বললেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে যাব? হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ক্রোধ লক্ষ্য করে ওরওয়া বললো ইনি কে? লোকেরা বললো, ইনি হযরত আবুবকর (রাঃ)।

তখন ওরওয়া বললো, 'শপথ সে পবিত্র সত্ত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যদি আমার প্রতি ইতিপূর্বে আপনার এহসান না থাকত, তবে আমি আপনার কথার জবাব দিতাম। ওরওয়া একটি হত্যার রক্তপণের দায়িত্ব নিয়েছিল, এ কাজে অনেকে তাকে সাহায্য করেছে, কেউ এক অংশ কেউ বা দু'অংশ প্রদান করে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) সবচেয়ে বেশী দশ ভাগ প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঐ এহসানের কথাই ওরওয়া স্মরণ করে।

যাহোক, ওরওয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো, সে দেখলোঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন থুথু ফেলেন, তখন তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মাটিতে পড়তে দেন না; বরং নিজেদের গায়ে মুখে মেখে নেন, তিনি নাক পরিস্কার করলেও তাঁরা তাই করেন। সে আরও দেখলো, যখন তিনি কোন কাজের আদেশ দেন, তখন সকল সাহাবী ঐ কাজ করতে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন। আর যখন তিনি অজু করেন, তখন তাঁর ব্যবহৃত পানি নেয়ার জন্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি হয়, আর যখন তিনি কথা বলেন, তখন সকলে নীরব হয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করেন। তাঁর প্রতি আদব ও তাজীমের খাতিরে কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায়না, এসব দৃশ্য দেখে ওরওয়া অত্যন্ত বিস্মিত হলো, এরপর তার সহযোগীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সে বললো, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি অনেক বাদশাহের দরবারে গিয়েছি, রোমক সম্রাট, পারশ্য সম্রাট এবং নাজ্জাশীর দরবারে আমি হাজির হয়েছি, কিন্তু কোন রাজা বাদশাহকে এত সম্মান করতে আমি দেখিনি, যা দেখেছি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। তাঁর সাথীরা তাঁর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এরপর ওরওয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে যে সব বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছে, একে একে সব খুলে বললো, এরপর মন্তব্য করলো, "তিনি একটি ভাল কথা বলেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর", তখন কোরায়েশ জবাব দেয়, তুমি তাঁকে এ বছর ফেরত যেতে বল, আগামী বছর এসে যেন ওমরাহ করে। ওরওয়া বললো, আমি দেখছি, তোমাদের উপর বিপদ আসন্ন, একথা বলে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে তায়েফ চলে গেল।

বিভিন্ন গোত্রের যে সব লোক কোরায়েশদের সাহায্যে এসেছিল, তাদের অধিনায়ক ছিল জালীস এবনে আলকামা। ওরওয়ার প্রস্থানের পর সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে রওয়ানা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আসতে দেখে এরশাদ করলেন, এরা সে সব লোক, যারা কোরবাণীর উষ্ট্রের সম্মান করে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে। তোমরা কোরবাণীর উষ্ট্রগুলোকে নিয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম কর, যেন সে দেখে নেয়। যখন জালীস কোরবাণীর উষ্ট্রগুলোকে আসতে দেখল এবং এগুলো যে কোরবাণীর জন্যে নির্দিষ্ট, তার নিদর্শনও দেখল, একাধারে অনেক দিন বেধে রাখার কারণে এগুলোর চুল পর্যন্ত উড়ে গেছে, এ অবস্থা দেখে জালীস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট

না এসে তৎক্ষণাত কোরায়েশের নিকট ফিরে যায় এবং বলে, হে কোরায়েশের দল! আমি কোরবাণীর জন্তুগুলোকে দেখে এসেছি, তাদের গর্দানে কোরবাণীর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়ার নিদর্শনও ঝুলন্ত রয়েছে। এমন অবস্থায় মুসলমানদেরকে কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে যেতে বাধা দেয়া বৈধ হবেনা। কোরায়েশরা বললো, "তুমি বসে পড়, তুমি বেদুঈন, তুমি কিছুই জাননা"। একথা শুনে জালীস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় এবং বলে, হে কোরায়েশের দল! এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আর আমরা এ অঙ্গীকার করিনি যে, যারা কা'বা শরীফের তাযীমের জন্যে আসবে, তোমরা তাদেরকে বাধা দেবে (আর আমরাও হবো এতে তোমাদের সহযোগী) , শপথ সে পবিত্র সত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে জালীসের প্রাণ, হয় তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা, নচেৎ বিভিন্ন গোত্রের যারা এসেছে, তারা সকলে স্থান ত্যাগ করবে, অর্থাৎ আমি সকলকে নিয়ে চলে যাব। কোরায়েশরা বললো, "হে জালীস! তুমি নীরব হও, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেনা, আমরা নিজেদের জন্যে যা পছন্দ করবো, তাই করবো"। মকরজ এবনে হাফস নামক এক ব্যক্তি তখন দন্ডায়মান হয়ে বললো, আমাকে তাদের নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও, তাকে অনুমতি দেয়া হলো, সে যখন সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, তিনি আরো এরশাদ করলেন, সে মন্দ কাজে লিপ্ত। সে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলো, তখন তিনি তাকে সে কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বোদায়েল এবং ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে এরপর তার সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলো এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে যা বলেছেন, তা জানিয়ে দিল।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং মোহাম্মদ এবনে আমর বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর "সা'লাব" নামক উটটির উপর খারাশ এবনে উমাইয়াকে আরোহণ করতে দিলেন এবং কোরায়েশ সর্দারদের নিকট তাকে প্রেরণ করলেন, যেন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য তাদের নিকট বর্ণনা করেন। আবু জেহেলের পুত্র একরামা উটটির দেহের একটি অংশ কেটে ফেলল এবং খারাশকে হত্যার ইচ্ছা করলো, কিন্তু বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একরামার ইচ্ছা কার্যকর হতে দিলনা,খারাশ এবনে উমাইয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করলো।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন, তুমি কোরায়েশ সর্দারদের নিকট যাও, তাদেরকে জানিয়ে দাও আমি যুদ্ধ করার জন্যে আসিনি; বরং ওমরার জন্যে এসেছি, আর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাও। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশও দিলেন যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যে সব মোমেন নারী-পুরুষ রয়েছে, তাদেরকে আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেবে, আর এ খবর দেবে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর দ্বীনকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় বিজয়ী করবেন, কোন ব্যক্তি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তার ঈমানের কথা আর গোপন রাখবেনা।

হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তিনি "বালদাহ" নামক স্থান অতিক্রম করেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাই এবং আল্লাহ্ পাকের দিকে তোমাদেরকে ডাকি। তোমরা সকলে আল্লাহ্ পাকের দ্বীনে প্রবেশ কর, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে-ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই সম্মানিত করবেন।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের বিরোধিতার কোন প্রয়োজনও নেই, কেননা অন্য লোকেরা যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তবে এটিই হল তোমাদের উদ্দেশ্য, আর যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিজয় লাভ করেন, তবে তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করা তোমাদের ইচ্ছাধীন থাকবে, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার; তোমাদের সংখ্যা অনেক, যুদ্ধ তোমাদেরকে অনেক দূর্বল করে ফেলেছে এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তবে একথা সত্য যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি, ওমরা করার জন্য এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কোরবাণীর উষ্ট্র রয়েছে, কোরবাণী করার নির্দিষ্ট নিদর্শন তাদের গর্দানে ঝুলন্ত রয়েছে। কোরবাণী করার পরই তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

মুশরেকরা বললো, আপনি যা বলেছেন, আমরা শ্রবণ করেছি কিন্তু কখনও এমনটি হবেনা ,আপনি প্রত্যাবর্তন করে আপনার সাথীকে বলুন যে, তিনি আমাদের নিকট পৌঁছতে পারবেন না।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত আবান এবনে সায়ীদের সাক্ষাত হয়।

আবান পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবান তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন এবং বলেন, আপনি আপনার কাজ অব্যাহত রাখুন, তাতে কোন ক্রুটি করবেন না। এরপর আবান তাঁর অশ্ব থেকে অবতরণ করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-কে অশ্বের উপর আরোহন করান এবং নিজে তার পেছনে বসেন এবং বলেন, আপনি এখানে যাতায়াত করবেন, কাউকে ভয় করবেন না। আবান এবনে সাঈদ হরমে তখন অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-কে তিনি তখন মক্কায় কোরায়েশের প্রত্যেক নেতার কাছে নিয়ে যান, কথা বলেন। সকলে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কখনও মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত ওসমান (রাঃ) দূর্বল মুসলমানদের নিকট গমন করেন, তারা দূর্বলতার কারণে মক্কাতেই রয়ে গেছেন। তাদেরকে তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ী হয়ে মক্কায় আসবো, তখন মক্কায় কেউ তার ঈমানকে গোপন রাখবেনা, অর্থাৎ মোমেনদের কোন ভয় থাকবেনা।

মুসলমানগণ এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সালাম পৌঁছে দেবেন। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন এ কাজ থেকে অবসর পেলেন, তখন কোরায়েশরা বললো, আপনি ইচ্ছা করলে বয়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করে নিতে পারেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, যতক্ষণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তওয়াফ না করছেন, ততক্ষণ আমি তা করতে পারিনা। হযরত ওসমান (রাঃ) তিন দিন মক্কা শরীফে ছিলেন এবং কোরায়েশকে ইসলাম গ্রহণের আহবান করতে থাকেন।

এদিকে হোদায়বিয়ায় মুসলমানগণ বলতে লাগলো, হযরত ওসমান (রাঃ) এখন বয়তুল্লাহ শরীফ পৌঁছে গেছেন এবং তওয়াফও করছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি ওসমান বছরের পর বছরও সেখানে থাকে, তবু যতক্ষণ আমি তওয়াফ না করছি, ততক্ষণ সে তওয়াফ করবেনা।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রে প্রহরার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন, তিন ব্যক্তিকে প্রহরার জন্যে নিযুক্ত করা হলো, যারা পর্যায়ক্রমে প্রহরায় রত থাকবেন। তাঁরা হলেন (১) আওস এবনে আওবী (২) ওব্বাদ এবনে বশর এবং (৩) মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা।

হুজুর (দঃ)-এর বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

এক রাত্রির ঘটনা। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ছিলেন, তখন হযরত মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রহরায় ছিলেন। কোরায়েশরা মকরজ এবনে হাফসের নেতৃত্বে পঞ্চাশ ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাঁবুর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে এবং মুসলমানগণকে অসতর্ক অবস্থায় পেলে তাঁর প্রতি আক্রমণ করে, কিন্তু মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা (রাঃ) তাদেরকে পাকড়াও করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করলেন। ইতিপূর্বে মকরজকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন, এ ঘটনায় তাঁর ঐ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হলো।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দ্বিপ্রহরে আমি বিশ্রামরত ছিলাম, ঠিক এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন, "হে লোক সকল! রুহুল কুদ্দুস অবতরণ করেছেন। তোমরা বয়আত কর, তোমরা বয়আত কর। আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে বের হয়ে পড়"। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, আমিই সর্ব প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করলাম। এরপর লোকেরা একের পর এক বয়আত করতে লাগলেন। যখন অর্ধেক লোক বয়আত করে ফেললেন, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে সালমা! তুমি বয়আত কর", আমি আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি বয়আত করেছি"। তিনি এরশাদ করলেন, "আরেকবার", তখন আমি দ্বিতীয়বার বয়আত করলাম। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য লোকদের বয়আত করলেন। যখন সর্বশেষ ব্যক্তিটি বয়আত করে ফেলল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তুমি বয়আত করবে না"? আমি আরয করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি তো সর্ব প্রথম এবং মধ্যে আরেকবার বয়আত করেছি", তখন তিনি এরশাদ করলেন, "আরেকবারও হোক"।

বোখারী শরীফে রয়েছে, হযরত সালামা (রাঃ) কে জিজ্ঞেসা করা হয়, তোমরা কোন্ কথার উপর বয়আত করেছিলে? তখন তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুর উপর, (অর্থাৎ) আমৃত্যু ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে আমরা জেহাদ করতে থাকব।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সুহাইল ইবনে হানীফের বর্ণনা সংকলিত

হয়েছে, যখন হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁর সাথী মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সুহাইল এবনে আমর এবং হুয়াইতাব কোরায়েশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং মুসলমানগণ যেভাবে জেহাদের জন্যে বয়আত করেছেন এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন তা জানায়, এ সংবাদ কোরায়েশদের জন্যে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। তাদের বুদ্ধিমান লোকেরা তাই বললো, এ মুহূর্তে উত্তম হল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এ শর্তে সন্ধি করা যে এ বছর তিনি ফেরত যাবেন, বয়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবেন না, যাতে করে আরববাসী জানতে পারে যে, আমরা তাঁকে এ বছর ফেরত দিয়েছি। তবে আগামী বছর তিনি মক্কায় আসবেন, তিনদিন অবস্থান করবেন, এরপর কোরবাণী করে চলে যাবেন। কোরায়েশরা এক্ষেত্রে সকলেই একমত হলো এবং সুহাইল এবনে আমরকে এ সন্ধির কাজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সুহাইল হোদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোরায়েশরা এখন সন্ধি চায়, কেননা তারা সুহাইলকে প্রেরণ করেছে। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর পেছনে ওব্বাদ এবনে বশর এবং সালমা ও আসলাম দন্ডায়মান ছিলেন। প্রথম দু'জন লৌহ নির্মিত পোশাকে আবৃত ছিলেন। এমন সময় সুহাইল হাজির হল এবং বসল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বার্তা শুরু হল এবং সুদীর্ঘ আলোচনা হল। কখনো আওয়াজ উঁচু হত কখনো নীচু। ওব্বাদ এবনে বশর বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নিম্নস্বরে কথা বল।

যাহোক, অবশেষে সন্ধির সিদ্ধান্ত হল। সুহাইল বললো, সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হোক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে তলব করলেন, বুখারী শরীফে হযরত বরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, "লিখ, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম"।

সুহাইল বললা, রাহমানুর রাহীম কে আমি জানি না (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। মুসলমানগণ তার প্রতিবাদ করে বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা তা লিখব না"। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে বিইসমিকা আল্লাহুম্মা লিখ"। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, "লিখ, এ চুক্তি হল তা, যার সিদ্ধান্ত করেছেন মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম", তখন সুহাইল বলল যে, যদি আমরা একথা বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল,

তবে আপনাকে কাবা গমনে বাঁধা দিতাম না আর আপনার সংগে যুদ্ধও করতাম না। এ স্থলে মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ লিখ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি তুলে দাও। হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, এ শব্দটি আমি উঠাতে পারব না।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, উসাইদ এবনে হুযাইর এবং সাদ এবনে ওবাদা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে রাখলেন এবং বললেন, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কিছু লিখবেন না। অন্যথায় আমাদের এবং মুশরেকদের মধ্যে তরবারিই সিদ্ধান্ত করবে, তখন স্বর উঁচু হতে লাগল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "রসূলুল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও", হযরত আলী (রাঃ) দেখিয়ে দিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে এরপর রসূলুল্লাহ শব্দটি তুলে দিলেন এবং এরশাদ করলেন, "মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ লেখ"। তখন লিপিবদ্ধ হলো, এ সন্ধিপত্রে মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ এবং সুহাইল এবনে আমর ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।

আর দশ বছর পর্যন্ত শান্তিতে অবস্থানের এবং যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, লোকেরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে এবং একে অন্যের প্রতি হামলা করা থেকে বিরত থাকবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুহাইলকে বলেন, "এ সন্ধি এ শর্তে হচ্ছে যে, তোমরা আমাদের এবং কাবা শরীফের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াবেনা; আমরা তওয়াফ করবো"। সুহাইল বললো, 'না', এ বছর আপনারা তওয়াফ করতে পারবেন না, আগামী বছর তওয়াফ করা আপনাদের ইচ্ছাধীন থাকবে। সুহাইল আরো একটি শর্ত যোগ করেঃ অনুমতি ব্যতীত আমাদের কোন লোক যদি আপনাদের নিকট যায়, যদি সে মুসলমান হয়েও থাকে তবু তাকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করতে হবে। মুসলমানগণ বলেন, "সোবহানাল্লাহ! এ শর্ত কিভাবে লিপিবদ্ধ হবে! মুশরেকদের নিকট তাঁকে কিভাবে আমরা ফেরত পাঠাবো? সে-তো মুসলমান হয়ে আসবে"। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে মুশরেকদের নিকট চলে যাবে, (মনে করতে হবে) আল্লাহ পাক তাকে দূর করে দিয়েছেন, সে-তো মুসলমানই ছিল না, চলে গেছে ভালই হয়েছে। আর তাদের মধ্য থেকে যে চলে আসবে, আমরা তাকে ফেরত দেব। আল্লাহ পাক তার জন্যে কোন ব্যবস্থা করবেনই"।

হযরত বরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনটি শর্তে সন্ধি করেছিলেন,

(১) মুশরেকদের যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট চলে আসবে, তাকে মুশরেকদের নিকট প্রত্যর্পণ করতে হবে।

(২) মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি মুশরেকদের নিকট চলে যায়, তবে মুশরেকরা তাকে প্রত্যর্পণ করবেনা।

(৩) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগামী বছর মক্কায় আসবেন, তিনদিন অবস্থান করবেন, আর মক্কায় প্রবেশের সময় তরবারি বা অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র খাপে ভরা থাকবে। উভয়ের মধ্যে এভাবে সন্ধি হয়ে গেল, আর এ-ও স্থির হলো যে এ সন্ধির স্মারকটি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে, কোন প্রকার অপহরণ বা খেয়ানত করা হবেনা, আর একথাও স্থির হয়, আরবের প্রত্যেক গোত্রের স্বাধীনতা থাকবে, দু'পক্ষের যে কোন একটির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার, অর্থাৎ যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতে চায়, তার সে স্বাধীনতা থাকবে, আর যে কোরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তারও সে সুযোগ থাকবে। একথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বণী খাজাআ গোত্রের লোকেরা হাজির হলো এবং বললো, আমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকবো, আর বণী বকর গোত্রের লোকেরা বললো, আমরা কোরায়েশের সঙ্গে থাকবো। সন্ধি সম্পর্কীয় আলোচনা সম্পূর্ণ হয়েছে, লিপিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কোন কিছু বাকী নেই, ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুতবেগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আল্লাহর নবী নন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেন নয়?

হযরত ওমরঃ আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে এবং কাফেরদের নিহত ব্যক্তিরা কি দোজখে যাবেনা?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামঃ কেন নয়?

হযরত ওমরঃ তাহলে আমাদের দ্বীনের এ অবমাননা কেন? এখনও আল্লাহ পাক আমাদের এবং তাদের মধ্যে ফয়সালা করেননি (অর্থাৎ উভয় পক্ষে লড়াই হয়নি) আর এ অবস্থায় আমরা ফেরত চলে যাব?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামঃ আমি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল, আমি

আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ কিছুই করতে পারিনা, আল্লাহ পাক আমাকে ধ্বংস করবেন না, তিনিই আমার সাহায্যকারী।

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা কাবা পর্যন্ত পৌঁছবো এবং তওয়াফ করবো?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামঃ কেন নয়? কিন্তু আমি কি তোমাদেরকে একথা বলেছিলাম যে এবারেই আমরা বয়তুল্লায় যাব।

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ না; একথা বলেননি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামঃ তোমরা অবশ্যই বয়তুল্লাহ শরীফ যাবে এবং তার তওয়াফ করবে।

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট হাজির হন এবং তাঁকে অনুরূপ প্রশ্ন করলে তিনিও হুবহু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ন্যায়ই জবাব দেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন বললেন, এটি বড় অবমাননাকর, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে ব্যক্তি তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, স্বীয় প্রতিপালকের মর্জির খেলাফ তিনি কিছু করেন না, আল্লাহ পাকই তাঁর সাহায্যকারী, মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দামান ধরে থাক। নিঃসন্দেহে তিনি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমিও স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

হযরত ওমর (রাঃ) একথাও বললেন, তিনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা বয়তুল্লায় যাব এবং তওয়াফ করবো। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, কেন নয়, অবশ্যই। কিন্তু তিনি কি তোমাকে একথাও বলেছিলেন যে,-এ বছরই তোমরা বয়তুল্লায় যাবে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ, তোমরা কা'বা শরীফ যাবে এবং তওয়াফ করবে।

মূলতঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল, হযরত ওমর (রাঃ) নিজেও বলেছেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে ঐদিন ব্যতীত কোন দিন কোন ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ হয়নি। হযরত ওমর (রাঃ) যখন ঐসব কথা বলছিলেন, তখন হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তুমি "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান" পাঠ কর,

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তা পাঠ করলাম। এবনে এসহাক এবং এবনে আমর আসলামীর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, সেদিন আমার দ্বারা যে অনুচিত কাজটি হয়েছে, তার ক্ষমার জন্যে কাফফারা স্বরূপ আমি দান খয়রাত করতে থাকি, রোজা রাখতে থাকি এবং গোলাম আজাদ করতে থাকি।

হামলাকারীরা অন্ধ ও বধির হলো

আহমদ, নেসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোগাফ্‌ফাল (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ ত্রিশজন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত যুবক পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে আমাদের উপর হামলা করলো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি বদদোয়া করলেন, আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বধির করে দিলেন, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধও করে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্তি দিলেন, আর এ সম্পর্কেই وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ (তিনিই সে আল্লাহ পাক, যিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন) আয়াতখানি নাজিল হয়েছে (সূরা ফাত্‌হঃ আয়াত-২৪)।

ইমাম আহমদ, মুসলিম এবং এবনে আবি শায়বা হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার আশিজন সশস্ত্র ব্যক্তি "তানয়ীম" পর্বতের দিক থেকে বের হয়ে আসে এবং হঠাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হামলার অপচেষ্টা করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি বদদোয়া করলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধ এবং বধির করে দিলেন, তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং মুক্তি দিলেন।

হযরত আবু জন্দলের (রাঃ) ঘটনা

এরই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল, যে সুহাইল এবনে আমর এ ঐতিহাসিক সন্ধির ব্যাপারে আলোচনায় মক্কার মুশরেকদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তারই পুত্র আবু জন্দল এবনে সুহাইল শৃংখলিত অবস্থায় বন্দী–দশা থেকে বের হয়ে এসে হাজির হলো এবং মুসলমানদের সম্মুখে পড়ে গেল। তাঁর পিতা সুহাইল তাঁকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল, বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের কারণে মুসলমানগণ তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন, এই সময় সুহাইল উঠে তাঁর নিকট গিয়ে একটি কাঁটাযুক্ত লাঠি দ্বারা তাঁর

চেহারায় আঘাত করলো, এরপর বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটি প্রথম ঘটনা, যে ব্যাপারে আমি এবং আপনি সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে আপনাদের নিকট চলে আসবে তাকে আপনারা আমাদের নিকট প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এখনো তো সন্ধি-পত্র লিপিবদ্ধ হয়নি", সুহাইল বললো, "তাহলে আমরা কখনো আপনার সঙ্গে সন্ধি করবোনা"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ কররেনঃ "তাহলে তাকে আমার দায়িত্বে দিয়ে দাও", সে বললো, "আমি তাকে আপনার দায়িত্বে হস্তান্তর করবোনা"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "কেন তা করবেনা"? সে বললো, "আমি তাকে আপনার দায়িত্বে দেবনা"। তখন মকরজ ও হুয়াইতেব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললো, আমরা তাকে আপনার কারণে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। একথা বলে উভয়ে তাদের তাঁবুতে চলে গেল।

আবু জন্দল চিৎকার দিয়ে বললো, "হে মুসলমানগণ! আমাকে মুশরেকদের হাতে ফেরত দেয়া হচ্ছে, আমি তো মুসলমান হয়ে এসেছিলাম, আপনারা দেখুন, আমাকে কত নির্যাতন করা হচ্ছে"। ইসলাম গ্রহণের কারণে সুহাইল আবু জন্দলকে জঘন্য শাস্তি দিচ্ছিল, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে এরশাদ করলেন, "হে আবু জন্দল! সবর অবলম্বন কর, সওয়াবের আশা রাখ, আল্লাহ পাক তোমার জন্যে এবং যে সব দূর্বল মুসলমান তোমার সংগে রয়েছে, তাদের জন্যে অবশ্যই কোন পথ খুলে দেবেন। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি, আমরা তাদেরকে এবং তারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এজন্যে আমরা কিছু করতে পারছিনা"।

হযরত ওমর (রাঃ) ঐ অবস্থায় আবু জন্দলের নিকটে গেলেন এবং বললেন, "তুমি সবর কর, এরা মোশরেক, এদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান (অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করায় কোন গুণাহ নেই, এর জন্যে কোন জবাবদেহী করতে হবেনা)"। হযরত ওমর (রাঃ) একথাটি বলার সময় তরবারির হাতলটি আবু জন্দলের কাছে নিয়ে যান। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, আমার ধারণা ছিল, আবু জন্দল তরবারিটি নিয়ে তার পিতাকে হত্যা করবে।

যাহোক, অবশেষে আবু জন্দলকে তাঁর পিতার নিকটই যেতে হলো।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহলো, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি ওমরাহ করছেন, তাই মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সুদীর্ঘ ছ' বছর পর তাঁরা কা'বা

শরীফের তওয়াফ করতে পারবেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, মক্কা শরীফের নিকটে এসেও কা'বা শরীফে যাওয়া হলোনা এবং সম্পাদিত চুক্তির কারণে তাদেরকে এ বছর ফেরত যেতে হবে, তখন তা তাঁদের মনোকষ্টের কারণ হলো, তদুপরি আবু জন্দলের এ হৃদয় বিদায়ক ঘটনা মুসলমানদের মনের কষ্টকে অনেক বাড়িয়ে দিল।

যখন সন্ধি-পত্র লিপিবদ্ধ হলো, তখন কিছু মুসলমান এবং কিছু মুশরেক এ ঐতিহাসিক দলিলে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন। মুসলমানদের পক্ষে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে সুহাইল (রাঃ), হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত মাহমুদ এবনে সালমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)। আর মোশরেকদের পক্ষ থেকে মকরজ এবনে হাফস সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিল।

সন্ধি-পত্র লিপিবদ্ধ হবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ওঠ কোরবাণী কর এবং মাথা মুন্ডন কর, তিনবার তিনি এ আদেশ দিলেন, কিন্তু কেউ উঠলোনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন অত্যন্ত ব্যাথিত হলেন, এরপর তাঁবুর ভেতর গিয়ে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে বললেন, মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে গেল, আমি কোরবাণী করার এবং মাথা মুন্ডনের আদেশ দিয়েছি, কিন্তু তারা তা পালন করেনি। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মুসলমানগণ (বয়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছতে না পারায়) অত্যন্ত ব্যাথিত, কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি করার এবং বিজয় লাভ ব্যতীত প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে তাদের এ কষ্ট হয়েছে, এজন্যে মুসলমানগণকে মন্দ বলবেন না। হে আল্লাহর নবী! আপনি তশরিফ নিয়ে যান, কাউকে কিছু বলবেন না, কোরবাণী দিয়ে দিন এবং কাউকে ডাক দিয়ে নিজের মস্তক মুন্ডন করুন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলে উষ্ট্রের কোরবাণী করে দিলেন এবং এক ব্যক্তিকে ডেকে মাথা মুন্ডন করালেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন তাঁরাও নিজ নিজ কোরবাণী করলেন এবং একে অন্যের মাথা মুন্ডন করে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়ার দিন কিছু লোক মাথা মুন্ডন করেছে, কিছু লোক চুল ছেটেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত হোক, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আর যারা চুল ছেটেছে, তাদের প্রতিও? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, মাথা মুন্ডনকারীদের উপর আল্লাহ্ পাকের রহমত হোক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যারা চুল ছেটেছে তাদের প্রতিও? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যারা চুল ছেটেছে তাদের প্রতিও। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তখন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মাথা মুন্ডনকারীদের জন্যে আপনি দু'বার দোয়া করলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এজন্যে যে তারা কোন সন্দেহে পড়েনি (অর্থাৎ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, এহরামের অবস্থা শেষ হয়েছে, আর সন্মুখে যেতে হবেনা)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ফরমানের উদ্দেশ্য হলো, কিছু লোকের ধারণা ছিল যে, হয়তো তারা বয়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করার কোন সুযোগ পাবে, সেজন্যে তারা মাথা মুন্ডন থেকে বিরত ছিল, সামান্য চুল ছেটেছে।

মোহাম্মদ এবনে আমর বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়াতে উনিশ কিংবা বিশ রাত অবস্থান করেন।

খাদ্য-দ্রব্যে বরকত

হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বায়হাকীতে সংকলিত হয়েছে। হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে "মাররুজ জাহ্রান" নামক স্থানে এবং পরে "আসফান" নামক স্থানে অবস্থান করেন। আসফানে কিছু লোক এসে বললো, আমাদের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই, আমরা কি গাধাগুলোকে জবেহ করবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! লোকদের নিকট সওয়ারী থাকা অধিক সমীচিন, যদি কাল দুশমনদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়, তবে আমাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে এবং পদব্রজেও চলতে হবে। এজন্যে আমার আরজ হল, সাহাবাগণের নিকট সামান্য যা কিছু খাবার আছে, তা একত্রিত করার আদেশ দান করুন এবং তাতে বরকতের দোয়া করে দিন, আশা করি আল্লাহ পাক আপনার দোয়ার বরকতে আমাদেরকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন। এ পরামর্শ মোতাবেক যার কাছে যা খাদ্য দ্রব্য ছিল,

একটি চামড়ার দস্তরখানে একত্রিত করা হলো, সব চেয়ে বেশী যিনি আনলেন, তিনি প্রায় চার সের খেজুর নিয়ে এসেছিলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হয়ে দোয়া করলেন, ফলে সকলে পেট ভরে আহার করলেন এবং নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করলেন, কিন্তু তা সত্বেও বিতরণের পূর্বে যতখানি খাবার ছিল, পরেও ততখানিই ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন, এরপর এরশাদ করলেনঃ আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যে ব্যক্তি এ দু'টি কথার প্রতি তথা তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি ঈমান আনবে, সে দোজখের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বোখারী (রঃ), আবু দাউদ (রঃ), নেসায়ী (রঃ) হযরত মুসাওয়্যার এবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আবু বসীর ওৎবা এবনে আসাদ সাকাফী মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন। আহবাস এবনে শরীফ সাকাফী এবং আজহার এবনে আবদ আওফ জোহরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট (বাহক মারফত) একটি পত্র প্রেরণ করলো, ঐ পত্রে হোদায়বিয়ার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবেদন করলো যে আবু বসীরকে প্রত্যর্পণ করা হোক। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু বসীরকে আদেশ দিলেন, তুমি পত্র বাহকের সঙ্গে ফিরে চলে যাও, তুমি অবগত আছ যে, আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি, আমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বৈধ নয়, আল্লাহ পাক তোমার জন্যে এবং তোমার সাথী অন্য মুসলমানদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করবেন।

যাহোক, পত্রবাহকদ্বয় আবু বসীরকে নিয়ে "জুলহোলায়ফা" পৌঁছে গেল। আবু বসীর মসজিদে দু' রাকাআত নামাজ পড়লেন, এরপর যা কিছু খাবার ছিল তা খেতে লাগলেন এবং পত্র বাহক আমেরী এবং কাউসার দু'জনকেও খাবারে অংশ নিতে আহবান করলেন, তারা সকলে খেজুর খেতে লাগলেন। আমেরীর নিকট তরবারি ছিল। উভয়ে তারা আলাপ করছিল। আমেরী তার তরবারিটি খাপ থেকে বের করলো এবং বললো, আমি এ তরবারি দিয়ে একাধারে কয়েক দিন রাত আওস খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে মারব। আবু বসীর বললেন, তোমার তরবারিটি কি এমনি? আমেরী বললঃ হ্যাঁ। আবু বসীর বললেনঃ আমাকে একটু দেখাও তো! আমেরী আবু বসীরের হাতে তরবারিটি দিয়ে দিল, আবু বসীর তরবারি হাতের মুঠোয় নিয়ে

সজোরে আমেরীর প্রতি আঘাত হানলো এবং সে শেষ হয়ে গেল, কাওসার পলায়ন করে মদীনায় পৌঁছল এবং মসজিদে প্রবেশ করলো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কাওসার বললঃ আমার সাথী শেষ হয়ে গেছে। আমি পলায়ন করে এসেছি। বাহক কাওসার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আশ্রয়ের জন্যে ফরিয়াদ করলো এবং তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন। এদিকে আবু বসীর আমেরীর উটে আরোহন করে আসল এবং তরবারি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি তো আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, আল্লাহ পাক আপনার দ্বারা ঐ দায়িত্ব পালন করিয়েছেন আর আপনি আমাকে দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছেন, কিন্তু আমি দ্বীনের খাতিরে এই মুসিবত থেকে আত্মরক্ষা করেছি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "আফসোস! এ-তো যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত করবে, যদি কেউ তাকে মক্কা পৌঁছিয়ে দিত"। আবু বসীর আমেরীর নিকট যে সম্পদ তাকে হত্যা করার পর পেয়েছিল, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলো যেন তিনি তা থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি যদি এর এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করি তবে অপর পক্ষ মনে করবে আমি সন্ধির শর্ত মানিনি, (অতএব, তা আমি গ্রহণ করব না) এ সম্পর্কে তুমিই জান। আর তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি চলে যাও।

বর্ণিত আছে, আবু বসীর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনলেনঃ"তুমি যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জলিত করবে", তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফেরত পাঠাবেন। এজন্যে তিনি মক্কা থেকে আরও যে পাঁচ জন তাঁর সংগে মদীনা শরীফে এসেছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে চলে গেলেন এবং "আইস" এবং "জিল মারওয়া" নামক স্থানের মাঝামাঝি অবস্থান নিলেন। এটিই ছিল কোরায়েশ কাফেলাগুলোর গমনাগমনের পথ। এমনিভাবে মক্কায় যারা গোপনে ইসলাম কবুল করে বসেছিলেন তাঁরা যখন আবু বসীরের অবস্থানের কথা জানলেন, তখন তাঁরাও আবু বসীরের নিকট পৌঁছে গেলেন।

এদিকে আবু জন্দল এবনে সুহাইলকে হোদায়বিয়ায় কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া হয়। তিনিও কাফেরদের বন্দী দশা থেকে ছুটে আসেন, তাঁর সংগে আরও ৭০ জন মুসলমান আবু বসীরের সংগে একত্রিত হন। আবু বসীর তখন এ দলের নেতৃত্ব অর্পণ করেন আবু জন্দলের নিকট, কেননা আবু জন্দল ছিলেন কোরায়েশী, আবু

জন্দলের খবর শ্রবণ করে গিফার, আসলাম, জোহাইনীয়া সহ কয়েকটি গোত্রের কিছু লোক এসে আবু জন্দলের নিকট এসে একত্রিত হয়। এভাবে তাদের সংখ্যা তিনশতে এসে দাঁড়ায়।

বায়হাকী জুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোরায়েশের যে কাফেলাই এ পথ অতিক্রম করতো, তাদেরকে হত্যা করা হতো এবং অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হতো, তারা কোরায়েশের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। অবশেষে কোরায়েশরা আবু সুফিয়ানকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলো এবং তার মাধ্যমে এ আবেদন পেশ করলা যে, আবু বসীর এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে আপনার কাছে ডেকে নিন, ভবিষ্যতে কোন লোক যদি আপনার নিকটে যায় তবে আপনি তাকে স্বীয় দায়িত্বে নিয়ে নেবেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু বসীর এবং আবু জন্দলকে পত্র দিলেন যে, তোমরা উভয়ে আমার নিকট চলে আস, অন্যান্য যেসব মুসলমানগণ তোমাদের নিকট এসেছে, তাদেরকে আদেশ কর, যেন তারা নিজ নিজ বস্তিতে ফিরে যায়। এরপর যদি কোন কোরায়েশী বা কাফেলা ঐ পথ অতিক্রম করে, তবে তাদের প্রতি যেন হামলা না করা হয়।

আবু বসীরের নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ মোবারক লিপি এমন সময় পৌছে, যখন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘণিয়ে এসেছে। ঐ পবিত্র পত্রটি তাঁর হাতে ছিল, তিনি তা পাঠ করছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁর এন্তেকাল হয়। আবু জন্দল তাঁকে সেখানেই দাফন করেন এবং তাঁর কবরের পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর আবু জন্দল তাঁর কয়েকজন সাথী নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন, আর অবশিষ্ট লোকেরা স্ব-স্ব আবাস স্থলে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লাহর রসূল (দঃ)-এর অনুকরণেই রয়েছে কল্যাণ

হোদায়বিয়ার সন্ধির বিষয়টি যখন সমাপ্ত প্রায়, তখন আবু জন্দল বন্দী দশা থেকে পলায়ন করে মুসলমানগণের নিকট হাজির হয়েছিলেন। তখন কিছু লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আরজী পেশ করেছিলেন যে, আবু জন্দলকে তাঁর পিতার নিকট যেন সোপর্দ না করা হয়, কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে প্রতর্পণ করেছিলেন। আর এখন যখন কোরায়েশের আবেদন অনুযায়ী আবু জন্দল সমুদ্র তীরবর্তী স্থান থেকে মদীনায়ে

মোনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন যারা তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আরজী পেশ করেন, তারা এ সত্যও উপলব্ধি করেন যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। যখন এ ঘটনা ঘটে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এটিই, আর যখন মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের চাবিটি হাতে নিলেন, তখন তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন, এটি তাই, যা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এমনিভাবে, বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক দিনেও আরাফাতে অবস্থান কালে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, এটি সে সাফল্য, যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে হোদায়বিয়ার চেয়ে বড় কোন বিজয় হয়নি।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের সঙ্গে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গভীর এবং ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে, তা অনুধাবন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, বন্দা অতি সত্বর চায়, কিন্তু আল্লাহ পাক কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো করেন না, যখন সব কিছু আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক হয়ে যায়, তখন তিনি তাঁর যা ইচ্ছা তা করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বিদায় হজ্বের দিনে কোরবাণীর নির্দিষ্ট স্থানে সুহাইল এবনে আমরকে দেখেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোরবাণীর উষ্ট্র তাঁর নিকট নিয়ে আসছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর উষ্ট্র জবেহ করছিলেন, এরপর তিনি হাজ্জামকে ডেকে মাথা মুন্ডন করেছিলেন, আমি তখন সুহাইল এবনে আমরকে দেখেছি, তাঁর কেশ মোবারক তুলে তুলে তাঁর চোখের উপর রাখছিলেন, অথচ হোদায়বিয়ার সন্ধির দিন তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এজন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন।

فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ
اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٠

অতএব, যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করবে, সে তা নিজের অকল্যাণেই ভঙ্গ করবে, পক্ষান্তরে যে কেউ আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবে, আল্লাহ পাক তাকে

মহান পুরস্কার দান করবেন।

অর্থাৎ বয়আতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, যদি কেউ এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তার ভয়াবহ পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে, আর যে আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, অর্থাৎ বয়আতের উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে মহা পুরস্কার দানে ধন্য করবেন, অর্থাৎ তাঁকে জান্নাত দান করবেন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও দীদার নসীব করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ মহা পুরস্কার হলো জান্নাত, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সবার উপরে তাঁর দীদার।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

'(হে রসূল!) যে সব আরব গ্রামবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই'।

আরবের যে সব গোত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবান পাওয়া সত্বেও তাঁর সঙ্গে হোদায়বিয়ার সফরে যায়নি, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে তারা এখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেদের ওজর-আপত্তি পেশ করবে যে, আর্থিক কাজে ব্যস্ততা এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকার কারণেই আমরা ওমরার এ সফরে শরীক হতে পারিনি।

মূলতঃ যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফর-সঙ্গী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে দূর্বলচিত্ত বেদুঈন ব্যক্তিরা ভয়ে এ সফর থেকে বিরতও থাকে। তাদের ধারণা ছিল, এই সফরে যুদ্ধ হবে, আর এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য, তাদের এমন ধারণার কারণেই তারা এ সফরে অংশ নেয়নি, এখন যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিরাপদে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তারা কী কী ওজর-আপত্তি তুলে ধরবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমকে পূর্বেই এ আয়াতের মাধ্যমে অবহিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনা শরীফ পৌঁছার পূর্বে পথে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সব বেদুঈন গোত্রের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো গিফার, মোজাইনা, জুহাইনা এবং আসলাম নামক গোত্র সমূহ।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর মোজেযা

মূলতঃ এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা যে, আল্লাহ পাক পূর্বেই বেদুঈনদের মনের কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আপনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তারা নিজেদের যে সব ওজর-আপত্তি পেশ করবে, তা হলো এইঃ আমাদের মন আপনার সঙ্গে সফর করতে ব্যাকুল ছিল, কিন্তু কী করবো, সাংসারিক ব্যস্ততার দরুণ একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে আমরা সফরে যেতে পরিনি, আমরা আমাদের এ ভুল স্বীকার করি, দয়া করে আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ পাক পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে তারা এসব কথা বলবে, তবে তারা মুখে যা বলবে, তা তাদের অন্তরে নেই, কাজেই তাদের ওজর-আপত্তি যেমন বানোয়াট, তেমনি ক্ষমা প্রার্থনাও অসত্য। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন, বা না করুন, তাদের অন্তরে এর কোন গুরুত্বই নেই।

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক যদি তোমাদের অনিষ্ট বা উপকার করতে চান, তবে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে এমন শক্তি কার আছে? বস্তুতঃ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত আছেন'।

যেহেতু কাফেররা বলেছে যে, আমরা নিজেদের ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবার পরিজনের হেফাজতের লক্ষ্যে আমরা বাড়ীতেই রয়ে গেছি, এ সফরে যেতে পারিনি, এর জবাবেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল! আপনি বলুন, যদি তোমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহ পাক তোমাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে দিতে চান, তোমাদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ আছে কি, যে তাঁকে বিরত রাখতে পারে

এবং তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? পক্ষান্তরে, যদি তোমাদের অবর্তমানেও আল্লাহ্ পাক তোমাদের কল্যাণ সাধন করতে চান, তবে তা থেকে কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে?

আল্লাহ পাকের কাজে বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি কারোই নেই, সবই তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার, হোদায়বিয়ার এ সফরে তোমাদের যোগদান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ছিলনা, কেননা আল্লাহ্ পাকের প্রতি তোমাদের ঈমান সুদৃঢ় ছিলনা, তোমরা মক্কার কাফেরদের ভয়ে এ সফরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শরীক হওনি। তোমরা মনে করেছ, মুসলমানগণ দূর্বল, কাফেররা শক্তিশালী, তাদের মোকাবেলায় মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এজন্যেই হেদায়বিয়ার সফরে যেতে তোমরা সম্মত হওনি। এক্ষণে যে ওজর–আপত্তিই পেশ কর-না কেন, তা আল্লাহ্পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সন্দেহ ছিল, আর তোমরা যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

বরং আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তাঁর নিকট তোমাদের কোন ভাওতা, কোন বানোয়াট ওজর–আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তোমরা যে শুধু মক্কার কাফেরদের ভয়ে নিজেদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফর–সঙ্গী হওনি তাই নয়; বরং তোমরা একথাও ভেবেছিলে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মোমেনগণ মক্কার কাফেরদের হাতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কোন দিন আর তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরে যেতে পারবেন না, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ
زُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ

'বরং তোমরা মনে করেছিলে, রসূল এবং মোমেনগণ কখনো তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেনা, আর তা তোমাদের মনে ভালও লেগেছিল। আর তোমরা নানা প্রকার মন্দ ধারণাও করছিলে'।

কোরায়েশদের হাতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য বলে তোমরা ধারণা করেছিলে

তাদের এ অবস্থা তোমাদের কাছে ভালও লেগেছিল। তোমরা মনে করেছিলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ কেউই অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেনা। মুসলমানদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত মন্দ। এ সফরেই মুসলমানগণ নিপাত যাবে, ইসলামের নাম মুছে যাবে, এ ছিল তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা, প্রকৃত অবস্থা হলো এই,

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

তোমরাই ছিলে নিপাত যাওয়ার যোগ্য, তোমরাই ছিলে এক ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়, কেননা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের ধ্বংস ছিল তোমাদের নিকট অতীব পছন্দনীয়।

আর এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপই আল্লাহ পাকের দরবারে তোমরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছ।

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ

"আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে".

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা ধারণা করেছিলে যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাফল্যমন্ডিত করার যে ওয়াদা করেছেন, তা তিনি পূর্ণ করবেন না।

অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিজয় প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেছিলেন, তা সত্য নয়, আর তোমাদের এ মন্দ ধারণার কারণেই ধ্বংস হয়েছে অনিবার্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫১৫-৪০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা ৭৯-৮৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা ৪৭-৫২
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৯

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾
سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا
ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ
تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ
بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

তরজমা

(১৩) যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি সে সব কাফেরদের জন্যে দোজখের জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(১৪) আসমান এবং জমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আজাব দেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াবান।

(১৫) তোমরা যখন গণীমতের মাল (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিতে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, "আমরাও তোমাদের সঙ্গে চলি"? তারা আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা, আল্লাহ পাক পূর্বেই একথা বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে, বস্তুতঃ তোমরাই আমাদেরকে হিংসা করছো, প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা সামান্য ব্যতীত কিছুই বোঝেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আরবের কোন কোন বেদুঈন গোত্রকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওমরার সফরে তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্যে

আহবান করেন, কিন্তু তারা শুধু যে তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি তাই নয়; বরং তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদের শাস্তি ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, আর ঈমান না আনার প্রমাণ হলো, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করেছে তথা আল্লাহর রসূলের সত্যতায় বিশ্বাস করেনি এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য যে যথাসময়ে আসবে, একথায়ও আস্থা স্থাপন করেনি, এমন কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে আর তা হলো দোজখের অগ্নি।

এ আয়াতের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক যেন এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ (فهو من الكافرين) فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, তারা কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত, আর কাফেরদের জন্যে আমি জ্বলন্ত অগ্নি তৈরী করে রেখেছি।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না আনবে, প্রকৃত এবং খাঁটি ঈমান অর্জন না করবে এবং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল না করবে, তাদেরকে দোজখের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, যদিও তারা প্রকাশ্যে মুসলমান বলে দাবী করে, আল্লাহ পাক অর্ন্তযামী, তিনি মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। আর এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারাই প্রকৃত ঈমান এবং একীন লাভে ব্যর্থ হবে, তারা কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে, আর কাফেরদের শাস্তি হলো দোজখের অগ্নি, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেউ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, ঈমান আকীদায় দুর্বল থাকলেও এবং

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৮৯.

পাপাচারে লিপ্ত হলেও প্রকাশ্যে অনেক লোকই ঈমানের দাবীদার হয় এবং কখনো কখনো আল্লাহ পাকের এবাদতেও মশগুল হয়, মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়, তাদেরকে হয়তো আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন, এমন ভ্রান্ত ধারণার নিরসন–কল্পেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾

আর আসমান জমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা বা মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের মালিকানায় যেমন কেউ তাঁর সঙ্গে শরীক নেই, ঠিক তেমনিভাবে কাকে ক্ষমা করা হবে এবং কাকে আজাব দেয়া হবে, এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, এতে কারো কোন কথা চলবেনা। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন, কেউ এতে বাধা দিতে পারবেনা বা নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারবেনা, এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় এবং হবে, তবে একথা সত্য যে, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। তাঁর দয়া-মায়া পরিপূর্ণ, ব্যাপক, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ
الْاَلِيْمُ

(হে রসূল!) আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর একথাও জানিয়ে দিন যে, আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহ পাকই, তিনি যদি কাউকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন, তবে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা, আর তিনি যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তবে কেউ তাঁকে বিরত রাখতে পারেনা। তবে একথা চিরসত্য যে, তাঁর ক্রোধের উপর রহমতেরই প্রাধান্য, অতএব তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের আশা করা এবং তাঁর আজাবকে ভয় করে তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا
ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ

"তোমরা যখন গণীমতের মাল (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিতে যাবে, তখন যারা ওমরার সফরে যায়নি, তারা বলবে, "আমরাও তোমাদের সঙ্গে চলি"? তারা আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করতে চায়"।

মোনাফেকদের শাস্তির ঘোষণা

যারা মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত ভেবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে ওমরার সফরে শরীক হয়নি, তাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে।

হোদায়বিয়ার ঘটনার কিছুদিন পরই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর অভিযান করেন। তদানীন্তনকালে খায়বর ছিল ইহুদী ধনকুবেরদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত আহযাব যুদ্ধে খায়বরের ইহুদীরা কাফেরদেরকে উস্কানি দিয়েছিল, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযান করেন। যেহেতু খায়বরের যুদ্ধে গণীমতের মাল বা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ অর্জনের সম্ভাবনা ছিল, তাই যে সব গোত্রের কাপুরুষ ব্যক্তিরা হোদায়বিয়ায় যায়নি, তারা খায়বরের অভিযানে অংশ নেয়ার জন্যে হাজির হয়, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে পূর্বেই এ শাস্তি ঘোষণা করেছেন যে, যারা হোদায়বিয়ায় যায়নি, তারা খায়বরে যেতে পারবেনা। খায়বর অভিযানে শুধু সে সব মুসলমানই শরীক হতে পারবে, যারা হোদায়বিয়ায় গিয়েছিল।

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা, আল্লাহ পাক পূর্বেই একথা বলে দিয়েছেন'।

فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ⑮

'আর তারা বলবে, বস্তুতঃ তোমরাই আমাদেরকে হিংসা করছো প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা সামান্য ব্যতীত কিছুই বোঝেনা'।

হোদায়বিয়ার সফরে যারা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে যায়নি, তারা নিজেদের ঈমানের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে, কাজেই তাদেরকে খায়বর অভিযানে শরীক হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি, আর একথা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন, কেননা যারা হোদায়বিয়ার সফরে যায়নি, তাদের খায়বর অভিযানে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্য অর্থ-সম্পদ রোজগার করা, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ হাতিয়ে নেয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, আল্লাহ পাক তাদের মনের

অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর এজন্যেই তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত আদেশ দিয়েছেন। এবনে জায়েদ এবং কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপাত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যারা হোদায়বিয়ায় যায়নি, তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মক্কার মুশরেকদের উপর বিজয় দান করেছেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার কাফেররা সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে, এভাবে মুসলমানগণ মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছে, আরবের অন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একটা সুযোগ হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের ধারা এখন অব্যাহত থাকবে। তারা এ সত্যও উপলব্ধি করেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন অথচ খায়বরবাসী মক্কাবাসীর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে ছিল, দশ হাজার বীর যোদ্ধা তখন তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর অভিযানের সংকল্প করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি মুসলমানগণ এতই শক্তিশালী হন, তবে মক্কায় প্রবেশ না করে হোদায়বিয়া থেকে কেন প্রত্যাবর্তন করলেন? এর একাধিক কারণ রয়েছে।

(১) মক্কায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ শুধু ওমরার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলেন, যুদ্ধের জন্যে নয়।

(২) আল্লাহ পাক যেভাবে মক্কাবাসীর প্রতি দয়া করে হস্তীবাহিনীকে মক্কায় প্রবেশে বিরত রেখেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মুসলমানদেরকেও ঐ সময় মক্কায় প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছেন, কেননা আল্লাহ পাক জানতেন যে, একদিন মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে বহু লোক ইসলামের খেদমতে বিশেষ অবদান রাখবে।

(৩) যদি তখন মুসলমানগণ শক্তি প্রয়োগ করে মক্কায় প্রবেশ করতো এবং তখন মক্কায় যেসব মুসলমান গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তারা পরিস্থিতির শিকার হতেন। তাদেরকে রক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে হোদায়বিয়া থেকেই ফেরত দিয়েছেন।

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমারা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা"।

একথাটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা স্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কেননা বেদুঈন গোত্র গুলো অর্থ-সম্পদের লোভে মোমেনদের সঙ্গে খায়বর অভিযানে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের ইচ্ছা প্রকাশের পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, খায়বরের অভিযানে শুধু তারাই শরীক হবে, যারা হোদায়বিয়ার সফরে ছিল, আর হোদায়বিয়ার সফরে বিরত কাপুরুষ বেদুঈনরা খায়বরের অভিযানে যাবেনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে একথা শ্রবণ করে তারা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করে বলবে,

بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا

অর্থাৎ আমরা খায়বরের যুদ্ধে যেতে পারবোনা, এটি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা নয়; মূলতঃ তোমাদেরই ইচ্ছা নেই যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে জেহাদে শরীক হই; তোমরা হিংসার কারণেই আমাদেরকে জেহাদে যেতে বারণ করছো, তোমরা চাওনা, আমরা খায়বরের যুদ্ধ–লব্ধ সম্পদের কোন অংশ পাই।

بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

"প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা সামান্য ব্যতীত কিছুই বোঝেনা"।

অর্থাৎ তারা প্রকৃত সত্য কী তা অনুধাবনে অক্ষম। প্রকৃত সত্য হলো, মুসলমানদের জেহাদের উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, অর্থ-সম্পদ নয়, মুসলমান কখনো অর্থ-সম্পদের লালসায় জেহাদ করেনা; করতে পারেনা। এই বেদুঈনরা এ মহা সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ কোন নবীর পক্ষে কারো প্রতি হিংসা বশতঃ কোন আচরণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অকল্পনীয়, এ মহা সত্যও এ বেদুঈনরা বুঝতে সক্ষম নয়।

اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ তাদের সামান্য বুঝ-বুদ্ধি রয়েছে, আর তা হলো জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নতি কিভাবে হবে, এসব বিষয়ে তারা কিঞ্চিৎ বোঝে, কিন্তু দ্বীন ইসলাম এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সীমিত নয়, ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক কল্যাণেরই শিক্ষা রয়েছে ইসলামে যা উপলব্ধি করতে তারা হয়েছে ব্যর্থ।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ
شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا
حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾
لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

তরজমা

(১৬) (হে রসূল!) যে সব আরব বেদুঈন পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে বলে দিন, তোমাদেরকে অচিরেইএক দুর্ধর্ষ শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহবান করা হবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে অথবা তারা অনুগত হবে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা পূর্বের ন্যায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

(১৭) অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির (জেহাদে শরীক না হওয়ার কারণে) কোন গুনাহ নেই, আর যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ দান করবেন, যার নিম্ন-দেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত থাকবে, কিন্তু যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, আল্লাহ পাক তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যে সব বেদুঈন গোত্র হোদায়বিয়ায় শরীক হয়নি, তারা খায়বর অভিযানে অংশ নিতে পারবেনা। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি বেদুঈনদের বলে দিন, খায়বরের যুদ্ধে তোমরা না-ই গেলে, অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং দুর্ধর্ষ জাতির বিরুদ্ধে অভিযান হবে, আর তাতে অংশ গ্রহণের জন্যে তোমাদেরকে আহবান করা হবে, তাদের বিরুদ্ধে

তোমাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্য প্রকাশ করে। হয় তারা মুসলমান হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধ চলমান থাকবে। যদি তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন কর তথা ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু হোদায়বিয়ার সফরের ন্যায় তোমরা যদি পেছনে পড়ে থাক, এ জেহাদ থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদেরকে তিনি কঠিন কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

আলোচ্য আয়াতে দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ জাতি বলে যাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারা কোন্‌ জাতি? তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত কাব (রাঃ) বলেছেন, এ জাতি হলো রোমানরা, অর্থাৎ তাবুকের অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হবে।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে যে জাতির কথা বলা হয়েছে তারা হলো হাওয়াজেন, সাকীফ এবং গাত্‌ফান গোত্র, মক্কা বিজয়ের পরই হোনায়েনের যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে উল্লিখিত গোত্র সমূহ মোকাবেলা করে। অবশ্য কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ যুদ্ধে মক্কা বিজয়ী দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম এবং মক্কা বিজয়ের দিনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এমন দু'হাজার নও-মুসলিম শরীক হয়েছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরবের কোন বেদুঈন গোত্রকে এ যুদ্ধে শরীক হতে আহবান করেননি।

এ আয়াত দ্বারা যাদের মতে, রোমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে দুর্ধর্ষ জাতির কথা বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না অপর পক্ষ আনুগত্য প্রকাশ করে। রোমানদের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযান হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এ অভিযান করেছেন, কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ হয়নি এবং কোন জাতি ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ দিন যাবত তাবুকে অবস্থান করেন, কিন্তু রোমানরা মোকাবেলায় আসেনি।

ইমাম জুহরী (রঃ) এবং তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে জাতির কথা বলা হয়েছে, তারা হলো বনু হানীফা গোত্র, এরাই

মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা এদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করে। বর্ণিত আছে, এ যুদ্ধে সাতশত হাফেজ সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন।

হযরত রাফে এবনে খোদায়েজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা আলোচ্য আয়াত পাঠ করতাম, কিন্তু জানতামনা যে, এ আয়াতে কোন্ জাতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সৈন্যবাহিনী তথা বনু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে আহবান করলেন, তখন আমরা উপলব্ধি করলাম, এ আয়াতে যে জাতির কথা বলা হয়েছে, তারা হলো বনু হানীফা গোত্র। অধিকাংশ তফসীরকার এ মতই পোষণ করেন। ইমাম বয়জাভী (রঃ)ও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, হয় তোমরা সে পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা আনুগত্য প্রকাশ করে, অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ থাকবেনা, অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে জিযিয়া বা অমুসলিম কর গ্রহণ করা হবেনা।

এ বিশেষ আদেশ আরবের মোশরেকদের জন্যে অথবা মুরতাদদের জন্যে ছিল। রোমান, পারসিক বা অন্যান্যদের জন্যে তিনটি পথ খোলা ছিল, যুদ্ধ, অথবা ইসলাম গ্রহণ করা অথবা জিযিয়া প্রদান করা।

এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত যে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এ আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, কেননা তিনিই মুরতাদদের বিরুদ্ধে জেহাদের আহবান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), আতা (রঃ), এবনে জোরায়েয (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে যে জাতির কথা বলা হয়েছে তারা হলো পারশ্য জাতি। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এবনুল মুনজের (রঃ) এবনে জোরায়েয (রঃ) এর সূত্রে এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেনঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর এবনুল খাত্যাব (রাঃ) পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বেদুইন গোত্র জোহাইনাহ এবং মোজাইনাহকে আহ্বান করেছিলেন। এ গোত্রগুলোকে ইতিপূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৪৪-৪৫

আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়ার অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

আর একরামা (রঃ) এবনে যুবাইর (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো হাওয়াজেন গোত্র, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোনায়েনে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

সায়ীদ এবনে মানসুর, এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো পারস্যবাসী এবং রোমানরা। তাদের বিরুদ্ধেই মুসলমানগণকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো কুর্দী।

আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে দুর্ধর্ষ জাতির কথা বলা হয়েছে, তারা হলো হাওয়াজেন গোত্র, যাদের বিরুদ্ধে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোনায়েনে যুদ্ধ করেছেন এবং বনু হানীফা অর্থাৎ ইয়ামামার সে দুর্ধর্ষ জাতি, যারা নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামার পক্ষে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এরও এ মতই বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যে দুর্ধর্ষ জাতির কথা বলা হয়েছে তা কোন্ জাতি? এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের যে কয়টি মত এ পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে তাহলো (১) হাওয়াজেন গোত্রকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, (২) সাকীফ গোত্র (৩) বনু হানীফ গোত্র (৪) পারশ্যবাসী (৫) রোমান (৬) মূর্তিপূজকদের দল (৭) কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা বিশেষ কোন জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং যারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে, সে সব যুদ্ধবাজদেরকেই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (৮) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর মতে, তারা হলো কুর্দী। (৯) হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মতে, তারা হলো তুর্কী।[১]

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর যে মত বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করে, তা হলোঃ ইয়ামামাবাসী বনু হানীফা গোত্র, কেননা আলোচ্য

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১০২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৮০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা -৫৩

আয়াতে سَتُدْعَوْنَ (অচিরেই তোমাদেরকে ডাকা হবে) বলা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বর্ণযুগের পরই তোমাদেরকে ডাকা হবে, আর তা হয়েছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে।[১]

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল্লামা মাজেদী (রঃ) লিখেছেনঃ

أَوْ يُسْلِمُوْنَ

(অথবা তারা অনুগত হবে)

এটি ইসলাম শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, কিন্তু এ স্থলে শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, তারা আত্মসমর্পণ করবে, এর তাৎপর্য হলো, তারা যে নিজেদের ধর্ম বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করবে, তা নয়; বরং তারা জিযিয়া বা অমুসলিম কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হবে।[২]

হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ হবে, তারা তোমাদের অনুগত হবে, এ আনুগত্য দু'ভাবে হতে পারে, (১) ইসলাম গ্রহণ করে (২) জিযিয়া আদায় করে, এভাবে অনুগত না হওয়া পর্যন্ত ঐ কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

যদি তোমরা নির্দেশ মেনে চল, তথা আল্লাহর রাহে শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ কর, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে (হোদায়বিয়ার অভিযানে) করেছিলে, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

অন্ধ খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির (জেহাদে শরীক না হওয়ার জন্যে) কোন গুণাহ নেই।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃঃ ৪৩৩

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫১৫-৪০

প্রতিবন্ধীদের উপর জেহাদ ফরজ নয়

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় এবং তাতে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়, তখন অন্ধ, খোঁড়া লোকেরা আরজ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের সম্পর্কে কি আদেশ? তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ...

অর্থাৎ যারা অন্ধত্বের কারণে বা পঙ্গু হওয়ার দরুণ জেহাদে যেতে অক্ষম হয়, এ ব্যাপারে তাদের কোন গুণাহ নেই। তাদের জন্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে।

এর পাশাপাশি যারা সাময়িকভাবে রুগ্ন হয়, তাদের রোগের কারণে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হলে তাদেরও গুণাহ হয়না, অবশ্য রোগ যেমন সাময়িক, এ অনুমতিও সাময়িক, অর্থাৎ যখন তারা আরোগ্য লাভ করে, তখন পুনরায় তাদের প্রতি জেহাদের দায়িত্ব বর্তায়।

তেবরাণী হযরত জায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে (পবিত্র কোরআনের আয়াত) লিখছিলাম, কলম আমার কানের মধ্যে রাখা ছিল, যখন জেহাদের আদেশ হলো, ঠিক তখন একজন অন্ধ ব্যক্তি হাজির হলো এবং আরজ করলো, আমি তো অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ? ঐ মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা জেহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষম হয়, তাদের প্রতি এ দায়িত্ব নেই।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদিও প্রতিবন্ধীদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু যদি তারা কোনভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮০-৮১

হযরত আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কাদেসিয়ার জেহাদ শরীক হয়েছিলেন. তিনি ছিলেন এ জেহাদে ইসলামের পতাকাবাহী।[১]

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ

"আর যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ দান করাবেন, যার নিম্ন-দেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত থাকবে"।

আলোচ্য আয়াতে জেহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে জেহাদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ একথাও বলেছেনঃ এতে শুধু জেহাদের কথাই বলা হয়নি, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের আহবান জানানো হয়েছে। যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, তাদের জন্যেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য সওয়াব ও শুভ-পরিণতির কারণ হয়, পক্ষান্তরে, অবাধ্যতা আজাব এবং ধ্বংসের উপকরণ হয়। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

কিন্তু যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূরের প্রাত আনুগত্য প্রকাশে পিছপা হবে, তাকে আল্লাহ পাক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১০৫

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً
يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ
كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ
عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾
وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا
الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

তরজমা

(১৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা (হে রসূল!) বৃক্ষ-তলে আপনার নিকট বয়আত গ্রহণ করলো, তিনি তাদের মনের কথা জানতে পারেন, তাই তিনি তাদেরকে দান করেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

(১৯) এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে, আর আল্লাহ্ পাক মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২০) আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণ গনীমতের (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) যা তোমরা হস্তগত করবে। তিনি তোমাদের জন্যে তা তরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের থেকে লোকদের হাতকে প্রতিহত করেছিলেন, যাতে করে তা মোমেনদের জন্যে হয় বিশেষ নিদর্শন, আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

(২১) আরো বহু সম্পদ রয়েছে, যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, তবে আল্লাহ্ পাক তা তাঁর আয়ত্বে রেখেছেন, আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(২২) যদি কাফেররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো, তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতো, তারা (ঐ অবস্থায়) কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীও পেতনা।

(২৩) এটিই আল্লাহ পাকের বিধান, যা পূর্বকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। আর (হে রসুল!) আপনি আল্লাহ্ পাকের বিধানে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে, যারা হোদায়বিয়ার অভিযানে শরীক হয়নি এবং এজন্যে ভিত্তিহীন ওজর-আপত্তি পেশ করেছে. আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে খাঁটি মোমেনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা হোদায়বিয়ায় একটি বৃক্ষ-তলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে হাত দিয়ে বয়আত করেছিলেন এ মর্মে যে, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করতে থাকবেন এবং আত্মনিয়োগ করবেন ইসলামের খেদমতে। আলোচ্য আয়াতে এমন ত্যাগী, নিবেদিত প্রাণ মোমেনগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা (হে রসূল!) আপনার নিকট বৃক্ষ-তলে বয়আত গ্রহণ করলো'।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়াতে আমরা ১,৪০০ জন ছিলাম, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সারা পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম লোক'।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে বশর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে যে, যে কেউ এ বৃক্ষ-তলে বয়আত করেছে, সে দোজখে যাবেনা।[১]

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

'তিনি তাদের মনের কথা জানতে পারেন'।

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি যে তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা ছিল এবং তাঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, ইসলামের জন্যে তাঁরা যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণে, তাঁর নির্দেশ পালনে তাঁদের যে আন্তরিকতা ছিল, আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার আবু হাইয়্যান বলেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত সমূহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে যে অসন্তোষ এবং অশান্তি ছিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত ছিলেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

এরপর আল্লাহ পাক তাদের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা নাজিল করেন। তাদের মন নিশ্চিন্ত এবং নিঃশংক হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে কিছু দিন পরই বিজয় দান করলেন অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির পরই খায়বর যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেন।

এবনে আয়েজ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনা শরীফে দশদিন অবস্থান করেন। সোলায়মান তাইমী বলেছেন, তিনি পনের দিন মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থান করেন। এবনে আকাবা ইমাম জুহরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে মোনাওয়ারায় বিশ দিন অবস্থান করেন। এবনে এসহাক মোসাওয়্যার ও মারওয়ানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিলহজ্ব মাসে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় আগমন করেন এবং মহররম পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ মাসে খায়বরের অভিযান হয়। সপ্তম হিজরীর সফর মাসে খায়বর বিজয় হয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৪৭

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, আর ওয়াকেদীর "মাগাজী"তেও একথাই রয়েছে। হাকেমও ওয়াকেদীর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا

'এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ তারা হস্তগত করবে'।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা পেট ভরে [illegible] খেজুর খাব।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, খায়বর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমরা পেট ভরে খেজুর খাইনি।

হাফেজ মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বলেছেন, খায়বর এমনি একটি স্থান, যেখানে দূর্গ ছিল, শষ্য-ক্ষেত্র ছিল, অনেক খেজুর বাগান ছিল।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের কথা বলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের এবং তাঁর পরবর্তী যুগের সমস্ত যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তবে এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম খায়বরের অভিযান থেকে লব্ধ সম্পদ এবং হোদায়বিয়ার সন্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত হলো যে, তিনি কাফেরদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মক্কার কাফেরদের চক্রান্ত যেমন ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে যে সব মোনাফেকরা হোদায়বিয়া অভিযানে শরীক হয়নি, পেছনে রয়ে গিয়েছে তাদের ষড়যন্ত্রও আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

মক্কার কাফেররা মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করেও সফল হতে পারেনি, তেমনিভাবে মোনাফেকরা পেছনে থেকেও মুসলমানদের পরিবারবর্গকে কষ্ট দিতে পারেনি। এর দ্বারা কল্যাণকামী মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ আর একথা জেনে রাখা উচিত, প্রকৃত হেফাজতকারী এবং সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ পাক, তিনি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৪৭
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৪৭

হেফাজত করলে কেউ ক্ষতি করতে পারেনা, অতএব দুশমনদের সংখ্যাধিক্য দেখে সাহস-হারা হওয়া উচিৎ নয় এবং নিজেদের সংখ্যা কম দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়াও উচিৎ নয়। সর্বদা এক আল্লাহ্ পাকের উপর ভরষা রাখা উচিত, আশা শুধু তাঁরই কাছে, অন্য কারো কাছে নয়। আর একথার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেকটি কাজের পরিণতির জ্ঞান আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা, এতেই রয়েছে তার কল্যাণ।[১]

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

'আর আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী'। তাঁর সকল ইচ্ছাই কার্যকর হয়। কেউ তাঁর কোন ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনা, আর তিনি মহাজ্ঞানী, সকলের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। মানুষ ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞ বলে তাঁর অনেক আদেশের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, কিন্তু সময় যখন অতিবাহিত হয়, তখন সকলেই আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, হোদায়বিয়ার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণ গণিমতের (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের) যা তোমরা হস্তগত করবে, তিনি তোমাদের জন্যে তা তরান্বিত করেছেন, তিনি তোমাদের থেকে লোকদের হাতকে প্রতিহত করেছেন, যাতে তা মোমেনদের জন্যে হয় নিদর্শন। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনগণকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, শুধু সোলহে হোদায়বিয়া বা খায়বরই নয়; বরং অনেক বিজয় ও প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ তোমাদের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৫৫

জন্যে রয়েছে, যা তোমরা কেয়ামত পর্যন্ত লাভ করবে। এসব বিজয় তোমাদের সাধ্যের অতীত হলেও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা দান করবেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির মধ্য দিয়েই এসব বিজয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। এরপর কেয়ামত পর্যন্ত আরো বহু বিজয় এবং প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব, কাফেরদেরকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

(আর আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে লোকদের হাতকে প্রতিহত করেছিলেন।)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খায়বরে অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন বণী আসাদ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা প্রাণের মদীনায় হামলা করে মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠনের ও তাঁদের পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়ার কু-মতলব করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তারা মুসলমানগণের পরিবারবর্গের উপর হামলা করতে আর সাহস করেনি।

এবনে এসহাক লিখেছেন, বণী গাতফান গোত্র হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্যকারী ছিল, যখন তারা শ্রবণ করলো যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর অভিযানে তশরিফ নিয়ে গেছেন, তখন ইহুদীদের সাহায্যে বণী গাত্‌ফান গোত্র বের হয়ে পড়ল, কিন্তু পথিমধ্যেই খবর পেল যে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারবর্গ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, এ সংবাদ পেয়ে তারা দ্রুত ফিরে আসে এবং নিজেদের বাড়ী-ঘর ও পরিবারবর্গের হেফাজতে নিয়োজিত হয়। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খায়বর অভিযানে আর কোন বাধা রইলনা। এটি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্য।

গায়েবী মদদ

এবনে কানেয়, বগভী এবং আবু নায়ীম সায়ীদ এবনে শাতীমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সায়ীদের পিতা উয়াইনাহ গাতফানী অশ্বারোহীদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি

বলেন, হঠাৎ একটি শব্দ শ্রুত হলো, কেউ বলছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের বাড়ী-ঘরের খবর নাও, তাদের প্রতি হামলা হয়ে গেছে। একথা শ্রবণ করা মাত্র লোকেরা তাদের বাড়ী-ঘরের দিকে দৌড়ানো আরম্ভ করলো, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করলোনা; আমাদের ধারণা হলো এ আওয়াজটি আসমান থেকে এসেছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, كَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ কথাটির ব্যাখ্যা হলো হোদায়বিয়ায় সন্ধির কারণে মক্কার কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

'আর তা যেন হয় মোমেনদের জন্যে এক নিদর্শন', অর্থাৎ আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা এজন্যে করেছেন যেন তোমরা নিরাপদ থাক, তোমরা যেন যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন কর, আর এসব হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সত্যতার বাস্তব প্রমাণ।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

'আর আল্লাহ পাক যেন তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দেন'।

সরল সঠিক পথ হলো আল্লাহ পাকের দানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরষা রাখা, অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক যেন তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি সুদৃঢ় এবং অটল অবিচল রাখেন।

ইমাম আহমদ (রঃ), এবনে খোযায়মা এবং হাকেম হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে মোনাওয়ারায় "সেবা' এবনে আরফাকে" তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন মদীনাবাসী ইহুদীরা তা কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারেনি। কোন মুসলমানের কাছে যে ইহুদীরই কোন ঋণ ছিল, ঐ ইহুদী তখন মুসলমানকে বললো, আমার কর্জ শোধ করে যেতে হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) ও তেবরাণী হযরত আবু যদর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আবু সাহাম নামক ইহুদী আমার নিকট পাঁচ দিরহাম পেত। সে ঐ পাঁচ দেরহামের জন্য আমাকে তাগিদ দিতে লাগলো। আমি বললাম, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমার ঋণ

পরিশোধ করবো, কেননা আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে খায়বরে গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) পাওয়া যাবে। তখন আবু সাহাম ইহুদী বললো, এটা শুধু তোমার ধারণা, খায়বরের যুদ্ধে তেমনই হবে যেমনটি বেদুঈনদের মোকাবেলায় তোমাদের সাথে হয়েছিল, আর তোমরা এতে অভ্যস্ত। তৌরাতের শপথ! খায়বরে দশ হাজার বীর পুরুষ রয়েছে। এরপর আমার বিষয়টি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হল। তিনি নির্দেশ দিলেন, "তার হক্ব আদায় করে দাও"। আমি তখন আমার একটি কাপড় তিন দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম (আল হাদীস)।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খায়বরের নিকট "সাহবা" নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি আমাদের নিকট যার কাছে যা খাবার আছে তা একত্রিত করার আদেশ দিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে কিছু ছাতু পেশ করা হলো, কেননা এতদ্ব্যতীত কারো নিকট কিছুই ছিল না। এরপর তিনি ছাতুগুলোকে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিলেন এবং তিনি নিজেও আহার করলেন, আমরাও আহার করলাম। এরপর তিনি নামাজ পড়লেন। সেখান থেকে তিনি খায়বরের বাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এ স্থানটি খায়বরের বিজয়ের পর হযরত জায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ)-এর অংশে এসেছিল। রাতের শেষ প্রহরে আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম।

ইহুদীরা প্রথমতঃ এ ধারণা করেনি যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন, কেননা তাদের শক্তি ছিল, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, তাদের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল। যখন তারা জানতে পারে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে গেছেন, তখন প্রতিদিন দশ হাজার দুর্ধর্ষ বীর খায়বর থেকে বের হয়ে সারিবদ্ধ হয়, যখন মুসলমানদেরকে না পেত তখন প্রত্যাবর্তন করে বলতো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের)এর ইচ্ছা বদলে গেছে, তিনি কোথায় আসবেন, তার আসা অসম্ভব, প্রতিদিন তাদের এই ছিল কর্মসূচী। যে রাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন, সে রাতে তারা কিছুই করেনি, নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘুমিয়ে থাকে, মোরগও বাঁক দেয়নি, এভাবে ভোর হয়ে গেল, তাদের মন ভয়ে কম্পমান হল, তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসলো।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রে খায়বরে পৌঁছলেন, এটিই তাঁর নিয়ম ছিল, যখনই কোন সম্প্রদায়ের

প্রতি তিনি আক্রমণ করতেন, রাত্রেই তিনি সেখানে পৌঁছে যেতেন, ধোকা দিয়ে হঠাৎ করে আক্রমণ করতেন না, যখন সকাল হতো এবং ঐ জনপদ থেকে আযান শ্রবণ করতেন, তখনও আক্রমণ করতেন না আর যদি আযানের আওয়াজ শ্রুত না হত, তখন আক্রমণ করতেন। আমরা ফজরের নামাজ আদায় করলাম, আযানের কোন শব্দ শ্রুত হলনা, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন, মুসলমানগণও আরোহন করলেন। তখন ঐ জনপদের লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যেতে লাগলো। দূর্গ থেকে বের হয়েই তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'হাত মোবারক উত্তোলন করে বললেন, "আল্লাহু আকবর, খায়বর ধ্বংস হয়েছে", আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের রণাঙ্গনে অবতরণ করি তখন তাদেরকে আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সতর্ক করি, কিন্তু তারা তা মানেনা, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয় তাদের সকাল অত্যন্ত মন্দ হয় (অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করা হয়)।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "নাতাত" নামক স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেন, মুসলমানদেরকে কাতারবন্দী করলেন এবং তাদেরকে এ উপদেশ দিলেন যে আমার অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ শুরু করবেনা। (কিন্তু বণী আসযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত এক ইহুদীর উপর আক্রমণ করলো, ঐ ইহুদীও পাল্টা আক্রমণ করে মুসলমানকে শহীদ করলো, লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি যুদ্ধের অনুমতি দেইনি, এতদসত্বেও ঐ ব্যক্তি ইহুদীর উপর হামলা করেছে। মুসলমানগণ বললো, জ্বী হ্যাঁ। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা ঘোষণা করার জন্যে আদেশ দিলেন, কোন অবাধ্য ব্যক্তির জন্যে জান্নাত হালাল নয়।

তেবরাণী হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধের আকাংখা করোনা, আল্লাহ পাকের দরবারে নিরাপত্তার জন্যে দোয়া করতে থাক, কেননা তোমরা জান না (যুদ্ধে) তোমাদের কী অবস্থা হবে। তবে যদি মোকাবেলা হয়েই যায় তখন দোয়া কর, হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের এবং তাদের মালিক, আমাদের এবং তাদের ললাট তোমারই হাতের মুঠোয় রয়েছে, তুমিই

তাদেরকে হত্যা করবে, এরপর জমীনে বসে পড়, যখন তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তখন তোমরা ওঠ এবং আল্লাহু আকবর বল (আল হাদীস)।

এবনে এসহাক এবং মোহাম্মদ এবনে আমর এবং সায়ীদের বর্ণনা হলো এই যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পতাকা বিতরণ করেন এবং লোকদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন এবং যুদ্ধে অটল অবিচল থাকার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। সর্ব প্রথম যে দূর্গটি ঘেরাও করা হয় তা ছিল "নায়েম", নাতাত এলাকার একটি দূর্গ। এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। নাতাতবাসী প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সন্ধ্যাকালে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজী নামক স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পতাকা নিয়ে বের হতেন, সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতেন। অবশেষে দূর্গটির পতন হয়, আল্লাহ পাক বিজয় দান করেন।

বায়হাকী আবু নায়ীমের সূত্রে বর্ণিত, মুসলমানগণ যখন খায়বরে পৌঁছলেন, তখন সেখানে খেজুর পেকেছিল, ঐ খেজুর খাওয়ার পর মুসলমানগণ জ্বরে আক্রান্ত হলো। লোকেরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। তখন তিনি এরশাদ করেন, তোমরা মশকগুলো পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে লও, সকালে দু' আজানের মধ্যে বিসমিল্লাহ পাঠ করে ঐ পানি নিজেদের গায়ে ঢেলে দাও, মুসলমানগণ এ আদেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ এবং প্রাণবন্ত বোধ করলেন। যেমন কোন বাধা ছিল, যা দূরীভূত হলো। "নায়েম" বিজয়ের পর মুসলমানগণ "সাব এবনে মাআজ" এর দূর্গ অবরোধ করলেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর আবুল ইয়াসার কাব এবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ দূর্গটি অত্যন্ত মজবুত ছিল। মুসলমানগণ তিন দিন পর্যন্ত তা অবরোধ করে রাখলেন।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী (দঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন

এবনে এসহাক আসলাম নামক গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে এবং মোহাম্মদ এবনে আমর মওতাব আসলামীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমাদের গোত্রের লোকেরা জঠর জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছিল, এমনকি তারা খায়বরে পৌঁছল এবং দশ দিন পর্যন্ত "নাতাত" এলাকা ঘেরাও করে রেখেছিল, কিন্তু সেখানে এমন কোন স্থান মুসলমানদের করতলগত হয়নি, যেখানে খাদ্যদ্রব্য রয়েছে। লোকেরা আসমা এবনে

হারেসাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেছে, আসমা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! গোত্রের লোকেরা আপনার খেদমতে সালাম আরজ করেছে এবং বলেছে, আমরা ক্ষুধাজনিত কষ্টে রয়েছি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা তাদেরকে আমি খাদ্য স্বরূপ দিতে পারি। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ দূর্গ যাতে সর্বাধিক চর্বি রয়েছে, তার বিজয় দান করুন। এ দোয়া করার পর তিনি হোবাব এবনে মুনজেরকে পতাকা দান করেন এবং লোকদেরকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যে আহবান করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আল্লাহ পাক ঐ দুর্গটির বিজয় দান করলেন। খায়বরে এর চেয়ে বড় কোন খাদ্য-দ্রব্যের কেন্দ্র ছিল না। হোবাব এবনে মুনজেরের মোকাবেলায় ইউশা নামক ইহুদী বের হয়ে এসেছিল, হোবাব তাকে হত্যা করেন। এরপর জিয়াল নামক আরেক ইহুদী মোকাবেলায় আসে, তাকে আম্মারা এবনে আকাবা গিফারী (রাঃ) হত্যা করেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বলেছেন, "সাব" দূর্গটি থেকে মুসলমানগণ এত অধিক পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য পেয়েছেন যা ছিল সম্পূর্ণ রূপে কল্পনাতীত। এতে ছিল খেজুর, ঘৃত, মধু, জয়তুনের তৈল এবং চর্বি। প্রত্যেকটি বস্তুই ছিল প্রচুর পরিমাণে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষকের মধ্যমে এ ঘোষণা দিলেন, তোমরা যত ইচ্ছা খাও, আর যা সম্ভব সঙ্গে নিয়ে নাও, তবে নিজেদের বাড়ীতে নেয়ার জন্যে বহন করোনা।

বায়হাকী মোহাম্মদ এবনে আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন, নায়েম এবং সাব দূর্গের পতনের পর ইহুদীরা এসব দূর্গ থেকে সরে গিয়ে "জোবায়ের" নামক দূর্গে আশ্রয় নেয়। পাহাড়ের এ চূড়াটি যুদ্ধের পর হযরত জোবায়ের (রাঃ)-এর অংশে আসে। মুসলমানগণ এ দূর্গটি তিনদিন পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন, এরপর গেজাল নামক একজন ইহুদী গোপনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয় এবং আরজ করে, হে আবুল কাশেম! আমি আপনাকে একটি তদবির বলতে চাই যার মাধ্যমে আপনি অতি সহজে দূর্গ করায়ত্ত করতে সক্ষম হবেন, তবে আমার একটি শর্ত রয়েছে, তা হলো আমাকে আমার পরিবারবর্গসহ নিরাপদে "শক" নামক স্থানে যেতে দেবেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নিরাপত্তা দান করলেন।

ইহুদী বললো, আপনি একমাস পর্যন্ত যদি ঘেরাও করে রাখেন, তবু দূর্গবাসী কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবেনা, কেননা মাটির নীচে তাদের পানি সংরক্ষিত রয়েছে। রাত্রে বের হয়ে তারা পানি নিয়ে আসে, যদি আপনি পানি পর্যন্ত পৌঁছার পথ বন্ধ করে দেন, তবে দুর্গবাসী বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। অবশেষে তাই হলো।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের পানি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ বন্ধ করে দিলেন। ইহুদীরা সঙ্গে সঙ্গে দূর্গ থেকে বের হয়ে আসল এবং ভীষণ যুদ্ধ হলো, ঐ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করলেন এবং দশজন ইহুদীও নিহত হলো। কিন্তু দূর্গের পতন ঘটলো, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। নাতাত নামক স্থানের এটি ছিল সর্বশেষ দূর্গ।

নাতাত থেকে অবসর পেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "শক" নামক স্থানের দিকে মনোনিবেশ করলেন। সেখানকার ইহুদীরাও মুসলমানদের মোকাবেলা করলো। গাজল নামক এক ইহুদী সর্ব প্রথম মোকাবেলায় আসে, হযরত হোবাব এবনে মুনজের (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। এরপর আরেকজন ইহুদী বের হয়ে আসলো, হযরত আবু দোজানা (রাঃ) তাকে হত্যা করলেন। তার যুদ্ধাস্ত্র, বর্ম, তরবারি প্রভৃতি নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু দোজানা (রাঃ)-কে সে সব দান করলেন। এরপর ইহুদীরা ময়দানে বের হলো এবং মুসলমানদের মুখোমুখী হতে বিরত থাকল, মুসলমানগণ উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করলেন এবং দূর্গে আক্রমণ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হযরত আবু দোজানা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সেখানে অনেক অর্থ-সম্পদ, বকরী-দুগ্ধ, খাদ্য-দ্রব্য লাভ করলেন, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধবাজ ছিল, তারা সকলে পলায়ন করে "বিনজাল" নামক দূর্গে পৌছে গেল এবং "নাতাত" দূর্গে যারা রয়ে গিয়েছিল, তারা "বিনজালে" এসে সমবেত হলো। এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথীগণকে বিনজালের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এখানেও ভীষণ যুদ্ধ হলো, ইহুদীরা মুসলমানদের উপর মুষলধারে বৃষ্টির মত তীর এবং প্রস্তর বর্ষণ করলো। কয়েকটি তীর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পড়ল এবং তাঁর পোষাকে আটকে রইল। তিনি সেগুলোকে একত্রিত করলেন, এরপর একমুঠো কংকর হাতে নিয়ে দূর্গের দিকে নিক্ষেপ করলেন, এর ফলে দূর্গের দেয়ালগুলো প্রকম্পিত হলো

এবং ধ্বসে পড়লো। এ সুযোগে মুসলমানগণ ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং দূর্গের অধিবাসীদের বন্দী করলেন। কিছু লোক পলায়ন করে "কাসীবা" নামক স্থানে চলে গেল।

কাসীবায় বড় দূর্গ ছিল "কামুস"। এটি ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং সংরক্ষিত। এবনে আবি আকাবার বর্ণনা হলো এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ দিন যাবত এ দূর্গ ঘেরাও করে রেখেছিলেন। এ স্থানটি স্বাস্থ্যের জন্যে ছিল খুবই ক্ষতিকর।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত সাহাল এবনে সাদ (রাঃ) এর বিবরণ সংকলিত হয়েছে। আবু নায়ীম হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। এমনিভাবে আবু নায়ীম হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ স্থানে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারকের অর্ধেকে ব্যাথা হতো। এ কারণে তিনি দু'একদিন বাইরে আসেননি, এ ব্যাথা যখন শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ডাক দিয়ে তাঁর হস্তে পতাকা দিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, এরপর দ্বিতীয় দিনেও ভীষণ যুদ্ধ হলো, কিন্তু সাফল্য ব্যতীতই তাঁবুতে ফিরে এলেন। এ দু'দিনই ইহুদীরা প্রাধান্য বিস্তার করলো। এ সংবাদ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেয়া হলো, তিনি এরশাদ করলেনঃ আগামীকাল আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব, যার হাতে আল্লাহ পাক বিজয় দান করবেন। সে ময়দান থেকে পলায়ন করবেনা, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বতকারী হবে এবং সে অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।

হযরত বোরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘোষণার পর আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আগামীকাল অবশ্যই আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু সকলের মনে সমস্ত রাত জুড়ে ছিল একই চিন্তা- কাল কার হাতে পতাকা দেয়া হবে? সকাল হলো, লোকেরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন, প্রত্যেকের মনে একই আকাংখা যে, আজকের পতাকা যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে দান করেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, ঐ দিন ব্যতীত আর কোন দিন আমার মনে এ আকাংখা হয়নি যে, আমাকে অধিনায়ক বানানো হোক। সেদিন ফজরের নামাজের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম পতাকা আনয়নের আদেশ দিলেন। এরপর দন্ডায়মান হয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আলী কোথায়? লোকেরা বললো, তাঁর চোখ উঠেছে। এরপর তাঁকে ডেকে আনার জন্যে তিনি লোক পাঠালেন। হযরত সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে নিয়ে আসলাম। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমার চক্ষুদ্বয় অসুস্থ, আমার অবস্থা এই যে, সন্মুখের কোন জিনিষ আমি দেখতে পারিনা।

হাকেমের সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা হলো এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার মাথাকে তাঁর কোলে নিলেন, এরপর তাঁর পবিত্র মুখের লালা দস্তে মোবারকে নিয়ে আমার চক্ষুদ্বয়ে মালিশ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) এর চক্ষুদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে এত ভাল হয়ে গেল, যেন কখনো তাতে কোন কষ্ট ছিলনা। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলীর (রাঃ) চক্ষুদ্বয় কখনো কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর হযরত আলী (রাঃ)-কে পতাকা দান কররেন। হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি ইহুদীদের সঙ্গে সে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো, যতক্ষণ না তারা আমাদের ন্যায় মুসলমান হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও। যখন তাদের এলাকায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে। আর তাদেরকে বলবে, তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের কি হক্ব রয়েছে? এমনিভাবে আল্লাহ পাকের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কি হক্ব তাদের প্রতি রয়েছে? যদি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ পাক একজন মানুষকেও হেদায়েত করেন, তবে মনে রাখবে, তা তোমার জন্যে লাল বর্ণের উষ্ট্রের চেয়েও অধিকতর উপকারী হবে।

হযরত আলী (রাঃ) পতাকা নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং দূর্গের নীচে জমীনে পতাকা প্রোথিত করলেন। একজন ইহুদী দূর্গের দেয়ালের উপর থেকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি আলী (রাঃ)। এ জবাব শ্রবণ করে ইহুদী বললো, শপথ সে পবিত্র সত্ত্বার! যিনি মুসা (আঃ)-এর প্রতি তওরাত নাজিল করেছেন। তোমরা বিজয় লাভ করেছ, অবশেষে তাই হয়েছে, হযরত

আলী (রাঃ) বিজয় লাভ করেই ফিরেছেন।

মোহাম্মদ এবনে আমর হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ খায়বরের দূর্গ থেকে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম বের হয়ে আসে এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মোকাবেলা করে, সে ছিল মোরাহ্যাবের ভ্রাতা হারেস। হযরত আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন, তার সাথীরা দূর্গে ফিরে যায়। এরপর আমের নামক এক ব্যক্তি বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি ছিল দীর্ঘদেহী এবং শক্তিশালী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমের বের হয়ে এসেছে। তোমরা দেখছ, সে পাঁচ হাত বিশিষ্ট একজন মানুষ। সে তার মোকাবেলা করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে।

হযরত আলী (রাঃ) তার মোকাবিলা করে তাকে হত্যা করলেন। এরপর ইয়াসের নামক এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে, হযরত আলী (রাঃ) তার মোকাবেলা করতে অগ্রসর হলেন। তখন হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, আমাকে একা তার মোকাবেলা করতে দিন। হযরত আলী (রাঃ) তার কথায় সম্মত হলেন।

হযরত জোবায়ের (রাঃ) যখন ঐ ইহুদীর মোকাবেলায় রওয়ানা হলেন, তখন হযরত সফীয়্যা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার পুত্র মারা যাবে, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ না, বরং তোমার পুত্র ইনশাআল্লাহ তাকে হত্যা করবে। অবশেষে তাই হলো। হযরত জোবায়ের (রাঃ) ইয়াসেরকে হত্যা করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত জোবায়ের (রাঃ)-কে বললেন, "তোমার প্রতি আমার পিতৃব্য কোরবান, প্রত্যেক নবীরই কিছু হাওয়ারী (একান্ত আপন লোক) থাকে, জোবায়ের (রাঃ) আমার হাওয়ারী"।

হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, মোরাহ্যাব যুদ্ধে অনুপ্রেরণা-দায়ক বীরত্বগাথা পাঠ করতে করতে এসেছিল। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এক ইহুদী হযরত আলীর তরবারির উপর আঘাত করলো, ফলে তাঁর হাতের ঢাল পড়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দূর্গের ফটকের একটি পাল্লা হাতে তুলে নিয়ে তাকে ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয় দান করলেন। যুদ্ধ শেষে ঐ পাল্লাটি তিনি রেখে দিলেন। সে দৃশ্য যেন আমি এখনো দেখছি যে, ঐ পাল্লাটি আমরা আটজনের চেষ্টাতেও উল্টে দিতে পারিনি।

বায়হাকী দু'টি সূত্রে হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) খায়বরের যুদ্ধের দিন যে পাল্লাটি তুলে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, তা আমরা চল্লিশ জনের মিলিত শক্তিতেও উঠাতে পারিনি।

হযরত জাবের (রাঃ)-এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা ৭০ জন একত্রিত হয়েও চেষ্টা করেছি পাল্লাটিকে উঠিয়ে স্ব-স্থানে রাখতে, কিন্তু পারিনি।

এবনে এসহাকের বর্ণনা হলো এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরের একের পর এক দূর্গ বিজয় করছিলেন। শুধু দু'টি দুর্গ "ওতীহ" এবং "সালালেম" অবশিষ্ট ছিল। এ দুটি দুর্গই ছিল বিজয়ের অপেক্ষায়। ইহুদীরা দুর্গ থেকে বের হচ্ছিল না, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "মিনজানিক" মোতায়েন করে প্রস্তর বর্ষণের ইচ্ছা করলেন, চৌদ্দ দিন যাবত দূর্গ দু'টি ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল, তখন ইহুদীরা সন্ধি প্রস্তাব প্রেরণ করলো, কয়েকটি শর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। শর্তগুলো হলো।

(১) যত লোক এখন দূর্গে অবরুদ্ধ হয়েছে, পরিবারবর্গসহ তাদের সকলের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে।

(২) খায়বর থেকে তারা বের হয়ে যাবে,

(৩) অস্ত্র-শস্ত্রসহ যাবতীয় সম্পদ রেখে যাবে।

এসব শর্তে ইহুদীরা সন্ধি করলো। দূর্গ দু'টিতে একশত লৌহ বর্ম, চারশত তরবারি, পাঁচশত কামান ও তীর পাওয়া যায়। আর "কাসীবা"তেও তীর সহ পাঁচশত কামান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, যদি কোন কিছু গোপন করে থাক, তবে তোমাদের নিরাপত্তার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ পাকের এবং আমার কোন দায়িত্ব থাকবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কেনানা এবনে আবিল হাকীক তার ভ্রাতা রবি এবং তার চাচাতো ভাইকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করা হয়, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, হুয়াই এবনে আখতাবের যে সম্পদ বণী নজির নিয়ে এসেছিল, তা কোথায়? তারা বললো, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং মানুষের সাহায্যার্থে ব্যয় হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এত অল্প সময়ে কিভাবে ব্যয় হলো? নিশ্চয় তোমরা ঐ সম্পদ গোপন করে রেখেছ। যদি তার সন্ধান পাওয়া যায় তবে

তোমাদেরকে হত্যা করা এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করা আমার জন্যে বৈধ হবে।

বায়হাকী ওরওয়া এবং মোহাম্মদ এবনে আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে ঐ সম্পদ কোথায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন কেনানাকে বললেন, আসমানী আদেশ মোতাবেক তুমি মিথ্যাবাদী, এরপর তিনি একজন আনসারী ব্যক্তিকে তলব করে আদেশ দিলেন, অমুক ময়দানে যাও এবং ডান দিকে এবং বাম দিকে দু'টি খুরমা গাছ দেখতে পাবে। উভয় গাছের মধ্যে জমীনের ভেতর সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে, তুমি সেখান গিয়ে যা পাও আমার নিকট নিয়ে আস। ঐ আনসারী ব্যক্তি গিয়ে সেখানে থেকে একটি পাত্র এবং আরো কিছু সম্পদ নিয়ে আসলেন, যার মূল্য দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধরা হয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে তাদের উভয়কে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং তাদের পরিবারবর্গকে গোলাম-বাঁদী করা হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), মুসা এবনে আকাবা এবং ওরওয়া (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর বিজয় করলেন, তখন ইহুদীরা বললো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন, আমরা এই জমীনের সেবা-যত্ন করবো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের নিকট তখন এমন কোন গোলাম ছিল না, যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এজন্যে তিনি এ শর্তে ইহুদীদের আবেদন গ্রহণ করেন যে, কৃষিজাত পণ্যের অর্ধেক তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করবে; আর বাকী অর্ধেক তারা ভোগ করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, আমরা যতদিন ইচ্ছা ততদিন তোমাদেরকে এ কাজে নিয়োজিত রাখবো।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেন, যতদিন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এ কাজে নিয়োজিত রাখবেন, ততদিন আমরাও তোমাদেরকে রাখবো। প্রত্যেক বছর হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) খায়বর গমণ করতেন এবং উৎপন্ন ফসল একত্রিত করে দু'ভাগ করতেন, অর্ধেক ইহুদীদেরকে দিয়ে বাকি অর্ধেক মদীনা

মোনাওয়ারায় নিয়ে আসতেন। ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করে এবং তাঁকে উৎকোচ দেয়ার প্রয়াস পায়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোমরা আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, যিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আর আমার দৃষ্টিতে তোমরা বানর এবং শুকরের চেয়েও অধিকতর ঘৃণ্য। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ ঘৃণা এবং তাঁর সঙ্গে এ মহব্বত আমাকে তোমাদের প্রতি জুলুম করতে বাধ্য করবেনা। ইহুদীরা বললো, এ ন্যায়-বিচারের উপরই তো আসমান জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

যাহোক, ইহুদীরা তাদের জমীনে যথারীতি অবস্থান করছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে বাড়ীর উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করে, এরপর তাঁর দু'টি হাতের কব্জি ভেঙ্গে দেয়।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, রাত্রিকালে যখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন তারা তাঁর প্রতি যাদু করে। সকালে যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর মনে হলো যে, তাঁর আঙ্গুলের গোড়া থেকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, মনে হয় যেন তাঁর হাত বাধা অবস্থায় রয়েছে, যখন সাথীরা তাঁর নিকট আসলেন, তখন তারা তাঁর হাত ঠিক করলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যতদিন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রাখবেন, ততদিনই তোমরা এখানে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। রাত্রে তাঁর প্রতি হামলা করা হয়। তাঁর হাতের কব্জি ভেঙ্গে দেয়া হয়, সেখানে এ ইহুদীরা ব্যতীত আমাদের কোন শত্রু নেই, তাদের এ অপরাধকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি, এজন্যে তাদেরকে আমি খায়বর থেকে বহিস্কার করতে চাই। খায়বরে যার যার অংশ রয়েছে, সে যেন হাজির হয় এবং খায়বরের জমীনকে ভাগ করে নেয়।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইহুদীদেরকে খায়বর থেকে বহিস্কারের সংকল্প গ্রহণ করলেন, তখন বনীল হাকীক গোত্রের এক সর্দার তাঁর খেদমতে হাজির হলো এবং আরজ করলো, আমাদেরকে খায়বর থেকে বহিস্কার করবেন না,এখানেই আমাদেরকে থাকতে দিন, যেমন আবুল কাসেম (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম) এবং (হযরত) আবু বকর (রাঃ) আমাদেরকে এখানে থাকতে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐ কথাটি ভুলে গেছ, যা হুযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাকে বলেছিলেন, সে সময় তোমার কী অবস্থা হবে, যখন একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী উট তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সে বললো, এটি ছিল আবুল কাসেমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) একটি বিদ্রুপ, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, যাহোক, হযরত ওমর (রাঃ) ইহুদীদেরকে খায়বর থেকে বহিস্কার করলেন।

প্রিয়নবী (দঃ) এর মোযেজা

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং হযরত জাবের (রাঃ), হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রঃ)-এর সূত্রে জুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ মোরাহ্যাব এর ভাতিজী এবং সালাম এবনে মোশকাম এর স্ত্রী জয়নব মানুষকে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বকরীর কোন্ অংশের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করেন? লোকেরা বললো, হাতের গোশ্ত। জয়নব বকরীর গোশ্তে কিছু মিশিয়ে ভুনা করে রেখে দিল এবং হযরত সফীয়্যা (রাঃ) এর নিকট হাদীয়া স্বরূপ প্রেরণ করলো। আর বকরীর হাতের অংশে অধিক পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করলো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সফীয়্যা (রাঃ) এর নিকট আগমন করলেন, তখন হযরত বশর এবনে বরা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, হযরত সফীয়্যা (রাঃ) ঐ ভুনা গোশ্তটি তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বকরীর হাতটি নিয়ে কিছু গোশ্ত তা থেকে টেনে নিলেন, আর বশর (রাঃ) হাড্ডি নিয়ে তা থেকে গোশ্ত মুখে দিলেন।

এবনে এসহাকের বর্ণনা হলো; বশর (রাঃ) লোকমাটি গিলে ফেললেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থুথু ফেলে দিলেন।

জুহরী (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা থেকে এক টুকরো নিয়েছিলেন এবং বশরও এক লোকমা নিয়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "হাত সরিয়ে নাও, এ বকরী আমাকে বলছে যে, সে

বিষাক্ত"। হযরত বশর (রাঃ) বললেন, "শপথ সে আল্লাহ পাকের! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমি আমার লোকমা থেকে এ সত্য উপলব্ধি করেছি। কিন্তু আপনার সম্মুখে খাদ-দ্রব্য ফেলে দেয়া পছন্দ করিনি। আপনি যখন মুখের ভেতর লোকমা দেয়া পছন্দ করেননি, তখন আমিও এমন কিছু করতে পারিনা"। হযরত বশর (রাঃ) নিজের স্থান থেকে এখনও ওঠেননি, এত শীঘ্র তাঁর চেহারার বর্ণ বদলে গিয়ে হলুদ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই ইহুদী মহিলাকে তলব করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বকরীর গোশ্তে বিষ মিশিয়েছিলে? সে বললো, আপনাকে কে একথা বললো? তিনি এরশাদ করলেন, যা আমার হাতে রয়েছে তা-ই বলেছে, অর্থাৎ বকরীর গোশত আমাকে জানিয়ে দেয়েছে। ঐ ইহুদী মহিলা বললো, জ্বী হ্যাঁ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ কাজটি কেন করলে? সে বললো, আমার জাতির যে অবস্থা হয়েছে তা-তো আপনার নিকট গোপন নয়, আমি ধারণা করেছি যে, যদি এ ব্যক্তি বাদশাহ হয় তবে আমরা তার থেকে নাজাত পাব, আর যদি তিনি নবী হন, তবে এ সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েই যাবেন। এ স্বীকারোক্তির পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ইমাম জুহরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি অবশেষে মুসলমান হয়েছিল, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্তিদান করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ঐ স্ত্রীলোকটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমার এ কর্মের মাধ্যমে লোকেরা আপনার ফেতনা থেকে শান্তি পাবে, কিন্তু এখন একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনি সত্য, আমি আপনাকে এবং আপনার নিকট যারা রয়েছেন, সকলকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি আপনার প্রচারিত দ্বীন মেনে নিলাম, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বন্দা ও রসূল, যখন সে মুসলমান হলো তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আর কিছু বলেননি।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে ঐ বিষাক্ত গোশতগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত বশর এবনে বরা (রাঃ)-এর যখন এন্তেকাল হলো, তখন ঐ ইহুদী স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেছেন, সর্ব প্রথম তাকে ছেড়ে দেয়া হয়; কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাননি, আর যেহেতু সে মুসলমান হয়েছে, সেজেন্য ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু যখন তার বিষাক্ত গোশ্‌ত ভক্ষণের কারণে হযরত বশর (রাঃ)-এর মৃত্যু হলো, তখন "প্রাণের বদলা প্রাণ" ইসলামী শরীয়তের এ বিধান মোতাবেক তাকে হত্যা করা হয়।

আবিসিনিয়া থেকে হযরত জাফর (রাঃ)-এর প্রত্যাবর্তন

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা ইয়ামনে ছিলাম, সেখানে আমরা খবর পেলাম যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ রওয়ানা হয়েছেন, আমরাও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কিন্তু আমরা যে জাহাজে আরোহণ করেছিলাম, তা আমাদেরকে আবিসিনিয়া পৌঁছে দিল। সেখানে হযরত জাফর এবনে আবি তালেবের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়। হযরত জাফর (রাঃ) বললেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং এখানে অবস্থানের আদেশ দিয়েছেন, তুমিও এখানে থেকে যাও। তাই আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। কিছুদিন পর যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর জয় করলেন, তখন আমরা তাঁর খেদমতে হাজির হলাম. তিনি তখন যুদ্ধ–লব্ধ সম্পদে আমাদেরকেও অংশ দিলেন। তবে হযরত জাফর (রাঃ).হযরত আবু মুসা (রাঃ) এবং যে সব মহাজের হাবশা হিজরত করেছিলেন, তাদেরকে খায়বরের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ দেয়া হযনি; বিশেষতঃ যারা খায়বরের যুদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

হুজুর আকরাম (দঃ) জাফর (রাঃ)-এর ললাটে চুম্বন করলেন

হযরত জাফর এবনে আবু তালেব (রাঃ)-এর পৌঁছানোর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লার শপথ! আমি জানিনা দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে আমার খুশী বেশী হয়েছে (১) খায়বর বিজয় (২) জাফর এবনে আবু তালেবের প্রত্যাবর্তন। এরপর হযরত জাফর (রাঃ) যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালেন, তখন তাঁর চেহারা মোবারকে লজ্জাজনিত ভাব প্রকাশ

পাচ্ছিল। তখন তিনি হযরত জাফর (রাঃ)-এর সাথীগণকে বললেন, তোমাদের জন্যে দু'টি হিজরত হয়েছে (এক) মক্কা থেকে আবিসিনিয়া যাওয়া এবং দেশত্যাগ করা (দুই) পুনরায় আবিসিনিয়া থেকে মদীনা শরীফ আসা। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রাঃ) এর ললাটে চুম্বন করলেন (বায়হাকী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এবং "দুস" নামক গোত্রের আশিটি পরিবার মদীনা শরীফে আসি, এরপর এমন সময় খায়বরে পৌঁছি, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাতাত জয় করেছিলেন এবং কাসীবা দূর্গ ঘেরাও করে রেখেছিলেন। এই সময় আমরা সেখানে এসে পৌঁছাই এবং সেখানেই অবস্থান করি। আল্লাহ পাক কাসীবা দূর্গের বিজয় দান করলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অংশ দান করলেন।

(আহমদ, বোখারী, হাকেম বায়হাকী, তাহাবী)

ফোদকের ঘটনা

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরের অধিবাসীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তার সংবাদ পেয়ে ফোদকের অধিবাসীরা সন্ধির আবেদন নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করলো। তারা এভাবে আরজী পেশ করলো, আমাদের জানের নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাদেরকে যেতে দিন, আমাদের ধন-সম্পদ সব আপনার নিকট রেখে যাব।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের আরজী কবুল করলেন, তবে এ শর্তারোপ করলেন যে, তোমরা এখন এখানেই অবস্থান কর এবং কাজ কর, আমরা যখন ইচ্ছা তোমাদেরকে বের করবো। ফোদকবাসী এতেও সম্মত হলো, যেহেতু যুদ্ধের পর খায়বর বিজয় হয়েছে, এজন্যে খায়বর থেকে লব্ধ সম্পদে সকল মুসলমান শরীক হয়েছে। আর ফোদক যুদ্ধ ব্যতীত বিজিত হয়েছে, তাই ফোদক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল।

খায়বরের ওতীহ্ এবং সালালেম নামক দু'টি দুর্গ যুদ্ধ ব্যতীতই বিজিত হয়েছিল, এজন্যে এ দুর্গ দু'টি থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তা বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এবং "দুস" নামক গোত্রের লোকদেরকেও এ তহবিল থেকে কিছু অংশ দান করা হয়।

এবনে এসহাক লিখেছেন, খায়বরের শক, নাতাত এবং কাসীবা দূর্গ থেকে অর্জিত ধন-সম্পদ বিতরণ করা হয়। কাসীবা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকিন, মুসাফির এবং উম্মাহাতুল মোমেনীনের জন্যে ব্যয় করা হয়। আর এ তহবিল থেকে তাদেরকেও দেয়া হয়, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ফোদকবাসীর মধ্যে চিঠি-পত্র আদান প্রদান করেছিল। তাঁদেরই মধ্যে ছিলেন হযরত মহিসা এবনে মাসউদ (রাঃ)। নাতাত এবং শক দূর্গের যাবতীয় গণিমত মুজাহেদগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাঁরা হোদায়বিয়ার অভিযানে শরীক হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ১,৪০০ জন, তাঁদের সকলের মধ্যেই এ গণিমত বন্টন করা হয়। তাঁদের মধ্যে শুধু হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) খায়বর যুদ্ধে ছিলেন না, তাঁকেও সমান অংশ প্রদান করা হয়।

সর্বাধিক বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অংশও একজন সাধারণ মুজাহেদের সমানই ছিল, এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয়নি।

ওয়াদিয়ে কোরার বিজয়

খায়বর বিজয়ের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "ওয়াদিয়ে কোরার" অধিবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাদের সাথে যুদ্ধ হয়, ফলে ওয়াদিয়ে কোরা মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণ গণিমত লাভ হয়, যা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, শুধু লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সংরক্ষিত থাকে। জমীন ইহুদীদের হাতে রাখা হয়, তবে ফসলের ব্যাপারে সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়, যা খায়বরবাসীর সঙ্গে করা হয়।[১]

وَّأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ٠

আরও একটি বিজয় যা এখনও তোমাদের সাধ্যাতীত, তবে আল্লাহ পাক তা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৪৯-৫৬৩

আয়ত্বে রেখেছেন, অর্থাৎ হে মোমেনগণ! হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তোমরা খায়বরে বিজয় লাভ করেছ, তবে মনে রেখ, তোমাদের বিজয় মাত্র শুরু হলো। বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে, তোমাদের জন্যে আরও একটি মহা বিজয় সুনিশ্চিত মনে করতে পার যা এখনও তোমাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু আল্লাহ পাক যে সর্বশক্তিমান, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই সে বিজয় দান করবেন। এটি তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি, তোমাদের জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নিকট অনেক নেয়ামত, অনেক গণিমত রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এটি হলো পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়, যা খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে মুসলিম জাতির করতলগত হয়েছিল।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবরা পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা চিন্তাও করতে পারতোনা, এটি শুধু ইসলামই যা সমগ্র আরব জাতিকে এক, অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে পরিণত করেছে এবং ঈমানী বলে বলীয়ান করেছে। ফলে তদানীন্তন পৃথিবীর দু' পরাশক্তি রোমক ও পারশ্য সাম্রাজ্যকে পরাভূত করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ), এবং মোকাতেল (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর একরামা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা হোনায়েনের বিজয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, ভবিষ্যতে মুসলমানগণ যত বিজয় লাভ করবে, সবই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا

আল্লাহ পাক তা আয়ত্বে রেখেছেন, অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ পাকের আয়ত্বেই রয়েছে, যথা সময়ে তিনি তোমাদেরকে সে বিজয় দান করবেন। তোমরা সে বিজয় এখনই লাভ করেছো বলে মনে করতে পার, কেননা তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৬৪

আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। আর যদি এ কাফেররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতো। এমন অবস্থায় তারা কোন বন্ধু বা সাহায্যকারীও পেতনা, অর্থাৎ মক্কার কাফেররা যদি তোমাদের সঙ্গে সন্ধি না করে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তবে তাদের পরাজয় ছিল অবধারিত। তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নে বাধ্য হতো, তাদের সাহায্যে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারীও এগিয়ে আসতোনা।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

'এটি আল্লাহ পাকের পূর্ব প্রচলিত রীতি-নীতি, (হে রসূল!) আপনি কখনো আল্লাহ পাকের রীতি-নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন না'।

অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাকের এ নীতিই পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর নবী রসূলগণকে তাঁদের দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। আল্লাহ পাকের এ নীতিতে কখনো কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর এ আমোঘ নীতির কথা এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

"নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণ প্রাধান্য বিস্তার করবো"।

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম হবে"।

আর অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহর দলই হবে বিজয়ী"।

বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে যুগে যুগে যত মানুষেরই পদচারণা হয়েছে এবং হবে, তাদের সকলকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। (এক) সত্যপন্থী, (দুই) বাতিলপন্থী। যারা নবী রসূলগণের অনুসারী হয়, তারাই সত্যপন্থী, আর যারা নবী রসূলগণের বিরোধী হয়, তারাই বাতিলপন্থী।

যারা সত্য-পন্থী, অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদেরকেই জয়ী করেন। আর বাতিলপন্থীরা হয় পরাজিত। এটিই পৃথিবীর ইতিহাস। এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, তাঁর চিরাচরিত রীতি-নীতি, এতে ইতিপূর্বে কখনো পরিবর্তন হয়নি, ভবিষ্যতেও হবেনা, হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে শুরু করে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্ত পর্যন্ত একথার সত্যতাই বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে আর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদা সত্যেরই বিজয় হয়েছে এবং যুগে যুগে অসত্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ পাকের এ অমোঘ বিধানের কোন পরিবর্তন ইতিপূর্বে কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ
مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾
هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ
مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ
لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২৪) আর তিনিই মক্কার বুকে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

(২৫) এরাই সে সব লোক, যারা কুফরী ও নাফরমানী করেছিল এবং তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে গমনে বিরত রেখেছিল এবং বাঁধা অবস্থায়

কোরবাণীর জন্তুগুলোকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছিল। তোমরা যাদেরকে জান না, এমন কিছু সংখ্যক মোমেন নর-নারীকে তোমরা নিস্পেষিত করে ফেলবে, এজন্যে তোমাদেরকেই অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো, যদি এমন আশংকা না থাকত, তবে তোমাদেরকে এখনই যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো। এজন্যে যে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতে দাখিল করতে চান। যদি এসব লোক কাফেরদের থেকে পৃথক থাকত, তবে আমি তাদের থেকে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

তফসীরুল কোরআন

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মক্কার কাফেরদের একটি দল "তানয়ীম" পাহাড় থেকে অতর্কিতে বের হয়ে এসে মুসলমানদের প্রতি হামলা চালনোর অপচেষ্টা করে। মক্কার কাফেররা এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রাণনাশের চক্রান্ত করে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বেই প্রহরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন, ফলে মুসলমানগণ হামলাকারীদেরকে পাকড়াও করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট থেকে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না, তাদেরকে ক্ষমা করলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোগাফ্ফাল (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, ত্রিশজন কাফের যুবক আমাদের প্রতি আক্রমণের কুমতলবে হাজির হয়, হযরত মুসলিম এবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন; আমি হামলাকারীদের চারজনের উপর তরবারি উঁচু করেছিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হামলাকারী কাফেররা মুসলমানদের প্রতি আপত্তিকর বাক্য ব্যবহার করে, এমনকি, একজন মুসলমানকে শহীদ করে। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে ধরে এনে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির করেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে

১। তফসীরে আদ্দুররুল মনসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৩

কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, বরং ক্ষমা করেন এবং ছেড়ে দেন। এভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান ঘটে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ
مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

আর তিনিই মক্কার বুকে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখছেন, তিনি তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

অর্থাৎ মুসলানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের চক্রান্ত, দৌরাত্ম এবং তাদের প্রতি মুসলমানদের ক্ষমা ও ঔদার্য্য সব কিছুই আল্লাহ্ পাক দেখছেন, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যে এবং কাফেরদেরকে ক্ষমা করার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা আল্লাহ্ পাক দেখছেন তোমরা দেখছনা।[১]

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ
مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

এরাই সে সব লোক, যারা কুফরী ও নাফরমানী করেছে, আল্লাহ্ পাকের আবাধ্য হয়েছে, তারা তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে হাজির হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি তোমাদের কোরবাণীর জন্তুগুলোকে পর্যন্ত হরমে পৌছাতে বাধা দিয়েছে। এ সবই তাদের অমার্জনীয় অপরাধ, এমন অবস্থায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ছিল একান্ত যুক্তিযুক্ত।

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ
فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

কিন্তু যেহেতু মক্কায় তখনও কিছু মুসলমান বাধ্য হয়ে রয়ে গিয়েছিলেন,

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৯৮

যাঁদেরকে সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না, এমনি অবস্থায় যদি মক্কার কাফেরদের সংগে যুদ্ধ হতো, তবে সাহাবায়ে কেরামের অজান্তেই তাঁদের হাতে ঐ মুসলমানগণ নিহত হতেন, এজন্যে মুসলমানদের আক্ষেপের সীমা থাকতোনা। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ঐ মুহূর্তে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। আল্লাহ পাক মোমেন নারী পুরুষদেরকে রক্ষা করার নিমিত্তে জেহাদ থেকে মুসলমানগণকে বিরত রেখেছেন।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

'আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা, তাকে তাঁর রহমতে দাখিল করতে চান'।

لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

'যদি ঐ সমস্ত লোকেরা কাফেরদের থেকে পৃথক থাকতো, তবে আমি কাফেরদেরকে কঠিন কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম'।

অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক থাকতো, যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা না থাকত, তবে কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক সমুচিত শাস্তি দিতেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, কাফেরদের থেকে মুসলমানদের হাতকে বিরত রাখার এ ঘটনা ঘটেছে মক্কা বিজয়ের সময়।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হলো হোদায়বিয়ার সন্ধি, কেননা তখনও মুসলমানগণ যদ্ধ থেকে বিরত রয়েছেন।[১]

لَوْ تَزَيَّلُوْا

আল্লামা আলুসী (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মক্কায় অবস্থানরত মুসলিম নর-নারী যদি কাফেরদের থেকে পৃথক থাকত, তথা মক্কা থেকে বের হয়ে অন্যত্র অবস্থান করতো, তবে যুদ্ধে তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশংকা

১। তফসীর কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১০৯

থাকতনা। যেহেতু তারা কাফেরদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করছিল, তাদেরকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এমন অবস্থায় যুদ্ধ হলে মুসলমানদের হাতেই তাদের নিগৃহীত হওয়ার আশংকা ছিল অনেক বেশী, তাই আল্লাহ পাক মুসলমানদের হাতকে কাফেরদের থেকে এবং কাফেরদের হাতকে মুসলমানদের থেকে সংযত রেখেছেন।[১]

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَ
كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا
قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১১৫

তরজমা

(২৬) কাফেররা যখন তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা পোষণ করতো, তা ছিল বর্বরতার যুগের অহমিকা (মূর্খতা প্রসূত হিংসা-বিদ্বেষ), তখন আল্লাহ পাক তাঁর রসূল ও মোমেনদেরকে দান করলেন এক প্রশান্তি এবং তাদেরকে তাকওয়া পরহেজগারীর উপর অবিচলিত রাখলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য। আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(২৭) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ চুল ছোট করে নেবে, তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকবেনা, তোমরা যা জান না, আল্লাহ পাক তা জানেন। আর এজন্যেই তিনি এর পেছনে এক নিকট–বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন।

(২৮) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে যে হোদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত চুক্তিতে কাফেররা কতকগুলো অযৌক্তিক অসুন্দর শর্ত আরোপ করেছে, যেমন সন্ধি-পত্র সম্পাদিত হবার বছর মুসলমানগণ ওমরাহ করতে পারবেনা. মক্কা শরীফের অদূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া থেকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। পরবর্তী বছর ওমরার জন্য মক্কা শরীফ আসতে পারবে, কিন্তু তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না, আর তাঁদের সঙ্গে যে অস্ত্র থাকবে তা কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্রে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখতে পারবেনা। এমনিভাবে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহর স্থলে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখতে হবে।

কাফেরদের পক্ষ থেকে আরোপিত এ সব অযৌক্তিক শর্ত মূর্খতার পরিচায়ক, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারো পক্ষেই এমন শর্ত মেনে নেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন, তাই তাঁরা এসব শর্ত মেনে নিয়েছেন। আর এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ

'স্মরণ কর সে সময়কে) যখন কাফেররা তাদের অন্তরে বর্বরতার যুগের মূর্খতা প্রসূত হিংসা–বিদ্বেষ পোষণ করে মুসলমানগণকে কাবা শরীফ গমনে বাধা দেয়, তখন আল্লাহ পাক মুসলমানদের অন্তরে এক প্রশান্তি নাজিল করেন। মুসলমানগণ কালেমা তাইয়্যেবার মর্যাদা রক্ষায় অবিচলিত থাকেন, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের তৌফিক এবং দান।

কাফেররা চুক্তিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখতে বাধা দিয়েছে, এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক নামের পর "রসূলুল্লাহ" লিখতেও তারা আপত্তি করেছে, এসবই তাদের মূর্খতা এবং হিংসা বিদ্বেষ, কিন্তু আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সে মুহূর্তে সবর অবলম্বনের তৌফিক দান করেছেন, এজন্যে যে শক্তি থাকা সত্বেও মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى

'তাই আল্লাহ পাক তাঁর রসূল ও মোমেনদের অন্তরে একটি শান্তি এবং সান্ত্বনা নাজিল করেন এবং তাদেরকে তাকওয়া পরহেজগারীর উপর অবিচলিত রাখলেন'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), একরামা (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং এবনে জায়েদ (রঃ) সহ অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, তাকওয়ার কালেমা হলোঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর"।

তফসীরকার আতা এবনে রুবাহ (রঃ) বলেছেন, তাকওয়ার কালেমা হলো "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওহুয়া আলা কুল্লে শাই-ইন কাদীর"।

আতা খোরাসানীর মতে, তাকওয়ার কালেমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ।

আর জুহরী (রঃ) বলেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, তবে সকল মতের মূলকথা একটিই, তা হলো তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা। আর কালেমায়ে তৌহীদ হলো তাকওয়া পরহেজগারী তথা যাবতীয় মানবিক গুণাবলীর মূল ভিত্তি। আর الزم কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাকওয়া পরহেজগারীর কথার উপর অবিচলিত রেখেছেন এবং তাদের থেকে বর্বরতার যুগের হিংসা-বিদ্বেষ ও মূর্খতাপ্রসূত যাবতীয় চারিত্রিক দূর্বলতা দূরীভূত করে দিয়েছেন।

হোদায়বিয়ার চুক্তিতে কাফেরদের একতরফা অযৌক্তিক শর্তগুলো মেনে নেয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম কালেমায়ে তৈয়্যেবাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের বরকতে আত্মসংশোধন লাভে সফল হয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাকওয়ার কালেমার উপর অবিচলিত থাকার তৌফিক পেয়েছিলেন।

وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

'আর তারা এর যোগ্যও ছিল'।

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর আল্লাহ পাক সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি সব কিছু জানেন।

ইমাম রাজী (রঃ) وكانو احق بها বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন, কেননা তারা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করেছেন, আর আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এ ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক পরহেজগার, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সে-ই অধিকতর সম্মানিত"।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

"আর তারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত থাকে"।

মানব-অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতিই তাকওয়া পরহেজগারী অর্জনের মূল উৎস, আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ গুণটি ছিল সর্বাধিক, এ কারণেই

আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি ছিলেন সন্তুষ্ট।[১]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, কেউ মস্তক মুন্ডন করবে, কেউ চুল ছোট করে নেবে, (সেখানে) তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকবেনা, তোমরা যা জান না, আল্লাহ পাক তা জানেন"।

এ সূরার শুরুতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করছেন বলে স্বপ্নে দেখেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁরা অবশ্যই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হয়ে ওমরাহ করবেন। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওমরাহ না করেই হোদায়বিয়া থেকে মদীনা মনোওয়ারা প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার ঐ স্বপ্নটির বাস্তবায়ন কবে হবে? আপনি তো এরশাদ করেছেন, আমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবো এবং ওমরাহ করবো।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ আমার স্বপ্ন অবশ্যই সত্য, কিন্তু আমি একথা বলিনি যে, এ বছরই আমরা ওমরাহ করবো, এ বছর না হলেও আমার স্বপ্ন অবশ্যই সত্য হবে এবং আমরা অবশ্যই ওমরাহ সম্পাদন করবো।

বস্তুতঃ পরবর্তী বছরই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওমরাহ করেছিলেন এবং তাঁর স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীর জিলক্বদ মাসে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কাশরীফ রওয়ানা হন,"জুলহোলায়ফা" নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ওমরার এহরাম বাঁধেন। কোরবাণীর

১। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৮, পৃষ্ঠা- ১০৩

জন্যে ষাটটি উষ্ট্র নেয়া হয়। এরপর "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলে এ পবিত্র কাফেলা মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হয়। "জাহ্রান" নামক স্থানে পৌঁছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ এবনে সালমা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে কয়েকজন অশ্বারোহীকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে অগ্রবর্তী দল হিসেবে প্রেরণ করেন। এ অবস্থা দেখে মোশরেকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা ধারণা করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তখন তারা দ্রুত মক্কায় গিয়ে এ সম্পর্কে মক্কাবাসীকে সতর্ক করলো। এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "মাররুজ জাহ্রান" নামক স্থানে পৌঁছে তরবারি ব্যতীত সকল হাতিয়ার "বতনে ইয়াযেজ" নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং শর্তানুযায়ী তরবারি খাপে ঢুকিয়ে নেন। পথিমধ্যে কোরায়েশদের দূত মকরজ এবনে হাফস তাঁর খেদমতে হাজির হয় এবং আরজ করে, হুজুর, আপনি তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেন, কি হয়েছে? তখন সে বললো, আপনি তো তীর এবং বর্ষা নিয়ে আসছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, না, সেগুলোতো আমি ইয়াজেয নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি, তখন মকরজ বললো আপনার নিকট সর্বদা আমরা কল্যাণেরই আশা করি।

এদিকে মক্কার কাফেরদের সর্দারদের সকলেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরের কারণে মক্কা ত্যাগ করে চলে যায়, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হবে মক্কা শরীফে, এ অবস্থা তাদের জন্যে সহনীয় ছিলনা। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যারা মক্কা শহরে ছিল, তারা রাস্তার পার্শ্বে বা বাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সে পবিত্র কাফেলা, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় দল-তথা খোদায়ী ফৌজকে নয়ন ভরে দেখছিল, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "কোসওয়া" নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পাঠ করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা আনসারী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর রজ্জু ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং এ কবিতা পাঠ করছিলেনঃ

بسم الذى لا دين الا دينه = بسم الذى محمد رسوله

"সে আল্লাহ পাকের নামে, যাঁর দ্বীন ব্যতীত কোন দ্বীন গ্রহণীয় নয়, আর সেই আল্লাহ পাকের নামে, যাঁর রসূল হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম"।

خلوا بنى الكفار عن سبيله = اليوم نضربكم على تأويله

"হে কাফেরের সন্তানেরা! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পথ থেকে সরে দাঁড়াও, আজ তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর আমরা তোমাদের প্রতি আঘাত হানবো"।

মসনদে আহমদে রয়েছে, ওমরার এ সফরে যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "মাররুজ জাহরানে" পৌছলেন, তখন কাফেররা বলতে লাগলো "এরা দুর্বলতার কারণে চলাফেরাও করতে পারেনা", তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেনঃ আপনি অনুমতি দান করলে আমরা যানবাহনের দু'একটি পশু জবেহ করতে পারি, তার গোশত খেতে পারি এবং তার সুরবা পান করতে পারি, এভাবে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে মক্কায় যেতে পারি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ না, এমন কাজ করোনা; বরং তোমাদের কাছে যা খাবার আছে, তা একত্রিত কর। অবশেষে তাই করা হলো এবং দস্তরখান বিছানো হলো। সকলে একত্রিত হয়ে খেতে বসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বরকতের দোয়া করলেন, তাঁর দোয়ার কারণে খাবারে এত বরকত হলো যে, সকলে তৃপ্তি সহকারে আহার করার পরও প্রত্যেকে পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সরাসরি বয়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গণে পৌছে গেলেন, তিনি তিনদিন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবস্থান করলেন এবং চুক্তি মোতাবেক তিনদিন পর মদীনা মনোয়ারা রওয়ানা হয়ে গেলেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে "ইনশাআল্লাহ" শব্দটি শর্ত হিসেবে নয়, বরং বক্তব্যের নিশ্চয়তা বিধান ও বিষয়টির উপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۭ

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি হেদায়েত এবং সত্যধর্ম নিয়ে তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন'।

সার্বজনীন ধর্ম ইসলাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য ও সঠিক ধর্ম নিয়ে এসেছেন, তাঁর

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা- ৬৮

বিজয় অবশ্যম্ভাবী, কেননা ইসলাম পরিপূর্ণ, যুক্তিসংগত, যুগোপযুগী, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত, সার্বজনীন জীবন বিধান। তাই ইতিপূর্বে যত আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যত ধর্ম প্রচলিত হয়েছে, সবই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ ঐতিহাসিক ঘোষণাই স্থান পেয়েছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, পবিত্র কোরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, সমস্ত আসমানী গ্রন্থে যা কিছু আছে সবই রয়েছে পবিত্র কোরআনে, এর উপর এতে বাড়তি অনেক কিছুও রয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সমস্যা দেখে দেবে, তার সমাধান পবিত্র কোরআনেই রয়েছে, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআনের অবতরণের পর পৃথিবীতে একটি সত্য ধর্মই রয়েছে, আর তা হলো ইসলাম, এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের দরবারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে কোন ব্যক্তি সত্য ধর্ম লাভ করতে পারেনা, অতএব, কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম, আর একমাত্র অনুসরণীয় আসমানী গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন। এতদ্ব্যতীত, সব কিছুই রহিত, বাতিল ঘোষিত এবং বর্জনীয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, ইতিহাস সাক্ষী! ইসলামের অভ্যুত্থান কালে যত জাতি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সকলেই পরাজিত হয়েছে। সর্ব প্রথম আরবের মোশরেকরা বারে বারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের সকল অপচেষ্টার অবসান ঘটেছে এবং আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, এরপর ইয়ামামাবাসীরা মুরতাদ এবং ভুয়া নবুওয়তের দাবীদার হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আমলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং বাতিলপন্থীরা পরাজিত হয়, সত্য ধর্ম বিজয়ী হয়। এভাবেও আরো একবার আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার বাস্তবায়ন হয়।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয় এবং আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়।

এরপর উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে একদিকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই আলোচ্য আয়াতের ঘোষণার বাস্তবায়ন হয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাও লিখেছেন, শেষ জমানায় যখন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরা দুনিয়ার সকল বাতিল ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ করবেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করবেন, সে সময় পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মের অস্তিত্বই থাকবেনা, হয়তো আলোচ্য আয়াতে সে দিনের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

"আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট"।

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন হোদায়বিয়ার পর মসজিদুল হারামে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি, তা এক বছর পরই বাস্তবে রূপায়িত হয়, এরপর মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় এবং তারপর মাত্র দু'বছর পর অর্থাৎ দশম হিজরীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের সময় সমগ্র আরবে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর এসব কিছুর সত্যতার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ পাকই, আর তাঁর সাক্ষ্যের পর কারো সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজনই থাকেনা।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۡ سِيْمَاهُمْ فِىْ
وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِى
الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى
عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

তরজমা

(২৯) মোহাম্মদ আল্লাহ পাকের রসূল, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে অতীব বিনম্র-হৃদয়, সহানুভূতিশীল। তুমি দেখবে তাদেরকে রুকু করছে, সেজদারত রয়েছে, তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করছে, সেজদার কারণে তাদের চেহারাতেই ফুটে উঠেছে তাদের পরিচয়। তাদের এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে তওরাতে এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ প্রথমে তার অংকুর বের করে, এরপর তার কোমর সুদৃঢ় হয়। ক্রমে তা তার পায়ের উপর দাড়ায়, (ফলে) চাষীর মনে আনন্দ দেয়, তাদের (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথীদের) অবস্থাও তদ্রুপ, আল্লাহ পাক মোমেনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তর পুড়িয়ে ফেলতে চান। যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাগফেরাত এবং মহা পুরস্কারের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে, যেন সকল বাতিল ধর্মের মোকাবেলায় সত্য ধর্মকে তিনি বিজয়ী করেন। এভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী, তাঁর বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বের কথা

ঘোষণা করেছেন।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই আল্লাহর রসূল, এ ঘোষণার কারণ হলো, হোদায়বিয়ার চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করার সময় হযরত আলী (রাঃ) শিরোণাম লিখেছিলেন এভাবে, "এই দলিল আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার কোরায়েশদের মধ্যে"। কিন্তু কোরায়েশের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হলো এ মর্মে যে, আমরা যদি তাঁকে আল্লাহর রসূল মেনেই নিলাম, তবে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শান্তি চুক্তির প্রয়োজনই বা কোথায়? অতএব, লিখতে হবে, "এই দলিল মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ এবং কোরায়েশদের মধ্যে"।

যেহেতু শান্তিই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাম্য, তাই তিনি শান্তির বৃহত্তর স্বার্থে "রসূলুল্লাহ" শব্দের স্থলে মোশরেকরা যা বলে তাই লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

"মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ পাকের রসূল" একথার তাৎপর্য হলো এই যে, হে রসূল! মক্কার মোশরেকরা আপনাকে আল্লাহ পাকের রসূল মানে না, তাতে কিছু যায় আসেনা, আমি সারা বিশ্বে সর্বকালের জন্যে ঘোষণা করছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল। মোশরেকদের না মানায় কোন ক্ষতি নেই, কেননা যাঁর রসূল তিনিই ঘোষণা করছেন যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, আর এ ঘোষণা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ পবিত্র নাম দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সারা বিশ্বের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে রাখছে।

একবার হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)। আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলছেন যে, আমি এ ব্যবস্থা করে দিয়েছি, পৃথিবীতে যেখানে আমার কথা স্মরণ করা হবে, সেখানে আপনারও উল্লেখ করা হবে। এজন্যে আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"(হে রসূল!) আমি আপনার চর্চা বলুন্দ করে দিয়েছি"।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

আর যারা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, কাফেরদের প্রতি তারা অত্যন্ত কঠোর, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে তারা খুবই সহানুভূতিশীল, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"হে নবী! কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"আর যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে"।

অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য হলো যুদ্ধরত কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠোর থাকা, আর মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, অতীব বিনম্র চিত্তের অধিকারী থাকা, অবশ্য যে সব কাফের যুদ্ধরত নয়; বরং শান্তি প্রিয়, তাদের সঙ্গে মুসলমানগণ সদয় ব্যবহার করেন।

বোখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলিত হয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করেনা এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনা সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি শুনেছি, হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হতভাগা ব্যতীত কারো অন্তর থেকে দয়া সরিয়ে নেয়া হয়না।

হযরত উসামা এবনে জায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের বন্দাদের মধ্যে যারা মানুষের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করেন।[১]

আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

তারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্র চিত্ত, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাদের বৈশিষ্ট্য।

মূলতঃ আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, যারা ঈমান বিরোধী তথা কাফেরদের ব্যাপারে তারা হয় অত্যন্ত কঠোর, আর এর পাশাপাশি মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক হয় অত্যন্ত ঘণিষ্ঠতর। পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ পায় তাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতি স্তরে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে যারা ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে দু'টি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল।

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

'তুমি দেখবে তাদেরকে কখনো রুকু অবস্থায়, আর কখনো সেজদারত', কেননা তারা একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করে।

তফসীরকারগণ এ কথাটির আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা অধিকাংশ সময়ই নামাজে মশগুল থাকেন, এজন্যে তুমি তাদেরকে দেখবে, কখনো রুকুতে এবং কখনো সেজদারত অবস্থায়, কেননা নামাজ হলো মোমেনদের মেরাজ।

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

সাহাবায়ে কেরামের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের দান এবং সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণকারী ছিলেন। তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, জীবনের যাবতীয় কাজ তাঁরা এ উদ্দেশ্যকে সন্মুখে রেখেই করতেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ তাঁরা

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ১০৩

করতেন না, প্রকৃতপক্ষে এটিই মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য যে, শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁরা যাবতীয় কাজ করেন এবং আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তার সওয়াব আশা করেন, আর মোমেন বন্দার আমলের বদলা হলো জান্নাত, যা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করবেন।

এবাদতের কারণে চেহারা নূরানী হয়

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

'সেজদার কারণে তাদের চেহারাতেই তাদের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), আতা এবনে আবি রুবাহ, রবি এবনে আনাস (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অধিক পরিমাণে নামাজ আদায়ের কারণে দুনিয়াতেই তাদের চেহারা নূরানী হয়।

শহর এবনে হাওসাব বলেছেন, এর অর্থ হলো, আখেরাতে তাদের দেহের সেজদার স্থান সমূহ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় জোতির্ময় হবে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো, তাদের চেহারায় বিনয় এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তা প্রকাশ্যে দেখা যাবে।

মুজাহেদ (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, রাত্রি জাগরণের কারণে তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মোমেনদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন থাকার তাৎপর্য হলো তাঁদের চরিত্র মাধুর্য।

হযরত মনসুর (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-কে বলেছেনঃ আমার ধারণা মতে, এটি হলো নামাজী ব্যক্তির ললাটে সেজদার চিহ্ন।

পূর্বকালের বুজর্গানে দ্বীন বলেছেন, যারা গভীর রাতে নামাজ আদায় করে, তাদের চেহারা নূরানী হয়ে যাবে।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ নেক আমলের কারণে মানব অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, আর সে নূরের কারণে চেহারা জ্যোতির্ময় হয়, আর্থিক সচ্ছলতা আসে, এমন ব্যক্তিদের জন্যে মানুষের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, মানুষ যখন তার অন্তরের সংশোধন করে এবং গোপনে সৎকাজ করে, তখন আল্লাহ্ পাক তার চেহারায় নেকী প্রকাশ করে দেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মনের দর্পণ হলো চেহারা, মানব মনের অবস্থাই তার চেহারায় প্রকাশ পায়। মোমেন ব্যক্তি যখন আত্মসংশোধন করে তথা মনকে সুন্দর করে, তখন আল্লাহ পাক তার প্রকাশ্য অবস্থাকেও মানুষের সন্মুখে সুন্দর করে দেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার অন্তরের সংশোধন করে, আল্লাহ পাক তার চেহারাকে সুন্দর করে দেন। আলোচ্য আয়াতে একথারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যে, "সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় তাদের সেজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়"।

সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত ছিল সঠিক, আমল ছিল উত্তম, যারাই তাঁদেরকে দেখত, তাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামের মনের পবিত্রতা প্রকাশ পেত। তাঁদের চাল-চলন, কথাবার্তা, তাঁদের জীবন ধারা, কর্মপন্থা দেখে মানুষ খুশী হতো এবং তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হতো।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, যে সাহাবায়ে কেরাম সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, সেখানকার খ্রীষ্টানরা তাঁদের চেহারা দেখেই চিৎকার দিয়ে বলে উঠত, আল্লাহর শপথ! এঁরা ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীদের চেয়েও উত্তম।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۖ

'তৌরাতে সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে'।

আহলে কেতাবগণ সাহাবায়ে কেরামকে দেখেই চিনতে পারতো যে, এঁরা হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামকে তাঁদের চেহারার নূর এবং তাকওয়া পরহেজগারী প্রসূত চাল-চলনের দ্বারা মানুষ চিনে ফেলত। তাঁদের ঈমান, তাকওয়া পরহেজগারী. তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতো।

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوقِهِ

আর তাঁদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ইঞ্জিলেও, তুলনা করা হয়েছে তাঁদেরকে ফসলের একটি চারা গাছের সঙ্গে, ঐ চারা গাছটি প্রথমে অংকুরিত অবস্থা থেকে

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং শক্ত ও মজবুত হতে থাকে। এভাবে একদিন সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ায়। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও তদ্রুপই, প্রথমে একজন, এরপর দু'জন, এরপর ধীরে ধীরে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, আর এ বৃদ্ধি পাওয়া শত বাধা সত্বেও অব্যাহত থাকে, ফলে একদিন ঐ চারা গাছটিই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় তথা একজন দু'জন করে একটি বিরাট শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত হয়। উন্নত আদর্শের অধিকারী, আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক এই জাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে চারটি বাক্য দ্বারা চারজন খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যথাক্রমে اخرج شطاه দ্বারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, فازره দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-কে এবং فاستغلظ দ্বারা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে ও فاستوى দ্বারা হযরত আলী (রঃ) এর খেলাফতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে দ্বীন ইসলামের ক্রমোন্নতির কথা বর্ণনা করেছেন এবং এ উন্নতি চারটি ভাগে বিভক্ত, যেমন ফসলের উন্নতির ক্ষেত্রে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তর মাটির বুক চিরে চারা বের হওয়ার, আর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলামের সূচনাকাল এ অবস্থারই অনুরূপ ছিল, অত্যন্ত দূর্বল অবস্থা ছিল সেদিন, এমনকি নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করারও অধিকার ছিলনা। আলোচ্য আয়াতের كزرع اخرج شطاه দ্বারা সে অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে।

যেভাবে একটি মসৃণ চারা অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, হিজরতের পূর্বে মুসলমানগণ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তেমনি দূর্বল অবস্থায় ছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে ঐ চারা গাছটি অপেক্ষাকৃত মজবুত হয়ে যায়, যা দ্বারা আশা করা যায় যে, ঝড় তুফানে বা কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে বিনষ্ট হবেনা; বরং ঐ চারা গাছটি একটি বৃক্ষে পরিণত হবে। এ অবস্থা হিজরতের পর হয়েছিল, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করে চলে যান এবং কাফেরদের সঙ্গে একের পর জেহাদ শুরু হয়ে যায়, তখন ইসলাম একটি শক্তিতে পরিণত হয়, একটি ছোট–খাট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় আর এ অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে فازره শব্দ দ্বারা।

আর তৃতীয় স্তর হলো সে সময় যখন বৃক্ষটি আরো মজবুত এবং আরো শক্তিশালী হয়ে পড়ে, আর এ অবস্থার বিবরণই রয়েছে فاستغلظ শব্দের মধ্যে। আর

মুসলমানদের এ অবস্থা ছিল প্রথম দু' খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে, কেননা তখন পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়।

আর চতুর্থ স্তর হলো, সে সময় যখন বৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে যায়। সে অবস্থা ছিল হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর আমলে, যখন সারা বিশ্বে ইসলাম একটি শক্তিতে পরিণত হয়। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কর হিসেবে বহু অর্থ-সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা মনোওয়ারায় প্রেরিত হতে থাকে।

তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলীই আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।

আর الَّذِينَ مَعَهُ বাক্য দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, কেননা তিনিই সর্বদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন।

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর বলে) হযরত ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত বিনম্র) বাক্য দ্বারা হযরত ওসমান (রঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا (তুমি দেখবে তাদেরকে রুকু করতে এবং সেজদারত অবস্থায়)এর দ্বারা হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।১

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيمًا

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাগফেরাত এবং মহান পুরস্কারের।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ ফজিলত এবং উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, পৃথিবীর যে কেউ প্রকৃত ও খাঁটি ঈমানদার হবে এবং সে ঈমান মোতাবেক নেক আমল করবে, তাদের জন্যে মাগফেরাত এবং মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ পাকের কথায় কোন পরিবর্তন হয়না, এটি তাঁর অমোঘ বিধান।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন,কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৪৩৭-৩৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১০), পৃষ্ঠা- ৫৭৪-৭৫

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা হুজুরাত

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا
اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ② اِنَّ
الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③ اِنَّ
الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) হে মোমেনগণ! আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়োনা এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন, তিনি সব কিছুই জানেন।

(২) হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু

করোনা, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলোনা, কেননা এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(৩) নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসূলের সন্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলে, তারা সে সব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেজগারীর জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান পুরস্কার।

(৪) (হে রসূল!) নিশ্চয় যারা কক্ষের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই কান্ডজ্ঞান নেই।

সূরা হুজুরাত প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ। এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা হুজুরাত মদীনা মনোওয়ারায় নাজিল হয়েছে। এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের (রাঃ) অনুরূপ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

এ সূরায় ১৮টি আয়াত, ৩৪৩টি বাক্য ও ১,৪৭৬টি অক্ষর রয়েছে।[২]

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা হুজুরাত তেলাওয়াত করছে, তবে সে বিবদমান মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।

এ সূরার আমল

যদি কেউ সূরা হুজুরাত লিপিবদ্ধ করে গৃহের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে, তবে সে গৃহে জ্বীন ভূত আসবেনা। যদি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে তা ধৌত করে কোন মাকে পান করানো হয়, তবে তার দুধ বৃদ্ধি পায় এবং যদি সে অন্তসত্বা হয়, তবে তার গর্ভস্থ সন্তান নিরাপদ থাকে।

পটভূমি

পূর্ববর্তী সূরায় হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে,

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৯২
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা- ৪৩৫

খায়বরের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জেহাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিজয় বহন করে এনেছে। এরপর সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মোমেনগণকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাঁর উচ্চতম শান এবং মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রিয়তম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কথা-বার্তা বলার নিয়ম-নীতির-শিক্ষা এতে রয়েছে। এরপর এ সূরায় মুসলমানদের পরস্পরের প্রীতি বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথ ও পন্থা শেখানো হয়েছে। পরস্পরের মধুর সম্পর্ক রক্ষা করার সঠিক ও বাস্তব পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের এবং মানবতার মান উন্নয়নের নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মনকে আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের কারণে তাঁরা আত্মসংশোধনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

তফসীরুল কোরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَ
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'হে মোমেনগণ! (আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়োনা এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কথা শ্রবণ করেন। আর তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন'।

শানে নজুল

ইমাম বোখারী (রঃ) এবনে জোরায়জের সূত্রে আবু মোলায়কার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেছেন, বণী তমীমের একটি কাফেলা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ কা'কা এবনে মা'বাদকে

তাদের আমীর নিযুক্ত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ না, বরং আকরা' এবনে হাবেসকে তাদের নেতা নিযুক্ত করুন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, আপনি তো আমার বিরোধিতা করতে চান। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমার উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা নয়। এভাবে উভয়ের কথা বাড়তে থাকে এমনকি, তাঁদের কণ্ঠস্বরও উঁচু হয়ে যায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কিছু লোক কোরবাণীর ঈদের দিন নামাজের পূর্বেই কোরবাণী দিয়ে ফেলেছিল, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনগণকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। হে মোমেনগণ! তোমরা কখনো কোন কথায় বা কাজে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের আগে বাড়তে চেষ্টা করোনা, অর্থাৎ তাঁদের আদেশ নিষেধকে ডিঙ্গিয়ে কোন কাজ করোনা বা এমন কোন কাজ করোনা, যা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের মর্জির খেলাফ হয়।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জেহাদ এবং দ্বীনের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুমের পূর্বে তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের ফরমান জারী হওয়ার পূর্বে কোন ব্যাপারে তোমরা কথায় বা কাজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার নিমিত্তে এ আয়াতে আল্লাহ পাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলের কথার আগে কোন কথা বলা আল্লাহ পাকের কথার আগে কথা বলারই নামান্তর, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এত বেশী যে তাঁর তাজীম যেন আল্লাহ পাকেরই তা'জীম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেআদবী আল্লাহ পাকের সঙ্গে বেআদবীর অন্তর্ভূক্ত।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৯২
তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৮, পৃষ্ঠা- ১১০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা- ১৩-১৪

যেমন সূরায়ে ফাতহে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

"(হে রসূল!) নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বয়আত করে, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের হাতেই বয়আত করে"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করাই আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা, আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের আগে বাড়তে চেষ্টা করোনা", নিজের অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিওনা; বরং নিজের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের ইচ্ছা ও মর্জিকে কার্যকর কর, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ কর, শুধু এ পন্থাতেই তোমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এবনুল মুনজের হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কোরবাণীর দিন কিছু লোক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বেই কোরবাণী করেছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার কোরবাণী করার আদেশ দিয়েছেন।

এবনে আবিদ্দুনিয়াও এ হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন, তবে তাতে এতটুকু কথা সংযোজিত রয়েছে যে, তারা নামাজের পূর্বেই কোরবাণী করে ফেলেছে।

হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরবাণীর দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি এরশাদ করলেন, সর্ব প্রথম আমরা নামাজ আদায় করবো, এরপর ফিরে এসে কোরবাণী করবো। যে এ পন্থা অবলম্বন করলো, সে আমার পথ পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে, যে নামাজ আদায়ের পূর্বেই কোরবাণী করলো, সে কোরবাণী করেনি, তবে নিজের পরিবারবর্গের জন্যে কিছু গোশতের ব্যবস্থা করেছে, কোরবাণীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত জুন্দব এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, কোরবাণীর দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ নামাজ আদায় করেন, এরপর ভাষণ দান করেন, পরে কোরবাণী করেন। তিনি এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে কোরবাণী করে, সে যেন তার স্থলে পুনরায় কোরবাণী করে। এ হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম মোহাম্মদ

(রঃ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এ মন্তব্য করেছেন যে, ইমামের নামাজের পূর্বে কোরবাণী করা জায়েয নয়।

তেবরানী "আল আওসাতে" হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক রমজানের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে এমনকি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রোজাব্রত পালনের পূর্বেই রোজা রাখা আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'হে মোমেনগণ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রনী হয়োনা'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রজমানের মাসে আমার পূর্বে তোমরা রোজা রাখা শুরু করোনা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোজা রাখা বন্ধ করবে।

এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেনঃ তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু লোক বলেছিলেন, যদি অমুক বিষয়ে আল্লাহ পাকের কোন হুকুম নাজিল হতো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়োনা এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি অবগত এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল"।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর নবীর দরবারের আদব শিক্ষা দিয়েছেন। বিশেষতঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

মোমেনগণকে এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মাআজ (রাঃ)-কে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দূত নিযুক্ত করে ইয়ামন প্রেরণ করছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিসের ভিত্তিতে আদেশ দেবে? তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনের আলোকে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যদি পবিত্র কোরআনে তা না পাও? হযরত মাআজ (রাঃ) আরজ করলেন, তবে সুন্নতে রসূলে সমস্যার সমাধান খুঁজবো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাতেও না পাও? হযরত মাআজ (রাঃ) আরজ করলেন, তবে ইজতেহাদ করবো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মাআজ (রাঃ)-এর বক্ষে তাঁর মোবারক হস্ত স্থাপন করে বললেন, "আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি আল্লাহর রসূলের দূতকে এমন তৌফিক দান করেছেন, যাতে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট হন" (আবু দাউদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)।

এ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মাআজ (রাঃ) কোরআনে করীম এবং সুন্নত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর নিজের রায় এবং ইজতেহাদের উল্লেখ করেছেন। এটিই হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (অনুমতির) পূর্বে (কোন বিষয়ে) অগ্রণী না হওয়া। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই তাগিদ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কখনও কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন কথা বলবেনা।

উফী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার পূর্বে কোন কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, কোন বিষয়ে যতক্ষণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু না বলেন, ততক্ষণ তোমরা নীরব থাক।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন এবং তাঁর রসূলের হাদীস ব্যতীত তোমরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোনা।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কোন কথায় বা কাজে আল্লাহ পাকের মহান বাণী এবং রসূলের কথা ব্যতীত তোমরা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করোনা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ইমামের পূর্বে তোমরা দোয়া করোনা।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু কিছু কিছু লোক বলতো, অমুক বিষয়ে এমন আদেশ হলে ভাল হতো, আল্লাহ্ পাক তাদের এমন কথা অপছন্দ করেছেন। তাই এ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়োনা, কেননা আল্লাহ্ পাক তোমাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করছেন এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কেও তিনি অবগত রয়েছেন।[1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

'হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করোনা, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলোনা, কেননা এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে'।

শানে নজুল

এ আয়াত নাজিল হয়েছে সাবেত এবনে কায়েস এবনে সাম্মাসের সম্পর্কে, তাঁর কণ্ঠস্বর স্বভাবগত ভাবেই উঁচু হতো, যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একাধারে কয়েকদিন আসেননি, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, আমি সাবেত এবনে কায়েস সম্পর্কে আপনাকে বলবো, সে ব্যক্তি হযরত সাবেতের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, তিনি মাথা নত করে বসে রয়েছেন, ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থা কি? হযরত সাবেত এবনে কায়েস বললেন, অবস্থা খুবই মন্দ, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলতাম, এ কারণে আমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে, আমি দোজখী হয়ে গেছি। ঐ ব্যক্তি এসে এসব কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে বল যে, সে দোজখী নয়; বরং জান্নাতী।

এ আয়াতের মর্মবাণী

আয়াতের মর্মবাণী হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলোনা, যখন তাঁর সঙ্গে কথা বল, তখন অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বল, তোমরা একে অন্যের সঙ্গে যেভাবে কথা বল, বা একে অন্যকে ডাক, খবরদার! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কখনো এমন আচরণ করোনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা বলতেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) এত নিম্ন স্বরে কথা বলতেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব কথা শ্রবণ করতেও পারতেন না, দ্বিতীয় বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হতো।

এবনে জরীর সাবেত এবনে কায়েস সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করে একথাও লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আসেম (রাঃ) কে আদেশ দিয়েছেন যে, সাবেতকে ডেকে আন, আদেশ অনুযায়ী হযরত আসেম (রাঃ) হযরত সাবেত (রাঃ) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডেকেছেন। এরপর উভয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাবেত! তোমার ক্রন্দণের কারণ কি? তিনি আরজ করলেন, আমার স্বর উঁচু, আমার ভয় হয়, এ আয়াত আমার সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় জীবন যাপন করবে এবং শাহাদতের মৃত্যু লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত সাবেত (রাঃ) আরজ করলেন, আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সুসংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্মুখে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলবোনা।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসূলের সম্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলে, তারা সে সব লোক,

যাদের অন্তরকে আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেজগারীর জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান পুরস্কার'।

হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর দরবারের আদব রক্ষার পুরস্কার

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদার কারণে তাঁর প্রতি পূর্ণ তাযীম এবং সম্মান প্রদর্শন কল্পে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিম্নস্বরে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে দু'টি সুসংবাদ রয়েছে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

(এক) আল্লাহ পাক তাঁদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারীর জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন।

ইমাম বয়জাভী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাঁদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারীর প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। যেভাবে স্বর্ণকে কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব তমীজ রক্ষা করে, নিম্নস্বরে তাদের আরজী পেশ করে, তাদের অন্তরকেও আল্লাহ পাক আকওয়া পরহেজগারীর জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছেন, পাপাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে ফেলে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁরা বিপদাপদে সবর অবলম্বন করেছেন আর এভাবে তাঁদের তাকওয়া ও পরহেজগারীর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। আর যেহেতু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাযীম করা, তাঁর দরবারের আদব রক্ষা করা, তাঁর সন্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলা আল্লাহ পাক অত্যন্ত পছন্দ করেন, তাই তাঁদের জন্যে দ্বিতীয় সুসংবাদ হলোঃ

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيمٌ

(২) 'তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান পুরস্কার'। দুনিয়ার জীবনে তাদের দ্বারা যেসব গুণাহ হয়েছে, তা আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন। এটিই হলো মাগফেরাত, আর আখেরাতে আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করবেন মহান পুরস্কার,

আর তা হলো জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত, যা কোন দিন কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তর কল্পনাও করেনি।

অতএব, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাযীম করে, তাঁর মহান দরবারের আদব রক্ষা করে চলবে, তাঁর সন্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলবে, তাদের জন্যে রয়েছে এসব নেয়ামত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) দেখলেন, দু' ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলে, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান যে, তোমরা কোথায় আছ? এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ স্থানের অধিবাসী? তারা বললো, তায়েফের। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনা মোনাওয়ারার অধিবাসী হতে, তবে আমি তোমাদেরকে পূর্ণ শাস্তি দিতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব রক্ষা করার আদেশ শুধু তাঁর জীবদ্দশার জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং তাঁর ওফাতের পরও এ আদেশ বহাল রয়েছে। তাঁর রওজা পাকের নিকট উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ, কেয়ামত পর্যন্ত এ আদেশ বহাল থাকবে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) লিখেছেন, চারটি বিষয় শীর্ষতম, বিশেষ সম্মানের অধিকারী। (১) আল্লাহ পাকের কালাম, পবিত্র কোরআন (২) প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম (দঃ) (৩) কাবা শরীফ (৪) নামাজ।

যারা এ শীর্ষতম বিষয় সমূহের সম্মান রক্ষা করে চলবে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারী দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করে দেবেন।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারীর জন্যে আল্লাহ পাক যাচাই করে নিয়েছেন।

হযরত রসূলে করীম (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হলো

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত সাবেত এবনে কায়েস (রাঃ) কে আমাদের সন্মুখে আসা-যাওয়া করতে দেখতাম এবং তাঁকে "জীবিত জান্নাতী" মনে করতাম। তাঁর সম্পর্কে আলোচ্য

আয়াত নাজিল হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেনঃ "তুমি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করবে এবং জান্নাতে চলে যাবে"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ সুসংবাদ বাস্তবায়িত হয় প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে অনুষ্ঠিত ইয়ামামার যুদ্ধে। নবুওয়তের ভুয়া দাবীদার মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামায় যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের আশংকা দেখা দেয়, তখন হযরত সাবেত এবনে কায়েস (রাঃ) হযরত সালেম (রাঃ)-কে বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তো আমরা এভাবে যুদ্ধ করতামনা, এরপর তাঁরা উভয়ে তওবা করলেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে হযরত সাবেত (রাঃ) শাহাদত বরণ করলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়ে দেখা দিল।

স্বপ্নযোগে হযরত সাবেত (রাঃ)-এর ওসিয়ত

তাঁর শাহাদতের কয়েক দিন পর একজন সাহাবী তাঁকে স্বপ্নে দেখেন, ঐ সাহাবীকে তিনি বলেন, আমার লৌহ বর্মটি এক ব্যক্তি আমার দেহ থেকে বের করে রণাঙ্গনের এক প্রান্তে রেখে দিয়েছে, সেখানে একটি অশ্ব বাধা রয়েছে। আর বর্মটির উপর একটি পাথরের পাত্র রয়েছে। তুমি খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে বল, আমার বর্মটি যেন সে ব্যক্তি থেকে নিয়ে নেয়, আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলে, আমার কিছু ঋণ আছে, তা যেন আদায় করা হয়। আর আমার অমুক গোলামকে আমি আজাদ করলাম। ঐ সাহাবী হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে এ খবর দিলেন, তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এ ওসিয়তের বর্ণনা দিলেন, তিনি হযরত সাবেত (রাঃ) এর ওসিয়ত পূর্ণ করলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি ব্যতীত স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত আর কারো ওসিয়ত এভাবে পূর্ণ হয়েছে কি-না তা আমার জানা নেই।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় যারা কক্ষের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশের কান্ডজ্ঞান নেই'।

শানে নজুল

তেবরাণী এ বর্ণনা সংকলন করেছেন, হযরত জায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)

বর্ণনা করেছেনঃ কিছু গ্রাম্য লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে ডাকতে আরম্ভ করে এবং তাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে আসার জন্যে বলতে থাকে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন হে রসূল! যারা এভাবে আপনাকে ডাকে তাদের অধিকাংশ লোকেরই কান্ডজ্ঞান নেই, কোথায় কি আচরণ করতে হবে সে জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। তারা ছিল যাযাবর, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা। তবে আয়াতে اكثرهم لا يعقلون বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি, আদব-তমীজ ছিল না, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, তাদের সকলের এমন অবস্থা ছিল না, কিছু লোক তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ছিল, তারা এমন আচরণ পছন্দ করেনি।

সা'লাবী হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কক্ষের বাইরে থেকে যে দু' ব্যক্তি উচ্চস্বরে ডাক দিয়েছিলেন, তারা হলেন উয়াইনাহ এবনে হুসাইন এবং আকরা' এবনে হাবেস্। এ দু' ব্যক্তি সত্তর জন লোক নিয়ে দ্বিপ্রহরে মদীনা মনোওয়ারা পৌঁছেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় তারা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছে, বাইরে আসুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত বণী তমীম গোত্রের কিছু যাযাবর লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শুরু করে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বাইরে আসার জন্যে বলে, তারা একথাও বলে, আমরা যখন কারো প্রশংসা করি, তবে তা তার জন্যে গৌরবের বিষয় হয়, আর আমরা যখন কারো সমালোচনা করি, তবে তা তার জন্যে দোষনীয় হয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের চিৎকার শুনে বাইরে আগমন করে এরশাদ করলেন, এমন তো শুধু আল্লাহ পাকই, যাঁর তরফ থেকে কারো প্রশংসা হলে তা হয় গৌরবের বিষয়, আর যার সমলোচনা হয় দোষ। ঐ গ্রাম্য ব্যক্তি বললো, আমরা আমাদের গোত্রীয় কবি এবং খতীব নিয়ে এসেছি, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সাবেত এবনে কায়েস (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, ওঠ! তাদের কথার জবাব দাও।

হযরত সাবেত এবনে কায়েস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খতীব ছিলেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি বণী তমীমের কথার জবাব দিলেন। এরপর তাদের গোত্রীয় কবি দন্ডায়মান হলো, সে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলো।

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্যান এবনে সাবেত (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন, তুমি ওঠ এবং তাদের জবাব দাও। হযরত হাস্যান (রাঃ) উঠে জবাব দিলেন। এ অবস্থা দেখে আকরা' এবনে হাবেস তমিমী বললেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সর্ব প্রকার কল্যাণই একত্রিত হয়েছে। আমাদের খতীব কথা বলেছেন, তাঁর খতীবও বক্তব্য রেখেছেন, আমাদের কবি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, তাঁর কবিও জবাব দিয়েছেন, তবে তাঁর কবি উত্তম প্রমাণিত হলো। এরপর ঐ ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলো এবং বললো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ হাদুআন্নাকা রাসুলুহু (আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আমি এ স্বাক্ষ্য প্রদান করি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, ইতিপূর্বে তোমার দ্বারা যে সব গুণাহ হয়েছে, তা মাফ হয়ে গেছে। সে গুণাহগুলোর কারণে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা, অর্থাৎ এসব ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হবেনা। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কিছু নগদ এবং কিছু পোষাক উপহার স্বরূপ দান করলেন। তাদের মধ্যে আমর এবনে আসাম নামক একটি শিশু ছিল। যাকে তারা তাঁদের মালপত্রের কাছে রেখে এসেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকেও অন্যদের সমপরিমাণ দান করলেন। তখন কিছু লোক এ প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে এ শিশুটি অত্যন্ত ছোট, তাকেও পূর্ণ অংশ দেয়া হলো? এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটু চিৎকার শোনা গেলো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করোনা"।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১-২২

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوْۤا
اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿٧﴾ فَضْلًا
مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾

তরজমা

(৫) (হে রসূল!) আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর করতো, তবে তা হতো তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬) হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা তোমরা খুব ভালভাবে যাচাই করে নিও, যাতে করে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, পরে নিজেদের আচরণের জন্যে তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হয়।

(৭) আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের রসূল রয়েছেন, যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলেন, তবে তোমরাই মুশকিলে পড়বে। আল্লাহ পাক ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সুন্দর করে দিয়েছেন। কুফরী, পাপাচার এবং নাফরমানীকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। (যারা এ গুণের অধিকারী হয়) তারাই হয় সৎপথ অবলম্বনকারী।

(৮) এটি আল্লাহ পাকের দান ও অনুগ্রহ, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

আরবের বণী তমীম নামক গোত্রের লোকেরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অসময়ে হাজির হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর কক্ষে বিশ্রামরত ছিলেন এবং তাঁকে কক্ষের পেছন থেকে তারা ডাকতে থাকে। এই আরব বেদুঈনরা সময়ের গুরুত্ব এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের প্রতিটি মুহূর্তের কত গুরুত্ব এবং মূল্য ছিল, তা অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর প্রতি, মানব জাতির দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সম্পর্কে হেদায়েত করাও ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কখনো তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হতো, কখনো তিনি জাতীয় জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে চিন্তিত থাকতেন, এমন অবস্থায় তাঁকে সময়ে অসময়ে বিরক্ত করা কোন অবস্থাতেই সমীচিন ছিল না। অথচ বণী তমীম গোত্রের লোকেরা তাঁকে এমন সময়ে এসে ডাকাডাকি করতে থাকে, যখন তিনি বিশ্রামরত ছিলেন, তাই পূর্ববর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"(হে রসূল!) নিশ্চয় যারা কক্ষের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই কান্ডজ্ঞান নেই"।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

'(হে রসূল!) আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর করতো, আপনার আগমনের অপেক্ষা করতো তবে তাদের জন্যে তা হতো উত্তম'। কেননা, এভাবে বেআদবী হতোনা, আল্লাহর রসূলের তাজীম হতো, তাঁর দরবারের আদব রক্ষা হতো এবং তারা সওয়াব লাভ করতো, তাদের কাজ প্রশংসনীয় হতো।

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, এজন্যে তিনি তোমাদেরকে কোন শাস্তি দেননি, বরং নসিহত করেছেন, কেননা তিনি অত্যন্ত দয়াবান। যেহেতু তাদের এ অন্যায় ছিল অজ্ঞতা-প্রসূত, এজন্যে আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করেছেন, ভবিষ্যতে যেন তারা বা অন্য কেউ এমন অন্যায় আচরণ না করে, তজ্জন্যে আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মুসলিম জাহানের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা খুব ভাল করে যাচাই করে নিও, যাতে করে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, পরে নিজেদের আচরণের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হয়'।

শানে নজুল

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, বণী তমীম গোত্রের লোকেরা যখন যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাই-হে ওয়াসাল্লাম নবম হিজরীর মহররম মাসে হযরত উয়াইনাত এবনে হুসাইনের নেতৃত্বে বণী তমীমের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন।

মোহাম্মদ এবনে ওমরের বর্ণনা মোতাবেক বণী তমীমের যে সব লোককে বন্দী করা হয়, তন্মধ্যে ১১ জন স্ত্রীলোক এবং ৩০টি শিশুও ছিল।

ইমাম আহমদ (রঃ) এর বর্ণনা হলো, হারেস এবনে জেরার খাজায়ী বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই, তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান করেন, আমি ঐ আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়ের আদেশ দিলেন, আমি তা মেনে নিলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল-াইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাব, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের এবং যাকাত আদায়ের জন্যে আহবান জানাব। যে আমার আহবানে সাড়া দেয়, আমি তাদের যাকাত উশুল করবো, আপনি আমার নিকট অমুক সময়ে কোন লোক প্রেরণ করুন, আমার নিকট থেকে সে যাকাত বাবদ ওয়াশীল করা অর্থ আপনার খেদমতে পেশ করবে। একথা বলে হারেস চলে গেলেন এবং যাকাতের অর্থ

একত্রিত করলেন, কিন্তু যখন নির্দিষ্ট সময় এল, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত কোন লোক পৌঁছলনা, তখন হারেস ধারণা করলেন, হয়তো আমার ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট রয়েছেন, এজন্যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে বল-লেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাকাতের অর্থ নেয়ার একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন, তিনি কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করেন না, মনে হয় লোক প্রেরণের ব্যাপারে তাঁর অসন্তুষ্টি কার্যকর হয়েছে, এজন্যে তোমরা সকলে চল, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাকাতের অর্থ নিয়ে হাজির হই।

এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওলীদ এবনে আকাবাকে যাকাতের অর্থ নিয়ে আসার জন্যে হারেসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি রওয়ানা হওয়ার পর ভীত হয়ে ফিরে আসেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন যে, হারেস যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে, এজন্যে আমি পালিয়ে এসেছি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব কথা শুনে এক দল লোক হারেসের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন হারেস নিজ সঙ্গীদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন।

পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাত হলো। হারেস ঐ দলের সম্বর্ধনার জন্যে তাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদেরকে কোথায় প্রেরণ করা হয়েছে? তারা বললেন, তোমার নিকট। হারেস বললেন, কেন? তাঁরা বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট ওলীদ এবনে আকাবাকে প্রেরণ করেছিলেন, সে প্রত্যাবর্তন করে বলেছে যে, হারেস যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে।

হারেস বললেন, না, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলীদকে দেখিনি, আর সে–ও আমার নিকট আসেনি।

যাহোক, তাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ?

তখন হারেস (রাঃ) বললেন, শপথ! সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য

নবী করে প্রেরণ করেছেন, এমন কিছুই হয়নি, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟

"হে মোমেনগণ! যখন তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তখন তা ভালভাবে যাচাই করে নিও"।

বস্তুতঃ এ আয়াতে গুজবে কান না দেয়ার এবং খবরকে সঠিকভাবে যাচাই না করে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে; কেননা খবরের সত্যতা যাচাই না করে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সংঘর্ষ বাধতে পারে, সকল প্রকার অঘটনকে এড়িয়ে চলার প্রকৃষ্ট পন্থা হলো খবরের সত্যাসত্য যাচাই করা, অন্যথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি লোকের মিথ্যা রটনায় অথবা কোন সরল-প্রাণ লোকের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত সংবাদের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিলে অবশেষে নিজেদেরই আক্ষেপ করতে হয়। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে মুসলিম জাতিকে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তির প্রদত্ত খবরে বিশ্বাস করোনা, যে পর্যন্ত না ঐ খবরের সত্যতা ভালভাবে যাচাই কর। পাপাচারী ব্যক্তি যে কোন সময় মিথ্যা বলতে পারে, কিংবা কোন নির্বোধ ব্যক্তি ভিত্তিহীন সংবাদ দিতে পারে। এর ভিত্তিতে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে তা কোন অঘটনের কারণ হতে পারে। এরপর আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত হারেস এবনে জেরার (রাঃ)-এর উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য, হযরত হারেস এবনে জেরার (রাঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত জোয়াইরীয়া (রাঃ)-এর পিতা।[১]

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর আল্লামা বগভী (রঃ)ও এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত ওলীদ এবনে আকাবা এবনে আবি মুয়ীতের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওলীদকে বণীল মুস্তালিক গোত্রের নিকট যাকাত উশুল করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে ওলীদের সঙ্গে বণীল মুস্তালিকের শত্রুতা ছিল। যখন বনীল মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা ওলীদকে প্রেরণের খবর শুনল,

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- ২৬, পৃষ্ঠা- ১৪৪
তফসীরে এবনে কাসীর, পারা- (২৬), পৃষ্ঠা- ৭৬-৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশের সম্মানার্থে তাঁরা ওলীদের সম্বর্ধনায় বের হয়ে আসলো।

এই সময় ওলীদের অন্তরে শয়তান এ প্ররোচনা দিল, তারা তাকে হত্যা করতে চায়, তাই ওলীদ প্রত্যাবর্তন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ বিবরণ দিলেন যে, বণীল মুস্তালিকের লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বণীল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। বণীল মুস্তালিকের লোকেরা যখন জানতে পারল যে, ওলীদ ফিরে চলে গেছে, তখন তাঁরা নিজেরাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার দূত প্রেরণর খবর শ্রবণ মাত্র আমরা তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে বের হয়ে পড়ি, যেন আল্লাহ পাকের যে হক্ব আদায়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা আদায় করতে পারি, কিন্তু যখন আপনার দূত ফিরে আসল, তখন আমাদের আশংকা হলো, হয়তো আমাদের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির কোন খবর ওলীদের নিকট পৌঁছেছে, সেজন্যে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমরা আল্লাহ পাক ও-তাঁর রসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহপাকেরই আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বনীল মুস্তালিকের বক্তব্যের সত্যতায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একীন হয়নি, তাই তিনি খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-কে গোপনে কিছু সৈন্য সহ প্রকৃত সত্য জানার জন্যে প্রেরণ করলেন। আর এ আদেশ দিলেন যে, তুমি সেখানে গমন করে দেখ, তাদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার কোন নিদর্শন আছে কি-না। যদি এমন কোন আলামত পাও, তবে তাদের কাছ থেকে যাকাতের অর্থ গ্রহণ কর। অন্যথায় তাদের সঙ্গে ঐ ব্যবহারই কর যা কাফেরদের সঙ্গে করা হয়। হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) এ হুকুম পালন করলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন মাগরেব এবং এশার নামাজের আজান শ্রবণ করলেন। নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করলেন এবং তাদের মধ্যে আনুগত্য ও কল্যাণ ব্যতীত কোন কিছুই দেখলেন না। হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ) ফিরে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসেক কোন খবর নিয়ে আসে'।

তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ওলীদ এবনে আকাবা সম্পর্কে, তিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তাঁর দ্বারা মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়েছে, তবে এ মিথ্যাবাদিতার কারণ মোনাফেকী নয়; বরং একটি ভুল ধারণা, যেহেতু প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকে ওলীদ এবনে আকাবার সঙ্গে বণীল মুস্তালিক গোত্রের শত্রুতা ছিল, তাই তিনি তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা করেছিলেন। বণীল মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা সদলবলে বের হয়ে এসেছিলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে, কেননা তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি স্বরূপ তাদের নিকট গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব শত্রুতার কারণে তিনি এ ভুল ধারণা করেছেন, তারা সদলবলে বের হয়ে এসেছে তার প্রতি হামলা করতে, এ ভ্রান্ত ধারণার কারণেই তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বণীল মুস্তালিক সম্পর্কে অসত্য বিবরণ দিয়েছেন। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে তাকে "ফাসেক" অভিহিত করা হয়েছে। "ফাসেক" বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে কবীরা গুনাহ করে, আর এমন ব্যক্তিকেও ফাসেক বলা হয়, যে সর্বদা সগীরা গুণাহে লিপ্ত থাকে এবং তওবা না করে। সাহাবায়ে কেরামের সততাপরায়ণ হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তবে তাঁরা কখনো নিঃস্পাপ নন, যেমন নবী রসূলগণ নিঃস্পাপ হন। সাহাবায়ে কেরাম যাবতীয় গুণাবলীর অধিকারী, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের দ্বারা কখনো কোন গুণাহ হবেনা, মানুষ হিসেবে তাঁদের দ্বারাও ভুল-ভ্রান্তি হবে এমনকি, পাপকার্যও হতে পারে, কিন্তু অন্য মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তাঁদের দ্বারা যদি কোন গুণাহ বা ভুল-ভ্রান্তি হয়, তবে তাঁরা অনতিবিলম্বে তওবা করে ফেলেন। আর তওবা মানুষকে সে অবস্থায় পৌছে দেয়, যেন সে গুণাহ করেনি।

হযরত ওলীদ এবনে আকাবা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে ফেলেছেন।

এ পর্যায়ে হযরত হাতেব এবনে আবি বলতাআহ (রাঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার কাফেরদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কা অভিযান সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিলঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

(হে মোমেনগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করোনা।)

হযরত আবু লোবাবা এবনে আবদুল মুনজের (রাঃ)-এর দ্বারা একটি ভুল হয়েছিল। তিনি শুধু যে তওবা করেছেন তাই নয়; বরং তিনি মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেধে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ক্ষমাসূচক আয়াত নাজিল না হয় এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে এসে আমাকে না খুলে দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ অবস্থায়ই থাকবো। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে যদি কোন সাহাবীর দ্বারা কোন অন্যায় হয়েও থাকে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার তওফিক দিয়েছেন এবং ক্ষমাও করেছেন।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হযরত ওলীদ এবনে আকাবা (রাঃ) যখন বণীল মুস্তালিকের মুরতাদ হওয়ার কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তখন কিছু লোক বণীল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সে পরামর্শ গ্রহণ করেননি; বরং সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে তিনি হযরত খালেদ এবনে ওলীদকে বণীল মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন এবং অনুসন্ধানের পর হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ) সঠিক অবস্থার বিবরণ দান করেন। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ

"আর তোমরা জেনে রাখ যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের রসূল রয়েছেন, যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলেন, তবে তোমরাই মুশকিলে পড়বে"।

বস্তুতঃ বণীল মুস্তালিক মুরতাদ হয়েছে, এ খবরের সত্যতা যাচাই না করে যদি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করা হতো, তবে কত বড় গুণাহর কাজ হতো তা সহজেই অনুমেয়, তখন আক্ষেপের কোন সীমা থাকত না। অতএব, আত্মরক্ষার পথ হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ, কেননা তাঁর অনুসরণেই রয়েছে কল্যাণ।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ

'কিন্তু আল্লাহ পাক ঈমানকে তোমাদের প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সুন্দর করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কুফরী, পাপাচার এবং নাফরমানীকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। যারা এ গুণের অধিকারী হয়, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত হয়'।

ঈমান আল্লাহ পাকের দান

দয়াময় আল্লাহ পাক দয়া করেই তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন তোমাদের হেদায়েতের জন্যে, আর আল্লাহ পাক দয়া করেই ঈমানকে তোমাদের অন্তরে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং বেঈমানীকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় এবং অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তোমাদেরকে হেদায়েত লাভের তওফিক দান করেছেন এবং নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিয়েছেন।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের দান এবং নেয়ামত, আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তিনি সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তবে তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং আদেশ হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। অতএব, বন্দার কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ন অনুসরণ করা, কেননা তিনি এক আল্লাহ পাকের কথা মানেন, আল্লাহ পাকের ওহীই তাঁকে পথ নির্দেশ করে, তাই তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

তরজমা

(৯) মোমেনদের দু'টি দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি তাদের এক পক্ষ অন্যের উপর বাড়াবাড়ি করতেই থাকে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দাও এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন।

(১০) মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই-ই, অতএব, তোমরা ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে।

(১১) হে ঈমানদারগণ! এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে,

হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয় সে বিদ্রুপকারীর চেয়ে উত্তম হবে। আর মেয়েরাও যেন একে অন্যকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয় সে বিদ্রুপকারীনির চেয়ে উত্তম হবে। তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করোনা, আর একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকোনা, ঈমান আনয়নের পর মন্দ নামে ডাকা নিতান্ত গর্হিত কাজ। যারা এমন আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তওবা না করে, তারাই প্রকৃত জালেম।

তফসীরুল কোরআন

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যদি ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয় আর ঐ বিবাদ পরস্পরের লড়াইয়ে রূপ নেয়, তবে অন্য মুসলমানদের কর্তব্য হবে, যে কোন মূল্যে সংঘর্ষরত উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া, সন্ধি স্থাপন করা, কিন্তু যদি একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর অত্যাচার অব্যাহত রাখে এবং কোন অবস্থাতেই তারা শান্তি সমঝোতা এবং মীমাংসার পথে না আসে, এমন অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য হবে সম্মিলিত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে, সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে সম্মত হবে এবং জুলুম অত্যাচার বন্ধ করবে, সে মুহূর্তে তাদের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করা কর্তব্য হবে। অতীতের সকল আক্রোশ ভুলে গিয়ে মুসলমান ভাই হিসেবে পরস্পরের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে, মনে রাখতে হবে মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন মোমেনগণের বৈশিষ্ট্য, ঈমানের সোনালী সূত্রে সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ গ্রথিত, তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। এ পবিত্র বন্ধনের সংরক্ষণ একান্ত কর্তব্য, এটি ঈমানের দাবী। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

'মোমেনদের দু'টি দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি তাদের একপক্ষ অন্যের উপর বাড়াবাড়ি করতেই থাকে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে ফিরে আসে'।

শানে নজুল

এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। মদীনা মনোওয়ারায়

আউস ও খাজরাজ নামক দু'টি গোত্র ছিল। প্রাক-ইসলামিক যুগে এ দু'গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। ইসলাম কবুল করার পর তারা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একবার তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয়, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়াত পাঠ করে শোনান, তখন মুসলমানগণ পরস্পর মীমাংসা করেন এবং সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে বিরত হন।

সায়ীদ এবনে মনসুর এবং এবনে জরীর হযরত আবু মালেক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দু'জন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয়, একে অন্যকে গালি দিতে থাকে এবং প্রত্যেকে তার নিজের গোত্রকে ডাকতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বেধে যায়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে জরীর এবনে আবি হাতেম এবং সুদ্দী (রঃ) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এমরান (রাঃ) নামক একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন উম্মে জায়েদ। তিনি তাঁর পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে বাধা দিলেন এবং তাঁকে একটি ইমারতে রেখে দিলেন। স্ত্রীলোকটি তাঁর পিতৃগৃহে সংবাদ দিল। গোত্রীয় লোকেরা এসে তাঁকে ঐ ইমারত থেকে বের করে নিয়ে যেতে লাগল। তখন তাঁর স্বামী স্বগোত্রীয়দেরকে তাঁর সাহায্যের জন্যে ডাকল। তারা এসে স্ত্রীলোকটিকে যেতে বাধা দিল। তখন পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর পেয়ে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন, যিনি এসে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন।

এবনে জরীর এবং আল্লামা বগভী (রঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে দু'জন আনসারী সাহাবীর সম্পর্কে, তাঁদের মধ্যে কারো হক্ব সম্পর্কে ঝগড়া ছিল, তা লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন ঐ আয়াত নাজিল হয়।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- ২৬, পৃষ্ঠা- ১৫০-৫১
তফসীরে এবনে কাসীর, পারা- (২৬), পৃষ্ঠা- ৮০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা-৩১-৩২

فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

'যদি তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায্য ভাবে ফয়সালা করে দাও এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন'।

মুসলমানদের কর্তব্য

বস্তুতঃ সংঘর্ষরত উভয় দলকে আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চলার জন্যে প্রস্তুত করাই হলো প্রথম কাজ, কেননা যদি কেউ আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তবে কোন লড়াই থাকতে পারেনা, আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

আর তোমরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা, যদি তোমাদের মধ্যে একতা না থাকে তবে দুশমনের অন্তরে তোমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ভয়-ভীতি রয়েছে, তা দূরীভূত হয়ে যাবে। অতএব, মুসলমানদের প্রধানতম কর্তব্য হলো, নিজেদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখা। কিন্তু যদি কোন কারণে পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে অন্য মুসলমানের কর্তব্য হলো বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা।

দ্বিতীয়ত, যদি কলহরত দু'দলের এক দল মীমাংসাতে রাজী না হয় এবং অপর পক্ষের প্রতি জুলুম নির্যাতন করতে থাকে, এমন অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য হবে সম্মিলিত ভাবে ঐ দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে হলেও তাকে লড়াই থেকে নিবৃত্ত করা।

তৃতীয়ত, আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ন্যায় বিচার কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা পরস্পরের ঝগড়া আল্লাহ পাকের দরবারে নিতান্ত অপছন্দনীয়, এজন্যে এ আয়াতে বিশেষভাবে ন্যায় বিচার কায়েম করার আদেশ রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক ন্যায় পরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই-ই, অতএব তোমরা ভাইদের মধ্যে সন্ধি করে দাও, আর আল্লাহকে ভয় কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে'।

মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্কের ভিত্তিই হলো ঈমান, আর এ ঈমান যত সুদৃঢ় হবে, আল্লাহ পাকের রহমত তত বেশী নাজিল হবে। অতএব, তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক সে সব বন্দার প্রতি রহমত করেন, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই, অতএব, কেউ যেন অন্য মুসলমানের হক্ব বিনষ্ট না করে, তাকে গালি না দেয়। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ পাক তার প্রয়োজনের আয়োজন করেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই, অতএব সে অন্য মুসলমানের প্রতি জুলুম করবেনা, তাকে কোন প্রকার সাহায্য না করে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেনা এবং মুসলমানকে ছোট মনে করবেনা। এরপর বক্ষের দিকে ইংগিত করে তিনবার এরশাদ করেছেন, তাকওয়া পরহেজগারী এখানে। মানুষের জন্যে এতটুকু মন্দই যথেষ্ট যে সে কোন মুসলমানকে ছোট মনে করবে। মুসলমানের প্রত্যেকটি জিনিষই অন্য মুসলমানের জন্যে হারাম। তার রক্ত, অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান সবই হেফাজত করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জমল এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যারা আপনার বিরুদ্ধে ছিল, তারা কি মোশরেক ছিল? তিনি বলেছেন, না, তারা তো শেরক থেকে পলায়ন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তবে কি তারা মোনাফেক ছিল? তিনি বললেন, না। কেননা মোনাফেকরা তো আল্লাহ পাককে স্মরণ করেনা। এরপর প্রশ্ন করা হয়, তবে তারা কি ছিল? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তারা আমার ভাই ছিল, যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

'হে ঈমানদারগণ! এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে যাকে বিদ্রূপ করা হয়, সে বিদ্রূপকারীর চেয়ে উত্তম হবে এবং কোন নারীও

যেন একে অন্যকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয়, সে বিদ্রুপকারিনীর চেয়ে উত্তম হবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়ার শিক্ষা রয়েছে, কিন্তু তবু যদি মুসলমানদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হয়, তবে অন্য মুসলমানদের কর্তব্য হলো বিবদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। যদি কোন পক্ষ মীমাংসা মানতে রাজী না হয়, তবে তার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেও শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সে সব পন্থা পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে, যার সূত্র ধরে কলহ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। যে সব ছিদ্র পথে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এবং কলহ–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সে সব ছিদ্র পথ বন্ধ করার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

"হে ঈমানদারগণ! এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে"।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উম্মাহাতুল মোমেনীনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) অপেক্ষাকৃত বেঁটে ছিলেন। এজন্যে কেউ তাঁকে বিদ্রুপ করেছিল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

একরামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত সফীয়্যা (রাঃ) সম্পর্কে, তাঁর পিতা ছিল হুয়াই এবনে আখতাব। উম্মাহাতুল মোমেনীন তাঁকে কখনো "ইয়াহুদান" বা ইহুদী পিতা-মাতার কন্যা বলেছিলেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত সফীয়্যা (রাঃ) হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে, তিনি এরশাদ করলেন, তুমি কেন বললেনা, আমার পিতা হারুন (আঃ), আমার পিতৃব্য মুসা (আঃ) এবং আমার স্বামী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আলোচ্য আয়াতে قوم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো সমাজ, জাতি। এর মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভূক্ত, তবে অভিধাণবেত্তাগণ বলেছেন, শুধু পুরুষদের দলকেই قوم বলা হয়। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে قوم শব্দ দ্বারা পুরুষদের দলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যে نساء বলে বিশেষভাবে মেয়েদের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে "কওমে লুত", "কওমে হুদ"

প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে কাউকে বিদ্রুপ বা উপহাস করতে নিষেধ করা হয়েছে, এমনিভাবে কাউকে ছোট মনে করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং একে অন্যকে তিরস্কার না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ

'আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করোনা, আর একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকোনা, ঈমান আনয়নের পর মন্দ নামে ডাকা নিতান্ত গর্হিত কাজ'।

অতএব, পরস্পরের নিন্দাবাদ, পরিহাস, একে অন্যের কুৎসা রটনা প্রভৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এতে মানুষের মনে চরম কষ্ট হয়। অথচ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয়। অতএব যে আচরণে কোন মুসলমানের কষ্ট হয়, তা থেকে বিরত থাকা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য, আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

'যারা এমন আচরণ থেকে তওবা না করে, তারাই প্রকৃত জালেম'।

একে অন্যকে বিদ্রুপ করা, কারো কুৎসা রটনা করা এবং কাউকে মন্দ নামে ডাকা প্রভৃতি কাজ থেকে তওবা করা অবশ্য কর্তব্য। এ সব চারিত্রিক দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যারা এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ জানার পরও তা পরিহার করেনা, আল্লাহ পাক তাদেরকে জালেম আখ্যা দিয়েছেন, আর জালেমদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না, একথাও ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগভী (রঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত একরামা (রাঃ) বলেছেন, যদি কোন লোককে হে মোনাফেক! হে ফাসেক! বা হে কাফের বলা হয়, তবে তাই হবে মন্দ নামে ডাকা। হাসান বসরী (রঃ) বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইহুদী এবং ঈসায়ীরা ইসলাম গ্রহণ করতো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু লোক তাদেরকে "হে ইহুদী" "হে ঈসায়ী" ডাকত। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এসব নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি কারো দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়ে যায়, এরপর সে তওবা করে, তারপরও লোকেরা ঐ অন্যায়ের জন্যে তাকে লজ্জিত করে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা এমন আচরণ অবৈধ বলে ঘোষিত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের (মুসলমান) ভাইকে কাফের বললো, তা দু'জনের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে (অর্থাৎ যাকে কাফের বলা হয়েছে, যদি সে সত্যিই কাফের হয়, তবে তার কথা ঠিকই থাকবে, আর যদি সে কাফের না হয়, তবে যে বলেছে সে কাফের হবে)।

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে কোন লোককে কাফের বললো অথবা আল্লাহর দুশমন বললো, যদি প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি কাফের না হয়, তবে যে ব্যক্তি বলেছে সে কাফের হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া বড় গুণাহ, আর তাকে হত্যা করা কুফর।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, কারো প্রতি বিদ্রুপ করা, কোন লোককে তিরস্কার করা, মন্দ নামে কোন লোককে ডাকা এসবই ফিসক বা বড় গুণাহ। ঈমান আনার পর ফাসেক হওয়া অত্যন্ত মন্দ কাজ। এমন কাজ করোনা।

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ

অর্থাৎ যে এসব মন্দ কাজ থেকে তওবা করবেনা, সে জালেম বলে বিবেচিত হবে।

"জুলুম" শব্দের অর্থ কোন জিনিষকে তার স্থান থেকে অন্যত্র পৌঁছে দেয়া, যেমন আল্লাহর বন্দেগী করা কর্তব্য, তার স্থলে নাফরমানী করা। নিজের নাজাতের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা জরুরী, অথচ যারা নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা আল্লাহর আজাবের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা পাপাচার থেকে তওবা করেনা, তারা জালেম বলে বিবেচিত হয়, কেননা তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই জুলুম করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم
مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১২) হে মোমেনগণ! তোমরা বহু মন্দ ধারণা থেকে দূরে থাক, নিশ্চয় কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে, আর তোমরা কোন লোকের গোপন রহস্যের অনুসন্ধান করোনা এবং একে অন্যের অগোচরে তার দূর্ণাম করোনা.। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তাতে ঘৃণা প্রকাশ করে থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তওবা গ্রহণকারী, তিনি পরম করুণাময়।

(১৩) হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যের পরিচয় পাও, তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মুত্তাকী, তার মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

(১৪) আরব বেদুইনরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, (হে রসূল!) আপনি

বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কেননা ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধ মেনে চল, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবেনা। আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন জেহাদে বা সফরে তশরিফ নিয়ে যেতেন, তখন একেকজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে দু'জন সম্পদশালী ব্যক্তির খেদমতে নিয়োগ করে দিতেন, আর ঐ দু'জনের সঙ্গে আরেকজন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে একত্রিত করে দিতেন যার উপর খেদমতের দায়িত্ব অর্পিত হতো, তিনি উভয় ব্যক্তির পানাহারের ব্যবস্থা করতেন। একবার হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)কে দু' ব্যক্তির কাজে নিয়োজিত করেন। হযরত সালমান (রাঃ) নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। উভয় সাথীর জন্যে পানাহারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। যখন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, আমি এভাবে নিদ্রিত হয়েছিলাম যে কিছুই করতে পারিনি। ঐ দু' ব্যক্তি বললেন, তাহলে তুমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হও, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে সাথীদের খাবারের জন্যে আরজী পেশ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, উসামা এবনে জায়েদের নিকট যাও এবং খাবারের কথা বল। যদি কিছু থাকে তবে সে দিয়ে দেবে।

হযরত উসামা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোষাধ্যক্ষ এবং এ সফরের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) এর নিকট খাবারের কথা বললে, উসামা (রাঃ) জবাব দিলেন, আমার নিকট কিছুই নেই। হযরত সালমান (রাঃ) তাঁর সাথীদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, উসামার (রাঃ) নিকট খাবার তো ছিল, কিন্তু তিনি কার্পণ্য করলেন। এরপর হযরত সালমান (রাঃ)-কে আরো কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের নিকট প্রেরণ করা হলো। কিন্তু তিনি তাতেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর সাথীরা বললেন, তোমাকে যদি এমন কোন কূপে প্রেরণ করি, যার পানি প্রবাহিত রয়েছে, তবে তা-ও শুকিয়ে যাবে।

এরপর তাঁরা উসামার নিকট অনুসন্ধানের জন্যে আসেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উসামাকে যে খাবার প্রদানের আদেশ দিয়েছেন তা কি সত্যিই তাঁর নিকট ছিল না, নাকি তিনি কার্পণ্য করেছেন? যখন তাঁরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন, তখন তিনি এরশাদ করেন, কি হলো? তোমাদের মুখ থেকে গোশতের খুশবু আসছে, আমি তা অনুভব করছি। তাঁরা উভয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমরা আজ সারা দিনেও গোশ্‌ত খাইনি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা ভুল বলছ, তোমরা সালমান এবং উসামার গোশত ভক্ষণ করছিলে, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

'হে মোমেনগণ! তোমরা বহু মন্দ ধারণা থেকে দূরে থাক, মন্দ ধারণা থেকে আত্মরক্ষা কর'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন বজায় রাখার এবং পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব পরিহার করার তাগিদ রয়েছে। এর পাশাপাশি যে সব কারণে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ভাব বিনষ্ট হয়, যেমন কোন লোককে বিদ্রুপ করা বা কাউকে মন্দ নামে ডাকা প্রভৃতি নিন্দনীয় কাজ বর্জন করার তাগিদ করা হয়েছে।

কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপকরণ বর্জনীয়

আলোচ্য আয়াতেও এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপকরণ হয়, যেমন কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা, কারো দোষ অন্বেষণ করা, কারো কুৎসা রটনা করা, এসবই নিন্দনীয় কাজ এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বকে বিনষ্ট করার উপকরণ। কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তা তার সাথে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টির মূল কারণে পরিণত হয়। পরস্পরের ঝগড়া-ফ্যাসাদ মীমাংসার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয় মন্দ ধারণার কারণে। মীমাংসার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ভ্রান্ত ধারণা। কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা করলে তার গুণগুলোও দোষ মনে হয়। কোরআনে করীম এমন মন্দ ধারণা

থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেয়। এমনিভাবে কারো দোষ খোঁজার চেষ্টা করা এবং কারো গীবত শেকায়েত তথা কারো কুৎসা রটনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ। এসব আচরণকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মারাত্মক শত্রু বললে অত্যুক্তি হবেনা। এজন্যে পবিত্র কোরআন এসব নিন্দনীয় চরিত্র বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এবনে মাজা শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ তওয়াফ করার সময় বলেছিলেন, তুমি কত পবিত্র গৃহ! তুমি কত সুগন্ধময়! তোমার সম্মান ও মর্যাদা কত বেশী! সে পবিত্র সত্বার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ, মোমেনের সম্মান এবং তার অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের সম্মান এবং তার সাথে ভাল ধারণা রাখা আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার সম্মানের চেয়ে বেশী গুরুত্বের অধিকারী।

বোখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মন্দ ধারণা থেকে আত্মরক্ষা কর। কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো ছিদ্রান্বেষণ করোনা, পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় যেওনা। হিংসা, শত্রুতা এবং মনোমালিন্য থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। সকলে মিলে মিশে আল্লাহ পাকের বন্দা হয়ে পরস্পর ভাই ভাই রূপে জীবন যাপন কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে সে সব লোক! যারা মৌখিক ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে তাদের ঈমান নেই (অর্থাৎ মোনাফেক), তোমরা মুসলমানদের কুৎসা রটনা করোনা, তাদের গোপন রহস্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়োনা, যারা মুসলমানদের গোপন রহস্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হবে, আল্লাহ পাক তাদের গোপন কথাগুলো প্রকাশ করে দেবেন এবং তাদেরকে অপমানিত করবেন।[১]

হযরত আমর এবনে শোয়ায়েব এর পিতামহ বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্মুখে লোকেরা এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন এবং বললেন, যতক্ষণ তাকে খাওয়ানো না হয়, সে খায়না এবং যতক্ষণ তাকে আরোহণ করানো না হয়, সে আরোহণ করেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা তার গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমরা

১। তফসীরে এবনে কাসীর, পারা- (২৬), পৃষ্ঠা- ৮২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড- (৬), পৃষ্ঠা- ১০১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫

সে কথাই বলেছি যা তার মধ্যে আছে। তিনি এরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে তোমরা সে সব বিষয়ের উল্লেখ করবে যা তার মধ্যে রয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি তোমাদের সম্মুখে তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত রাখা হয় এবং তোমাদেরকে তা খেতে বলা হয়, তাতো তোমরা আদৌ পছন্দ করবেনা, অতএব তোমাদের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কুৎসা রটনা করোনা। গীবত শেকায়েত বা পরনিন্দা কত জঘন্য এবং ঘৃণ্য তা এ দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই অনুমেয়। একে তো ভাইয়ের গোশত, তদুপরি মৃত ভাইয়ের। খেতে বললে কোন অধম ব্যক্তিও তা সইতে পারবেনা। অতএব, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা যা তার উপস্থিতিতে করা যায়না, তাই হলো গীবত যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আমাকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, আর ঐ নখ দিয়ে তারা তাদের চেহারা এবং গোশতকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে বললাম, এরা করা? জীব্রাঈল বললেন, এরা সে সব লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতো, অর্থাৎ গীবত করতো। (বগভী)

মায়মুন বর্ণনা করেন, একদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে একজন আবিসিনিয়াবাসীর মরা পঁচা লাশ আমার সন্মুখে আনা হলো, কেউ আমাকে বললো, এটি খাও, আমি বললাম, কেন খাব? লোকটি বললো, তুমি অমুক ব্যক্তির গোলামের গীবত কেন করেছিলে? আমি আরজ করলাম, আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে ভালও বলিনি, মন্দও বলিনি। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, তুমি তার কুৎসা শুনেছিলে এবং তা পছন্দও করেছিলে। এরপর থেকে মায়মুন কারো গীবত তো করতেনই না এবং অন্য কোন লোককে তার সম্মুখে গীবত করতেও দিতেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম সফীয়্যা এমন অর্থাৎ বেঁটে। আর এ দোষই তার জন্যে যথেষ্ট। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি এমন কথা বললে, যদি সমুদ্রে একথাটিকে মিশিয়ে দাও, তবে সমস্ত সমুদ্রকে সে বিষাক্ত করে দেবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গীবত ব্যাভিচার থেকেও অধিকতর মন্দ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! গীবত ব্যাভিচার থেকে মন্দ কি করে হতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন, মানুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, এরপর তওবা করে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করেন, কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ পাক সে পর্যন্ত মাফ করেন না, যে পর্যন্ত যার গীবত করেছে সে মাফ না করে।

গীবতের কাফ্ফারা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গীবতের কাফ্ফারা হলো এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা, আর তা এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দিও এবং তাকেও।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত বড় তওবা গ্রহণকারী, তিনি অতীব দয়ালু'।

এ পর্যন্ত যেসব উপদেশ দেয়া হয়েছে, এসব উপদেশ শুধু তারাই কবুল করবে, যাদের অন্তরেআল্লাহরভয় রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে পূর্বশর্ত হলো আল্লাহর ভয়। কারো অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় হলো মন্দ থেকে বিরত থাকার প্রকৃত ব্যবস্থা। যার অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি যত বেশী ভয় থাকবে, সে আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে তত বেশী আত্মরক্ষা করতে পারবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত বড় তওবা গ্রহণকারী, অতীব দয়াময়।

যারা কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে এমন অন্যায় না করার শপথ করে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের তওবা কবুল করেন। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

'হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে এজন্যে বিভক্ত

করেছি, যেন তোমরা একে অন্যের পরিচয় পাও'।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত বেলাল (রাঃ) কা'বা শরীফের ছাদের উপর দন্ডায়মান হয়ে আজান দেন। ওবাদ এবনে ওসায়েদ আজান শ্রবণ করে বললো, "আল্লাহর শোকর এই দিন দেখার পূর্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে"। হারেস এবনে হেশাম বললো, "এই কালো কাক ব্যতীত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি আর কোন মোয়াজ্জেন পায়নি"! সোহায়েল এবনে আমর বললো, "যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তবে তিনি অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন"। আর আবু সুফিয়ান বললো, "আমি মুখে কিছু বলবোনা, কেননা আমার ভয় হলো, যদি আমার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয়, তবে আসমানের প্রভু মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে তার খবর পৌঁছে দেবেন"। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করেন এবং তারা যে যা বলেছে, সব কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তলব করলেন এবং তারা যা বলেছে, সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তারা নিজ নিজ উক্তি স্বীকার করলো। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং এ আয়াতে বংশ, অর্থ-সম্পদ নিয়ে গর্ব করা এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে ছোট মনে করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়।

এবনে আসাকের লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বণী বিয়াজাহ গোত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের কোন স্ত্রীলোককে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দিতে, তারা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমাদেরই আজাদ করা গোলামের সঙ্গে আমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দিচ্ছেন? তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত হযরত সাবেত এবনে কায়েস এবং তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত সাবেত এবনে কায়েসকে তার আগে যেতে বাধা দেয়। হযরত সাবেত (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললো, তুমি তো অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক স্ত্রীলোকের নাম কে নিয়েছে? কে এ ব্যক্তিকে তার মার নাম নিয়ে হেয় করার চেষ্টা করেছে?

সাবেত এবনে কায়েস (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি স্ত্রীলোকের নাম নিয়েছি। তিনি এ আদেশ দিলেনঃ তুমি লোকদের চেহারাগুলো দেখ। সাবেত (রাঃ) আদেশ পালন করলেন, তুমি কি দেখলে? সাবেত (রাঃ) আরজ করলেন, কাউকে গৌরবর্ণ দেখলাম, কাউকে দেখলাম লাল, আর কাউকে দেখলাম কাল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি শুধু দ্বীন এবং তাকওয়া পরহেজগারীর কারণে তাদের উপর মর্যাদা রাখ। বংশীয় মর্যাদা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি প্রাধান্য লাভের মানদন্ড নয়। তখন হযরত সাবেত (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হলো।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى.........

'হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও পুরুষ থেকে', অর্থাৎ আদম ও হাওয়া থেকে। অবশ্য হযরত ঈসা (আঃ), হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) ব্যতীত, কেননা হযরত আদম (আঃ)-কে পিতা-মাতা ব্যতীত আল্লাহ পাক নিজে সৃষ্টি করেছেন, হযরত হাওয়া (আঃ)-কে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ব্যতীত আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে তাঁর মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাক পিতা-মাতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, অতএব সৃষ্টিগত ভাবে কারো প্রতি কারো প্রাধান্য নেই। সম্মান এবং মর্যাদার ভিত্তি হলো তাকওয়া পরহেজগারী, দ্বীনদারী, ঈমানদারী, আল্লাহ পাকের আনুগত্য এবং আল্লাহ পাকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

বোখারী শরীফে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি এরশাদ করলেন, যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগার।

মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং আমল।

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুজর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, মনে রেখ, তুমি কোন লাল বা কৃষ্ণবর্ণের মানুষের প্রতি বিশেষ কোন ফজিলত রাখনা, তবে তাকওয়া পরহেজগারীতে এগিয়ে যাও, তাহলে তোমার সম্মান সর্বাধিক হবে।

আর তেবরাণীতে রয়েছে, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, কারো প্রতি কারো বিশেষ কোন মর্যাদা নেই, তবে মর্যাদা হলো তাকওয়া পরহেজগারীর ভিত্তিতে।

মসনদে বাজ্জারে রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা সকলেই আদম সন্তান, আর আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। হে লোক সকল! নিজেদের বাপ-দাদার নামে গৌরব করোনা, অন্যথায় আল্লাহ পাকের দরবারে বালুর স্তূপ এবং পানির পাখির চেয়েও হালকা হয়ে যাবে।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর "কোসওয়া" নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে ভাষণ দান করেন। আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি এরশাদ করেন, হে লোক সকল! আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে জাহেলিয়তের উপকরণ সমূহ এবং জাহেলিয়তের যুগের বাপ-দাদার প্রতি গৌরব করার কুপ্রথা দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দু' প্রকারই নেককার পরহেজগার লোক, যারা আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চমর্তবা সম্পন্ন, অথবা বদকার পাপীষ্ঠ, যারা আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে অপমানিত। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর এরশাদ করলেন, আমি আমার জন্যে এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মসনদে আহমদে রয়েছে, তোমাদের বংশ-পরিচয় কোন কাজে আসবেনা, তোমরা সকলেই সমান, হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান। কারো প্রতি কারো বিশেষ কোন মর্যাদা নেই, তবে মর্যাদা হলো দ্বীনদারী এবং তাকওয়া পরহেজগারীর। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে মন্দ কথা বলে কার্পন্য করে এবং অশ্লীল কথা বলে।[১]

এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

আল্লাহ পাকের দরবারে সে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগার।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, পারা- (২৬), পৃষ্ঠা- ৮৭

বংশ-বর্ণ-ভাষা, অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা কোন কিছুই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়না, তবে দ্বীনদারী এবং পরহেজগারী মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট এবং হেয় মনে করাকে ইসলাম পছন্দ করেনা, ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু দ্বীনদারী ও পরহেজগারীই মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদন্ড।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তোমাদের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত এবং তোমাদের সকল কর্মকান্ড তাঁর নখদর্পণে রয়েছে।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাকওয়া পরহেজগারীর সম্পর্ক মানুষের মনের সংগে, মানুষের মনের অবস্থা এক আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়। অতএব, কেউ সাধু সেজে মর্যাদা লাভ করতে পারবেনা, কেননা আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'আরব বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আনুগত্য প্রকাশ করেছি, ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে চল, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বণী আসাদ গোত্রের কিছু লোক দূর্ভিক্ষের বছর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয় এবং প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনেনি, তারা মদীনা মোনাওয়ারার পথে মল-মূত্র ত্যাগ করে নোংরা করেছিল এবং বাজারের জিনিষ-পত্রের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। সকাল-সন্ধ্যা তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আসত এবং বলতো, আরবের অন্য গোত্রের লোকেরা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ

করে একা আসত, আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে মালপত্র সহ এসেছি। অমুক অমুক গোত্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, (পরে মুসলমান হয়েছে), কিন্তু আমরা কখনও আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিনি। তারা এসব কথা বলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের এহ্সানের কথা প্রকাশ করতো এবং অধিক পরিমাণে সদকার অর্থ দাবী করতো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত সেই বেদুঈনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যাদের উল্লেখ আল্লাহ পাক সূরা ফাতহে করেছেন। এরা হলো জোহায়না, মোজাইনা, আসলাম, আসজা এবং গিফার গোত্র। তারা তাদের জীবন এবং সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে اٰمَنَّا (আমরা ঈমান এনেছি) বলে দাবী করতো। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে হোদায়বিয়া অভিযানে শরীক হতে বললেন, তখন তারা পিছপা হলো, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا

'আরব বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি'।

قُلْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলুন, প্রকৃতপক্ষে তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আনুগত্য প্রকাশ করেছি। ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, কেননা ঈমান হলো অন্তরের একটি অবস্থার নাম, শুধু মুখে "ঈমান এনেছি" বলা প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমান হলো এই যে তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তাঁর নবী রসূলগণকে এবং কেয়ামতের দিনকে ও তকদীর ভাল হোক কি মন্দ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। পৃথিবীতে যা কিছু ভাল মন্দ হয়, তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়, অতএব ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, শুধু এতটুকু কথা যে, তোমরা অনুগত হয়েছ।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি কোন লোক বলে, আমি মুসলমান হয়েছি, এতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হওয়া জরুরী নয়, কেননা হয়ত কোন বিষয়ে সে ইসলামী বিধান মেনে চলে। তবে যদি কেউ বলে, আমি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাহলে তাকে নিজের আমলের মাধ্যমে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পরিচয় অবশ্যই

দিতে হবে। যারা পূর্বে কৃত অন্যায় থেকে তওবা করে এবং আন্তরিক ভাবে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, তারা কখনো এমন নিন্দনীয় কাজ করতে পারেনা, উপরোল্লিখিত বেদুঈনরা মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হয়ে যা করেছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ
أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ
أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ ع

তরজমা

(১৫) মোমেন তো শুধু তারা-ই, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর কোন প্রকার সন্দেহ করেনি এবং নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো ঈমানের দাবীতে সত্য।

(১৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করতে চাও, আর আল্লাহ পাক আসমান জমীনে যা কিছু আছে, সবই জানেন, আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

(১৭) (হে রসূল!) তারা মুসলমান হয়েছে বলে আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছে, আপনি বলুন, আমার প্রতি ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ প্রকাশ করোনা, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে ঈমানের পথ প্রদর্শন করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান জমীনের সমস্ত গোপন খবর জানেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আরব বেদুঈনদেরকে বলা হয়েছে, "তোমরা সত্যিকার অর্থে ঈমান আননি, তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তাই তোমরা বল, আমরা অনুগত হয়েছি"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলেও সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়েছে কি-না তা দেখার অপেক্ষা থাকে, আর ঈমান অন্তরে প্রবেশ করলে, মানুষের জীবন-ধারায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রকৃত মোমেনের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকৃত মোমেনের পরিচয়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

প্রকৃত এবং পূর্ণ মোমেন তো শুধু তারাই, যারা মনে প্রাণে ঈমান আনে আল্লাহ পাকের প্রতি ও রসূলের প্রতি। যারা এক আল্লাহ পাককেই তাদের পরম প্রিয়তম বলে মনে করে। এক আল্লাহর নিকটই তারা আশা করে এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতিই তারা ভরষা করে। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে তারা সর্বাধিক ভালবাসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই জীবন-সাধনার সাফল্য দেখতে পায়।

ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

এরপর তারা কোন প্রকার সন্দেহ করেনি, আমৃত্যু ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ একীন থাকে, কোন প্রকার সন্দেহ তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনা, শুধু তাই নয়; বরং

وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করে আর এ জেহাদে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয়না। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয় তাদের জীবন-সাধনা।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

"তারাই সে সব লোক, যারা তাদের ঈমানের দাবীতে সত্য প্রমাণিত"।

অতএব, প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য হলোঃ

(১) তাদের ঈমান হবে পরিপূর্ণ, খাঁটি,

(২) ঈমান অনুযায়ী আমল করবে,

(৩) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার উপর কখনো কোন প্রকার সন্দেহ করবেনা। ঈমান আনয়নের সময় যেভাবে কোন সন্দেহ থাকবেনা, ঠিক তেমনিভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মন সর্বপ্রকার সন্দেহ থেকে পবিত্র থাকবে।

(৪) আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে, এই জেহাদে জীবন ও সম্পদ উভয়টিই ব্যবহার করবে, এই জেহাদ দুশমনের বিরুদ্ধেও হতে পারে, শয়তানের বিরুদ্ধেও হতে পারে এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে জেহাদের কথা বলা হয়েছে তা হলো আল্লাহ্ পাকের বিধানের বাস্তবায়নে সত্য-সাধনা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করা। আর যদি জেহাদ অর্থ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ গ্রহণ করা হয়, তবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনে, আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামকে বলুন্দ করার জন্যে জান মাল কোরবাণী করাই হবে এর উদ্দেশ্য।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

অর্থাৎ ঈমানের দাবীতে তারা সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হবে, সত্য-সাধনায় যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয় এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে অক্লান্ত সাধনা করতে হয়, তার মাধ্যমেই ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। চকচকে হলেই স্বর্ণ হয়না, বরং পরীক্ষিত স্বর্ণই খাঁটি স্বর্ণ। জেহাদের মাধ্যমে, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে, দ্বীন ইসলামের প্রতি অটল অবিচল থাকার মাধ্যমে

ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যারা এভাবে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তারাই প্রকৃত মোমেন।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ পাককে অবহিত করতে চাও? আর আল্লাহ পাক আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই জানেন, আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী'।

আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, (হে রসূল!) আপনি এ বেদুঈনদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা খাঁটি মোমেন হও, যদি তোমাদের নিকট খাঁটি ঈমান থাকে, তবে তা ফলাও করে প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? তোমরা কি আল্লাহ পাককে তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অবহিত করতে চাও? অথচ আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

সায়ীদ এবনে জোবায়ের হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এবং এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিছু বেদুঈন ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করিনি। অথচ অমুক অমুক গোত্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং এরপর মুসলমান হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেছেন, একথাটি মক্কা বিজয়ের পর হয়েছে।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আরব বেদুঈনরা যুদ্ধ না করেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা বলে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি যেন বড় অনুগ্রহ করে ফেলেছে, হে রসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা ঈমান এনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের উপর কোন প্রকার অনুগ্রহ কর নাই, বরং আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে তোমাদের প্রতি এহসান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন,

আর এটিই তোমাদের প্রতি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ, কেননা আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে কেউ ঈমান আনতে পারেনা।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান জমীনের সমস্ত গায়েবী খবর জানেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সকল গোপন প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পূর্ণ অবগত, আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন।

একথাটি যদি সর্বদা কেউ মনে রাখতে পারে, তবে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা সহজ হয় এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বাফ

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ
ذٰلِكَ رَجْعٌ ۢ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿٥﴾
اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۢ بَهِيْجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) ক্বাফ, শপথ মহিমান্বিত কোরআনের,

(২) বরং তারা এতে বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন। এরপর কাফেররা বলতে লাগলো, এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

(৩) আমাদের যখন মৃত্যু হবে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, আমরা কি

পুনরুত্থিত হবো? কত সুদূর পরাহত সে প্রত্যাবর্তন।

(৪) (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন) আমি তো জানি, মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে, আমার নিকট রয়েছে এমন কিতাব যাতে সব কিছু সংরক্ষিত রয়েছে।

(৫) বরং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হবার পরও তারা তাকে মিথ্যা বলেছে, পরিণামে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান রয়েছে।

(৬) তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেনা? আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করে রেখেছি, আর তাতে একটি ছিদ্রও নেই।

(৭) এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন্ন করেছি তাতে সর্বপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু সমূহ।

(৮) আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রের জন্যে জ্ঞান ও নসীহত স্বরূপ।

সূরায়ে ক্বাফ প্রসঙ্গে

সূরায়ে ক্বাফ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ, এতে ৩ রুকু, ৪৫ আয়াত এবং ৩৯৫টি বাক্য ও ১,৪৯০টি অক্ষর রয়েছে।[১]

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরায়ে ক্বাফ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

এ সূরার ফজিলত

মসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের এবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরা ফজরের নামাজের প্রথম রাকাআতে তেলাওয়াত করতেন।

এবনে মাজা, তিরমিজী এবং নেসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরাটি ঈদের নামাজেও তেলাওয়াত করতেন। এমনিভাবে আবুদাউদ শরীফে এবং বায়হাকীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরা জুমআর খোতবাতেও পাঠ করতেন।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৩৮
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১

আবুল আ'লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এবনে মরদবিয়ায় সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, তোমরা সূরা ক্বাফ শিক্ষা কর।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরার গুরুত্ব এবং বরকত অনেক বেশী।[১]

এ সূরার আমল

বর্ণিত আছে, যে গৃহে সূরা ক্বাফ পাঠ করা হয়, সে গৃহে সর্বদা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে।

এ সূরার শুরু থেকে كذالك الخروج পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে পান করলে দাঁতের এবং পেটের ব্যাথা দূর হয়। আর যে শিশুর দাঁত ওঠেনা, তাকে ঐ পানি পান করানো হলে সহজে দাঁত উঠে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ক্বাফ পাঠ করছে সে এমন এলম হাসিল করবে, যা মানুষের জন্যে উপকারী হয় এবং সে কল্যাণকর কাজে শরীক হওয়ার তৌফিক পাবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হবার বিষয়, হিসাব-নিকাশের কথা, জান্নাতের সওয়াব এবং দোজখের আজাব সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে এবং পরিশেষে জান্নাতের জন্যে অনুপ্রাণিত করে দোজখের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পবিত্র কোরআনের যে সূরা সমূহকে "মোফাচ্ছাল" বলা হয়, তন্মধ্যে এটি সর্ব প্রথম সূরা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে শুনেই এই সূরা কণ্ঠস্থ করেছি, কেননা তিনি প্রত্যেক জুমআর খোতবার সময় এ সূরাটি পাঠ করতেন। সকল বড় বড় মজলিশেই তিনি এ সূরা পাঠ করতেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৭০-৭১

যেমন ঈদের দিনেও এ সূরা তিনি পাঠ করতেন, কেননা এ সূরায় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও দোজখের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

ق ক্বাফ, এটি "হরফে মোকাত্তায়াতে"র অন্তর্ভূক্ত।

এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ক্বাফ হলো আল্লাহ পাকের অন্যতম পবিত্র নাম।

আর আবদুর রাজ্জাক এবং আবদ এবনে হোমায়েদ ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এটি পবিত্র কোরআনের অন্যতম নাম।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক এমন একটি মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, যা সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আর ঐ সমুদ্রের পেছনে একটি পাহাড় আছে, যা ঐ মহাসমুদ্রকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারই নাম ক্বাফ। এরপর আল্লাহ পাক ঐ পাহাড়ের পেছনে আরেকটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের এ পৃথিবী থেকে সাতগুণ বড়। ঐ পৃথিবীর পেছনে আরেকটি মহাসমুদ্র রয়েছে যা ঐ পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তার নামও ক্বাফ। আর এভাবেই রয়েছে সাত জমীন, সাত সমুদ্র, সাত পাহাড় এবং সাত আসমান। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতাংশ-

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ (সূরা লোকমানঃ আয়াতঃ২৭)

(আর এই সমুদ্রের সঙ্গে আরও সাত সমুদ্র হয় কালি, তবুও আল্লাহ পাকের কথা শেষ হবেনা) তেলাওয়াত করেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেনঃ "ক্বাফ" অক্ষরটি আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম সমূহ "ক্বাদীর", "ক্বাদের", "ক্বাহের" "ক্বারীব", "কাবেজ" এর প্রথম অক্ষর। অক্ষরটি দ্বারা আল্লাহ পাকের এ নাম সমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৭০-৭১
তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৯৩

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, “ক্বাফ” অক্ষরটি দ্বারা قُضِىَ الْاَمْرُ (যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে গেছে) অথবা قُضِىَ مَا هُوَ كَائِنٌ (যা কিছু হওয়ার তার ফায়সালা হয়ে গেছে).এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একরামা (রঃ) বলেছেন, এটি এমন এক পাহাড়, যা সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হক্ব কথা হলো এই যে, “ক্বাফ” অক্ষরটি হরফে মোকাত্তায়াতের অন্তর্ভূক্ত। এর অর্থ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল (দঃ) ব্যতীত কেউ জানেনা। মূলতঃ এটি হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের মধ্যকার একটি রহস্য।[১]

শায়খ আবদুল হক্ব মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীদের মতের উল্লেখ করার পাশাপাশি নিজের মত প্রকাশ করেছেন, মূলতঃ ক্বাফ দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কুদরত সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের কতৃত্বাধীন রয়েছে। “ক্বাফ” অক্ষরটি দ্বারা আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২]

وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ

‘শপথ মহিমান্বিত এই কোরআনের’।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের শপথ করেছেন এবং কোরআনে করীমকে “মহা সম্মানিত” বলে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম এবং সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ মহান গ্রন্থ যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে, শপথ করার মাধ্যমে একথাও প্রকাশ করা হয়েছে, কেননা শপথ করা হয় কোন প্রিয় এবং সম্মানিত বস্তুর।

আর একথা সর্বজনবিদিত যে মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন তার অলৌকিক প্রভাবে বিস্মিত করেছে সমগ্র বিশ্ববাসীকে, বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার হার মেনেছে পবিত্র কোরআনের সন্মুখে, কিন্তু এতদসত্বেও কাফেররা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেছে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৪
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-১৪৫

২। তফসীরে হক্কানী, পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৫২

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

বরং কাফেররা তাদের মধ্য থেকে তাদের সতর্ককারী আগমন করেছেন বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কফেররা বলেছে, এটি অত্যন্ত তাজ্জবের বিষয়, অতীব বিস্ময়কর, অর্থাৎ মক্কার কাফেররা বিস্ময় বোধ করেছে যে, তাদের মধ্য থেকে একজন লোক তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে আসতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা একত্রিত হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি আমি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেই যে, পাহাড়ের অপর দিক থেকে কিছু অশ্বারোহী ব্যক্তি বের হয়ে এসে তোমাদের প্রতি হামলায় উদ্যত রয়েছে, তবে তোমরা কি আমাকে সত্য মনে করবে? কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা বললো, অবশ্যই, কেননা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি, আপনার মধ্যে কখনো মিথ্যাবাদীতার লেশমাত্রও দেখা যায়নি।

কোরায়েশদের এ জবাবের পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন আজাব থেকে ভয় প্রদর্শন করি (আল হাদীস)।

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِیْبٌ

'কাফেররা বলে, এটি বড়ই বিস্ময়কর বিষয়'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রসূল হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং মানুষকে পরজীবন সম্পর্কে তথা এ জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন, এটি কাফেরদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার, শুধু তাই নয়, এ জীবনের পর পুনর্জীবন লাভ করতে হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, হাজির হতে হবে, এ সব বিষয়ও তাদের নিকট ছিল বিস্ময়কর। তারা তাদের এ বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটিয়েছে এভাবেঃ

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِیْدٌ

আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তারপরও কি আমাদেরকে পুনর্জীবন লাভ করতে হবে? হবে কি আমাদের পুনরুত্থান? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত। কাফেরদের মতে,

এটি বিস্ময়কর, এজন্যে তা তাদের নিকট অবিশ্বাস্যও। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লা প্সাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ

'আমি তো জানি, মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে। আমার নিকট রয়েছে এমন কিতাব যাতে সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে'।

কাফেররা কেয়ামত তথা পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করলে তার প্রতিবাদে এরশাদ হয়েছে, একটি মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের কত অংশ ক্ষয় হয় তা আমার অজানা নয় এবং তার দেহের সমস্ত অংশকে একত্রিত করা, তার পুনরুত্থান করা আমার জন্যে আদৌ কঠিন নয়। আমার কাছে এমনি একটি কিতাব রয়েছে, যা শয়তানের হাত থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। সে কিতাব লওহে মাহফুজ, যাতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছুর বিবরণ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে।

ينقص শব্দটি نقص থেকে নিষ্পন্ন। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, نقص শব্দটি দ্বারা মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হয়, যত লোকের মৃত্যু হয় সবই আমার জানা রয়েছে, কোন কিছুই আমার এলমের আওতার বাইরে নেই। আর আমার নিকট একটি দফতর রয়েছে, তাতে সব কিছুর বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়না, কম-বেশী হয়না। অতএব, মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দেয়া এবং তাকে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষের দেহের গোশত, হাড়, চামড়া, চুল প্রভৃতির মধ্যে যা কিছু মাটি ক্ষয় করে ফেলে, তা আল্লাহ পাকের জানা রয়েছে, সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পনে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ

"বরং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হবার পর তারা তাকে মিথ্যা বলেছে। পরিণামে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান রয়েছে"।

নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয় নবীর মোজেযা দ্বারা এ কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনেক মোজেযা দেখেছে, সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঐ সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান

করেছে, যা অযৌক্তিক, অসুন্দর।

আলোচ্য আয়াতের مريج শব্দটির অর্থ হলো, তারা সন্দেহে দোদুল্যমান রয়েছে। একীনের অভাবে তাদের মন অস্থির, ব্যাকুল, সত্য তাদের নিকট ধরা দিয়েছে, কিন্তু দূরাত্মা কাফেরদের মনে চরম অশান্তি বিরাজমান, কেননা সত্যের প্রমান তাদের নিকট রয়েছে, কিন্তু হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতার দোষে তাদের মন দুস্ট, সেজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দলিল-প্রমাণ দেখার পরও তারা সন্দিহান রয়েছে, আর এজন্যেই তাদের যত অশান্তি।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যে সত্যকে বর্জন করে, সে তার নিজের ব্যাপারে এবং ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ এবং সংশয়ের শিকার হয়, আর এ সংশয় হয় চরম অশান্তির কারণ।

জুযাজ (রঃ) বলেছেন, আর এ সংশয়ের কারণেই তারা কোন এক কথার উপর স্থির থাকতে পারেনা, সেজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তারা কখনো কবি বলেছে, কখনো যাদুকর, আর কখনো বলেছে অন্যের শেখানো কথা তিনি বলেন, আর কখনো বলেছে, তিনি পাগল, আর কখনো বলেছে, তিনি মিথ্যাবাদী (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

বস্তুতঃ দূরাত্মা কাফেররা নিজেদের সন্মুখে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত সত্যকে মিথ্যা বলেছে। আর এ অন্যায়ের অনিবার্য পরিণতিতে তারা সত্য-অসত্যের গোলক-ধাঁধায় পড়ে রয়েছে। এটি তাদের জন্যে মহা বিপদ, আর তা থেকে তারা রক্ষা পায়নি।

মূলতঃ আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, আর এজন্যে মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করা এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে হাজির করা আল্লাহ পাকের পক্ষে কঠিন কিছু নয়, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার কয়েকটি নিদর্শনের কথা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্ব প্রথম আসমানের কথা বলা হয়েছে, কিভাবে আল্লাহ পাক এ বিশাল বিস্তৃত আসমান সৃষ্টি করেছেন, কোন খুঁটি ব্যতীত তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে রেখে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি তাকে চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এ বিশাল- বিস্তৃত আসমানে এতটুকু ফাটল নেই, নেই কোন ছিদ্র।

মানুষ কি আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার এ জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পায়না? তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

'তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেনা? আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং (নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা) তাকে সুসজ্জিত করে রেখেছি এবং তাতে একটি ছিদ্রও নেই'।

এসব কি আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন নয়? যে পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক এমন বিশাল বিস্তৃত সুসজ্জিত আসমানকে এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিতে পারেন, তিনি কি মৃত মানষকে পুনর্জীবন দিতে পারেন না? এমনিভাবে আত্মবিস্মৃত মানুষ বিশাল বিস্তৃত জমীনের দিকেও তাকাতে পারে, কিভবে তিনি তা তৈরী করে রেখেছেন এবং তাকে কিভাবে এত প্রশস্ত করেছেন এবং কত পাহাড় তার উপর স্থাপন করেছেন। এ জমীনের উপরই তো মানুষ বাস করে, কোন দিন কি আল্লাহ পাকের এ বিস্ময়কর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখেনা?

এ জমীনে রয়েছে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন সমূহ, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

'এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তীর্ন করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন্ন করেছি তাতে সর্ব প্রকার সুদৃশ্য বস্তু সমূহ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন হিসেবে আসমানের উল্লেখ করা হয়েছে, কিভাবে তা কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত যুগ যুগ ধরে শুধু এক আল্লাহ পাকের কুদরতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। আর এ আয়াতে বিশাল-বিস্তৃত জমীনের প্রতি লক্ষ্য করার আহবান জানানো হয়েছে। তাতে আকাশচুম্বি পর্বতমালা স্থাপন করা হয়েছে, গগনস্পর্শী পর্বতগুলোকে আল্লাহ পাক বৃহদাকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো দ্বারা জমীনকে স্থবির করে রেখেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ পাক অনেক সুদৃশ্য, মনোমুগ্ধকর বস্তু সমূহ জমীনে সৃষ্টি করছেন। যাঁর এত শক্তি, এত মহিমা, তিনি কি মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর মহান দরবারে হাজির করতে পারবেন না? বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে এতে রয়েছে চিন্তার খোরাক এবং জ্ঞান অর্জনের অপূর্ব সুযোগ, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ

'আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রের জন্যে জ্ঞান ও নসিহত স্বরূপ'।

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরাগী, সে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এসব নিদর্শন দেখে জ্ঞান অর্জন করে, উপদেশ গ্রহণ করে, আর এভাবে তার ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সে লাভ করে নিশ্চিন্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন। আর এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে তথা একীন অর্জনকারীদের জন্যে জমীনে রয়েছে বহু নির্দশন।

অতএব, আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এসব বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য, আর এ কর্তব্য পালন করা শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়, যারা সুশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, যারা সদুপদেশ লাভ করে জীবনকে গড়ে তুলতে চায় তাদের জন্যে আসমান জমীনের সৃষ্টিতে রয়েছে শিক্ষা এবং উপদেশ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿٩﴾
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ
الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾ وَّاَصْحٰبُ
الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾

তরজমা

(৯) এবং আসমান থেকে আমি বর্ষণ করি বরকতময় পানি, এরপর তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি বাগান আর উৎপন্ন করি কৃষিজাত শষ্য।

(১০) এবং দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।

(১১) আমার বন্দাদের জীবিকা স্বরূপ, আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত জমীনকে বৃষ্টি দ্বারা। এভাবেই তাদেরকে বের হতে হবে কবর থেকে।

(১২) (এই কাফেরদের ন্যায়) ইতিপূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের জাতি, "রস্" এর অধিবাসী এবং সামুদ জাতি।

(১৩) আদ, ফেরাউন এবং লুত সম্প্রদায়,

(১৪) আইকাবাসী এবং তুব্যা জাতিও। তাদের সকলেই রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাই আপতিত হয়েছে তাদের প্রতি আমার শাস্তি।

(১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? যে, তারা পুনঃ সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে।

তফসীরুল কোরআন

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا ...... كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ আসমান জমীন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

'আসমান জমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়'। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"তারা কি দেখেনা? নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সৃষ্টিতে কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি কি মৃতদেরকে জীবিত

করতে সক্ষম নন? নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু করতে সক্ষম"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা লক্ষ্য কর যে আমি আসমান থেকে রহমতের পানি বর্ষণ করি, এরপর তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি বাগান, আর উৎপন্ন করি কৃষিজাত শষ্য, এমনিভাবে সৃষ্টি করি দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। এসব কিছুই আমার বন্দাদের জীবিকা স্বরূপ আমি দান করে থাকি। আর আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত শুস্ক জমীনকে সঞ্জীবিত করি। যেভাবে বৃষ্টির পানিতে মৃত শুস্ক জমীনে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং ফলে-ফুলে-তরুলতায় জমীন ভরে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে কেয়ামতের কঠিন দিনে মৃত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে এবং ক্ষণিকের মধ্যেই হাশরের ময়দানে সকলেই সমবেত হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "নিজেদের ফুফু অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের সম্মান কর, তোমাদের পিতা আদম (আঃ)-এর দেহ তৈরীর পর যে মাটিটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা দ্বারা এ বৃক্ষ তৈরী করা হয়েছে। আর যে বৃক্ষের নীচে মরিয়ম বিনতে এমরানের গর্ভ থেকে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার চেয়ে সম্মানিত কোন বৃক্ষ নেই।[১] (এবনে আবি হাতেম, এবনে আদী, আবু নায়ীম)

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ

পানি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত, শুস্ক জমীনে যে শষ্য ফলে, যে ফল-ফুলারি উৎপন্ন হয়, খেজুর বৃক্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর দেখা যায়, এসব কিছুই আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের জন্যে রিজক হিসেবে দান করে থাকেন।

وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا

"আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃত জমীনকে বৃষ্টি দ্বারা"।

বৃষ্টির পানিতে যেভাবে মৃত শুস্ক জমীন পুনর্জীবন লাভ করে, যা মানুষ প্রত্যহ দেখতে পায়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এভাবেই সারা পৃথিবীর মৃত মানুষদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ

১. তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা-৩১-৩২।

এভাবেই মানুষ মাত্রকে কবর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

"এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব, (আর মাটিতে মিশে তোমরা হারিয়ে যাবেনা) মাটি থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনব"।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াত দ্বারা হাশরের কথা প্রমাণিত হলো। কিন্তু মক্কার কাফেররা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতায় অবিশ্বাস করেছে, আল্লাহ পাকের মহান বাণী কোরআনে করীমকে বিশ্বাস করেনি এবং কেয়ামতের দিন যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে, একথাও মেনে নেয়নি, কাফেরদের এ অবিশ্বাস এবং অস্বীকৃতি নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে পৃথিবীর বহু জাতি সত্যকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

'ইতিপূর্বে নূহ-সম্প্রদায়, "রস্" এর অধিবাসী, সামুদ জাতি আল্লাহর রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আদ জাতি, ফেরাউন এবং লুত সম্প্রদায়ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আইকাবাসী এবং তুব্যার জাতিও, এক কথায় প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী ও রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে'। পরিণামে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে'।

নূহ-জাতি

এখানে উল্লেখ্য, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে নয়শত পঞ্চাশ বছর যাবত সত্য গ্রহণের জন্যে আহবান করেছেন, এ সুদীর্ঘ সময় তিনি তাদেরকে তবলিগ করেছেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, হযরত নূহ

(আঃ)-এর প্রতি অনেক জুলুম করেছে, অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব আপতিত হয়েছে। আর সে আজাব ছিল প্রলয়ংকরী বন্যা, যাতে নিমজ্জিত হয়ে তারা ধ্বংস হয়েছে, শুধু তাঁরাই সে আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছেন, যাঁরা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ অর্থাৎ চল্লিশজন পুরুষ ও চল্লিশজন নারী। কেবলমাত্র তাঁরাই হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁর নির্মিত তরীতে আরোহণ করেছেন এবং আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

আসহাবুর রস্

"আসহাবুর রস্" সম্পর্কে আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হাজরামুতের এক শহরে একটি কূপ ছিল। হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার, তারা আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই ঈমানদারগণ হযরত সালেহ (আঃ)-এর সঙ্গে এসে হাজরামুত নামক শহরে আবাদ হয়েছিলেন। এ শহরে আসার পরই হযরত সালেহ (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল। আর এ শহরের নামকরণও এ কারণেই হয়েছে। "হাজরামুত" শব্দটির অর্থই হলো এখানে (হযরত সালেহ (আঃ)-এর) মৃত্যু হাজির হয়েছে। তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা সকলেই সেখানে আবাদ হন এবং যুগ যুগ ধরে তাঁরা সেখানেই রইলেন। তারা এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করলেন। হযরত সালেহ (আঃ)-এর এন্তেকালের বহু দিন পর তাদের বংশধররা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তারা মূর্তি পূজা আরম্ভ করে, আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর নাম ছিল হানজালা এবনে সাফওয়ান। নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি পেশাগত দিক থেকে একজন ভারবহনকারী ছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত লাভের পর মূর্তিপূজকরা তাঁকে হত্যা করে, তারাই ছিল আসহাবুর রস্।

সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, "আসহাবুর রস্যে" একজন পয়গম্বর ছিলেন, যাঁকে হানজালা এবনে সাফওয়ান বলা হতো। ঐ স্থানের অধিবাসীরা আল্লাহর নবীকে হত্যা করে, এর পরিণতিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেন।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, "আসহাবুর রস্" একটি কূপের মালিক ছিল। তারা চতুষ্পদ জন্তু পালন করতো এবং মূর্তি পূজা করতো। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত

শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান করলেন, কিন্তু তারা তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করলো। একদিনের ঘটনা হলো এই যে, কূপের চারিপার্শ্বে তারা অবস্থান করছিল, সে কূপটি জমীনে ধ্বসে গেল। আল্লাহ পাক ঐ কাফেরদের বাড়ী-ঘরগুলোও জমীনে ধ্বসিয়ে দিলেন।

তফসীরকার কা'ব, মোকাতেল এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, "রস্" নামক কূপটি আনতাকিয়া শহরে ছিল। হাবিব নাজ্জারকে কাফেররা ঐ কূপে নিক্ষেপ করে শহীদ করে, তাদের ঘটনা সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "আসহাবুর রস্" মূলতঃ "আসহাবুল উখদুদ", তারাই কূপটি খনন করেছিল।

একরামা (রঃ) বলেছেন, ঐ দূরাত্মা কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে ঐ কূপে নিক্ষেপ করে উপর থেকে তা বন্ধ করে দিয়েছিল।

"আসহাবুর রস্" এর ব্যাখ্যায় আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ "কামুসে" লিপিবদ্ধ হয়েছে, এটি সে কূপ যা পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। সামুদ জাতি ধ্বংস হওয়ার পর তাদের যে সব লোক আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তারাই কূপটি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের যুগে যে নবী প্রেরণ করেছিলেন, তাঁকে তারা মিথ্যা জ্ঞান করে এবং সেই নবীকে একটি কূপে নিক্ষেপ করে তা বন্ধ করে দেয়, তাদেরকে "আসহাবুর রস্" বলা হয়।

وَثَمُوْدُ

সামুদ জাতি

আর সামুদ জাতি আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করে। তাদের ভাই হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কেন আল্লাহকে ভয় করোনা? আল্লাহ পাক তোমাদের হেদায়েতের জন্যে আমাকে প্রেরণ করেছেন। অতএব, তোমরা আমার কথা মান, আল্লাহকে ভয় কর। তারা বললো, তোমার প্রতি যাদু করা হয়েছে। তুমি তো আমাদের ন্যায় একজন মানুষই (তুমি নবী নও), যদি নবুওয়তের দাবীতে তুমি সত্যবাদী হও, তবে এর কোন নিদর্শন উপস্থাপন কর। হযরত সালেহ (আঃ)-এর দোয়ায় দশ মাসের গাভীন একটি উষ্ট্রী পাথরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে এবং তার একটি বাচ্চাও ঠিক তারই ন্যায় পয়দা হয়।

এ উষ্ট্রীটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ সম্প্রদায়ের নিকট যা পানি থাকত, ঐ

উষ্ট্রীটি তা একদিন পান করে ফেলত। আর একদিনের পানি ঐ সম্প্রদায়ের সমস্ত জন্তুগুলোর জন্যে দিয়ে দেয়া হতো। হযরত সালেহ (আঃ) বলে দিয়েছিলেন, পানির একটি নির্দিষ্ট অংশ (একদিনের পানি) ঐ উষ্ট্রীর, আর একদিন তোমাদের। খবরদার! তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে হাত দ্বারা স্পর্শও করবেনা। অন্যথায় তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে কঠিন আজাব আপতিত হবে। কিন্তু হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ (কুদরতি) উষ্ট্রটির দেহের কিছু অংশ কেটে ফেলল, এরপর এই অপকর্মের জন্যে তারা লজ্জিতও হয়েছে, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ নিরর্থক, হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা তিন দিন যাবত নিজেদের ঘরে আনন্দ কর। এরপর আল্লাহর আজাব নাজিল হবে। এ সতর্কবাণী মিথ্যা ছিলনা। যথা সময়ে আল্লাহর আজাব তাদের প্রতি আপতিত হলো। হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন, তারা রক্ষা পেলেন।

ফেরেশতার একটি হুংকার কাফেরদেরকে পাকড়াও করলো। তারা সকলেই নিজ নিজ ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

وَعَادٌ

আদ জাতি

আদ জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁর নবী হুদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা আল্লাহর আজাবকে ভয় করনা? আমি আল্লাহ পাকের রসূল, আমি তোমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চলো।

কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের নবীর কথা অবিশ্বাস করলো, তাঁর আহবানকে অস্বীকার করলো। তাই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তুফানের আজাব নাজিল করলেন, এই বিপদজনক তুফান তাদের প্রতি ৭ রাত ৮ দিন প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদের মূলোৎপাটন করে। মৃত খেজুর বৃক্ষের ন্যায় তাদের লাশগুলো মাটিতে পড়ে থাকে।

وَفِرْعَوْنُ

ফেরাউন

ফেরাউন এবং তার জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়, তার হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুসা

(আঃ) ফেরাউনকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান করলেন এবং তাঁর মোজেযা প্রদর্শন করলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলা মাত্র তা এক বিরাটকায় অজগরে পরিণত হলো। কিন্তু ফেরাউন মুসা (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করলো এবং তার পারিষদবর্গকে বললো, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক), এরপর আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, আমার বন্দাদেরকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে পড়। হযরত মুসা (আঃ) সে আদেশ পালন করলেন। লোহিত সাগরের উপকূলে পৌছে আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করলে, সমুদ্রের পানি দু'দিকে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল। মধ্যখান দিয়ে পথ তৈরী হলো। হযরত মুসা (আঃ) ছয় লক্ষ বণী ইসরাঈলীকে নিয়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেলেন। এদিকে ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর পিছু নিল। লোহিত সাগরের পথ পেয়ে সে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাতে প্রবেশ করলো। এরপর দু'দিকের পানি এসে সমুদ্র স্বাভাবিক রূপ নিলে, ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি ঘটল।

وَإِخْوَانُ لُوطٍ

লুত-সম্প্রদায়

হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ও আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাঁদের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তদুপরি তারা ছিল এক অশ্লীল, অমানবিক কুকর্মে লিপ্ত। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই সৎ পথে ফিরে আসেনি, অধিকন্তু তারা হুমকি দিয়েছে; যদি তুমি আমাদেরকে উপদেশ প্রদান থেকে বিরত না হও, তবে আমরা তোমাকে এ জনপদ থেকে বহিঃস্কার করবো। অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব আসে, আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তাদের জমীনকে উল্টে দেন, এভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হযরত লুত (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই ঐ জনপদ থেকে বের হয়ে আসেন।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

আইকাবাসী

আইকাবাসীও আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাদের নিকট হযরত

শোয়ায়েব (আঃ) প্রেরিত হন। তারা ওজনে কম দিত, হযরত শোয়ায়ের (আঃ) তাদেরকে এ অপরাধ পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তারা বলে, মনে হয় তোমার প্রতি কেউ যাদু করেছে, তুমি নবী নও, বরং আমাদের ন্যায় মানুষই, তুমি সত্য নবী নও, যদি তুমি সত্য নবী হও,তবে আসমান থেকে আজাব নিয়ে আস। অবশেষে তাই হলো। আসমান থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো। প্রথমতঃ তারা অত্যন্ত গরমে বড় অসহায় হয়ে পড়ল, তখন আকাশে একটি মেঘখন্ড দেখা গেল, তারা তার ছায়ায় একত্রির্ত হলো, তখন সে মেঘখন্ড থেকেই অগ্নি বর্ষিত হলো এবং আইকাবাসী ভস্মীভূত হলো।

وَقَوْمُ تُبَّعٍ

তুব্বা সম্প্রদায়

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, "তুব্বা" ইয়ামনের বাদশাহদের অন্যতম ছিল। সে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তার অনেক অনুসারী ছিল। এজন্যে তাকে "তুব্বা" বলা হতো। সে দেশে একের পর এক বাদশাহ হতো। সেজন্যে প্রত্যেক বাদশাকেই "তুব্বা" বলা হতো। সে পূর্বে অগ্নিপূজক ছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার জাতিকেও ইসলাম গ্রহণের আহবান জানায়।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সর্বশেষ তুব্বা ছিল আসআদ এবনে আবু কোরায়েব এবনে মোলায়েক এবনে ইয়াকরাব। আসআদ প্রাচ্য থেকে এসেছিল। মদীনা শরীফ অতিক্রম করার সময় সে তার এক পুত্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে যায়। কিন্তু তার সে পুত্রকে হত্যা করা হয়। এ খবর পেয়ে আসআদ মদীনায় এ সংকল্প করে আসে যে, এ শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে। মদীনার দু'গোত্র আউস এবং খাজরাজ যখন আসআদের এ ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হলো, তখন তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে শহরের বাইরে একত্রিত হলো। তারা দিনে আসআদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতো, রাত্রে তাদের আপ্যায়ন করতো। আসআদ এ অবস্থা দেখে আশ্চর্যন্বিত হয়ে বললো, এরা অত্যন্ত শরিফ লোক, সে সময় বণী কোরায়জা গোত্রের কাব এবং আসাদ নামক দু'জন ইহুদী আলেম বাদশাহ আসআদের নিকট আসল এবং তাকে বললো, আপনি যে সংকল্প নিয়ে এখানে এসেছেন, তা বর্জন করুন। যদি আপনি আপনার জেদ বর্জন না করতে পারেন, তবু আপনার উদ্দেশ্য

সফল হবেনা। আপনি কোন গায়েবী বাধার সন্মুখীন হবেন এবং কোন গায়েবী বিপদ থেকেও নিরাপদ থাকবেন না। ঐ ইহুদী আলেমগণ একথাও বললেন, এই শহরটি একজন নবীর হিজরতের স্থান হবে, যিনি কোরায়েশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করবেন, যাঁর নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হবে। মক্কা তাঁর জন্মস্থান, আর মদীনা হবে তাঁর হিজরতের স্থান। এখানে আপনি যে স্থানে অবস্থান করছেন, এ স্থানেই ঐ নবীর সাথীদের সঙ্গে তাঁর দুশমনদের যুদ্ধ হবে। তাতে কিছু লোক নিহত হবে, কিছু লোক আহত হবে। রাজা আসআদ জিজ্ঞাসা করলো, যখন তিনি নবী হবেন, তখন তাঁর সঙ্গে কে যুদ্ধে করবে? কাব এবং আসাদ বললো, তাঁর সম্পদায়ের লোকেরাই এখানে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ইহুদী আলেমদের এসব কথা শ্রবণ করে আসআদ তার সংকল্প বাতিল করলো। উভয় আলেম তাকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণের আহবান জানালেন। সে ঐ আহবানে সাড়া দিল এবং ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করলো এবং উভয় আলেমকে সম্মান করলো। প্রত্যাবর্তন কালে ঐ আলেম দু'জনকে এবং আরো কিছু ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামন রওয়ানা হলো। পথে হোজায়েল গোত্রের কিছুলোক তার সঙ্গে সাক্ষাত করলো এবং তাঁকে বললো, আমরা আপনাকে এমন একটি ঘরের সন্ধান দিতে চাই যার মধ্যে মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর, যবরজদ এবং রৌপ্যের ভান্ডার গুপ্ত আছে। আসআদ জিজ্ঞাসা করলো, মক্কায় এমন ঘর কোনটি হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে বণী হোজায়েল গোত্র আসআদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কেননা তারা জানত, আল্লাহ পাকের ঘর সম্পর্কে কেউ যদি কোন মন্দ ইচ্ছা করে, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আসআদ ইহুদী আলেমদের নিকট হোজায়েল গোত্রীয় লোকদের কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, কা'বা শরীফ ব্যতীত আমাদের জানা মতে এমন কোন ঘর নেই, যার সম্পর্কে মন্দ ইচ্ছা করলে ধ্বংস করা হয়। আপনি সে ঘরকেই এবাদতখানা হিসেবে গ্রহণ করুন। তার হজ্ব করুন, কোরবাণী করুন এবং মাথা মুন্ডন করুন।

কা'বা শরীফে গিলাফ

ইহুদী আলেমদের কথা শুনে আসআদ হোজায়েল গোত্রের লোকদেরকে (যারা তাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল) পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি দেয়। এরপর মক্কা শরীফে হাজির হয়ে কা'বা শরীফকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করে। আসআদই প্রথম ব্যক্তি, যে কা'বা শরীফকে গিলাফ দিয়ে ঢেকে দেয়। সে ছয় হাজার কোরবাণী দেয়।

মক্কা শরীফে সে ছয়দিন অবস্থান করে। কা'বা শরীফের তওয়াফ করে এবং মাথা মুন্ডন করে বিদায় গ্রহণ করে। আসআদ ইয়ামনের সীমান্তে পৌঁছলে হোমায়ের গোত্রীয় লোকেরা তাকে ইয়ামনে প্রবেশে বাধা দেয়। তারা বলে, তুমি আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছ, এজন্যে ইয়ামনে তুমি প্রবেশ করতে পারবেনা। আসআদ তাদেরকে বলে, আমি যে-ধর্ম গ্রহণ করেছি, তা তোমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। অতএব, তোমরাও এ ধর্ম গ্রহণ কর। তারা বলে, অগ্নির নিকট এর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দাও। তখন ইয়ামনে পাহাড়ের পাদদেশে একটি অগ্নিকুন্ড ছিল। লোকেরা তাদের যাবতীয় বিতর্কের বিষয় সেখানে নিয়ে যেত। গর্তের মধ্যে থেকে অগ্নি বের হয়ে জালেমকে খেয়ে ফেলত, আর মজলুমের কোন ক্ষতি করতোনা। তুব্বা বলে, তোমরা ইনসাফের কথা বলেছ। তখন হোমায়ের গোত্রের লোকেরা তাদের মূর্তিগুলোকে নিয়ে বের হলো, আর ঐ দু'জন ইহুদী আলেম তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে বের হলেন। তারা সকলে সেখানে গিয়ে এমন স্থানে অবস্থান করলেন, যেখান থেকে অগ্নি বের হতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নি এসে মূর্তিগুলোকে ভস্মীভূত করলো।

ইহুদী আলেমগণ যারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন, তারা ঘর্মাক্ত হলেন, কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তখন হোমায়ের গোত্রীয় লোকেরা উপলব্ধি করলো যে, এটিই সত্য ধর্ম, তাই তারা এ ধর্ম গ্রহণ করলো।

আবু হাতেম রাক্কাশীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবু কোরাইব আসআদ হোমায়রী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সাতশত বছর পূর্বেই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এজন্যে কা'ব (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তুব্বা সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তুব্বার কোন সমালোচনা করেননি, কেননা সাতশত বছর পূর্বেই সে ঈমান এনেছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলোনা, কেননা সে ইসলাম কবুল করেছিল।

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ

'তারা প্রত্যেকেই নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাই তাদের প্রতি আমার আজাব সাব্যস্ত হয়েছে'।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো, কোন একজন নবীকে অবিশ্বাস করা প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এজন্যে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তাদের নিকট প্রেরিত নবী

রসূলগণকে অবিশ্বাস করার মাধ্যমে মূলতঃ সকল নবীগণকেই অস্বীকার করেছে। আর এজন্যে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আজাব নাজিল হয়েছে, যে আজাব সম্পর্কে ইতি-পূর্বে নবী রসূলগণ তাঁদের উম্মতদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

'আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? যে তারা পুনঃ সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে'।

কাফেররা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করতো। তারা বলতো, মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে গেলে আর পুনর্জীবন কি করে সম্ভব? কাফেরদের এ উদ্ভট ধারণা নিরসন-কল্পে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ তারা এ ধারণা করে যে, তাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেই আল্লাহ্ পাক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, দ্বিতীয় বার তিনি আর সৃষ্টি করতে পারবেন না (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালেক)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তানরা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, অথচ তাদের পক্ষে তা আদৌ উচিৎ ছিলনা। আদম সন্তানরা আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তা তাদের জন্যে বৈধ ছিলনা। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হলো, তারা বলেছে, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু (মৃত্যুর পর) পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না, অথচ প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের সৃষ্টির চেয়ে সহজতর ছিল না। আর আদম সন্তানরা আমাকে এভাবে গালি দিয়েছে যে, তারা আমার জন্যে সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালিক), অথচ আমি একা, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই, আমি কারো পিতা নই, কারো পুত্রও নই। কেউ আমার সমকক্ষ নয়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَ
جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ
وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৬) আর নিশ্চয় আমি-ই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর আমি জানি, তার প্রবৃত্তি তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয়, আর আমি মানুষের স্কন্ধ-শিরা থেকেও নিকটতর।

(১৭) মনে রেখ, দুই (ফেরেশতা) গ্রহণকারী তার ডানে এবং বামে বসে তার (যাবতীয়) কর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকে।

(১৮) মানুষ যে কোন কথাই বলুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকটই রয়েছে।

(১৯) আর মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্যই এসে গেল, যাকে তুমি এড়িয়ে চলতে, তাতো এটিই।

(২০) আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তাই হলো শাস্তির দিন।

(২১) সেদিন প্রত্যেকটি লোক (এভাবে) হাজির হবে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক, আরেকজন তার কৃতকর্মের সাক্ষী।

(২২) তুমি যেদিন সম্পর্কে ছিলে সম্পূর্ণ উদাসীন, আজ আমি তোমার (গাফলতের) অন্ধকার দূর করে দিলাম, তাই তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেননি, আর প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের সৃষ্টির চেয়ে অধিকতর কঠিন। অতএব, মানুষের পুনরুজ্জীবন এবং পুনরুত্থান আদৌ কঠিন কিছু নয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতা এবং অন্তহীন জ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'আর নিশ্চয় আমি-ই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয়, আর আমি মানুষের স্কন্ধ-শিরা থেকেও নিকটতর'।

ইতিপূর্বে মানব-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই পর্যায়ে এ আয়াতে দ্বিতীয় বার মানুষের সৃষ্টির কথা এরশাদ হয়েছে অথচ আসমান ও জমীনের সৃষ্টির কথা শুধু একবারই উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর কারণ এই যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা এবং অভিজাত সৃষ্টি, মানুষকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা তার কাজ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ হলো মানুষের জীবনের সকল কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য, তাই মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়, তাঁর সান্নিধ্য লাভের অপূর্ব সুযোগ পায়, এজন্যে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

আল্লাহ্ পাক নিকটতম

আর নিশ্চয় আমি-ই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তার মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সবই আমি জানি, মানুষের কোন কিছুই আমার নিকট

গোপন নেই, কেননা আমি মানুষের স্কন্ধ-শিরা থেকেও তার অধিকতর নিকটবর্তী। الوريد মানুষের সেই রগটির নাম, যার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়, আর যা কেটে দিলে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। এজন্যে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা মানুষের প্রাণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষের প্রাণের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ নৈকট্য দ্বারা জ্ঞানের নৈকট্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের দেহ-মন, চিন্তা-চর্চা, কর্মতৎপরতা, এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের নখদর্পণে রয়েছে। অতএব,

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

এর ব্যাখ্যা হলো, "আমি মানুষ সম্পর্কে সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জানি, যে তার গর্দানের শাহরগ থেকেও কাছে রয়েছে, কেননা অন্য মানুষ সব কিছু জানলেও কোন মানুষের অন্তরের কথা জানেনা, আর আল্লাহ্ পাক মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব কথা সংরক্ষিত থাকে, তা-ও জানেন"।

আল্লামা বগভী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে এত বেশী জানি, যতটা সে নিজেও জানেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মানুষের স্রষ্টা, তাঁর এলম সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, এমনকি, মানুষের অন্তরে যে সব কুমন্ত্রণা আসে, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মনে যে সব চিন্তা-ভাবনা আসে, যতক্ষণ তা সে মুখে প্রকাশ না করে বা তা কার্যকর না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ পাক তা মাফ করে দেন, কেননা তিনি তার গর্দানের শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী।

সুফী-সাধকগণ এ নৈকট্যের ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে, তাঁরা বলেছেন, এ নৈকট্য উপলব্ধি করা যায়, প্রকাশ করা যায় না বা এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, যেমন মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

اتصال بے تکیف بے قیاس = ہست رب الناس را باجان ناس

"মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের যে ঘণিষ্ঠতর সম্পর্কে রয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেয়া

সম্ভব হয়না, এমনকি এ সম্পর্কে ধারণাও করা যায় না, তবে মানুষের প্রাণের সঙ্গে তার পালনকর্তার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে"।

মওলানা রুমী (রঃ) কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেনঃ

جان نہان در جسم داد و در جان نہان= اے نہان اندر نہاں اے جان جان

"আল্লাহ পাক মানব দেহের মাঝে তার প্রাণকে গোপন করে রেখেছেন, আর এ গোপন প্রাণের মাঝে নিজে আত্মগোপন করে আছেন। যিনি গোপনের মধ্যেই রয়েছেন গোপন, তিনিই প্রাণের প্রাণ"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان لله سبعين الف - الحديث

"আল্লাহ পাকের নূরের সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে, যদি ঐ পর্দা সমূহকে সরিয়ে দেয়া হয়, তবে তাঁর নূরের জ্যোতির কারণে সমগ্র বিশ্ব জ্বলে ছাই হয়ে যাবে"।

ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাকের গুণাবলী অন্তহীন, বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ -الاية

(আয়াত-১০৯, সূরা কাহফ, পারা-১৬)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমনকি তার সঙ্গে যদি অন্য একটি সমুদ্রও উপস্থিত করি"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ......اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

(সূরা লোকমান আয়াত-২৭)

"আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষগুলো কলম হয়, আর এই সমুদ্রের সঙ্গে সাত সমুদ্র হয় কালি, তবু আল্লাহ পাকের কথা শেষ হবেনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী"।

আলোচ্য আয়াতে মানুষের সাথে আল্লাহ পাকের যে নৈকট্যের কথা এরশাদ হয়েছে, তা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনকি কাফেরও এর অন্তর্ভূক্ত, কেননা এ হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাধারণ সম্পর্ক।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ এবং অসাধারণ সম্পর্ক রয়েছে। কোরআনে করীমেই রয়েছে তার ঈঙ্গিত, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

"তুমি সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও", এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "বন্দা সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ পাকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়",।

হিজরতের সময় গারে সওরের ঘটনায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেনঃ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"হে আবু বকর! চিন্তা করবেন না, আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন"।

ঠিক এমনিভাবে হযরত মুসা (আঃ) মিশর থেকে বের হয়ে যখন লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন ছয় লক্ষ বণী ইসরাঈল, পেছনে ছিল ফেরাউন ও তার লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী, আর সন্মুখে ছিল লোহিত সাগর। ঐ মূহূর্তে দুর্বল-চিত্ত লোকেরা ভীত হলো, তখন হযরত মুসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

"নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করবেন"।

এ নৈকট্য লাভের মূল উৎস হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান, আর এ ঈমান যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন তা একীনে পরিণত হয়। আর যার একীন যত বেশী বৃদ্ধি পায়, সে আল্লাহ পাকের তত বেশী নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এজন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের অগ্নিকুন্ড দেখে ভীত হননি, এমনকি এই বিপদ মুহূর্তে জিব্রাঈল (আঃ) যখন তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে

বলেছিলেন, যার জন্যে আমি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি, তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট। এটি ছিল আল্লাহ পাকের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নৈকট্যেরই ফলশ্রুতি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এ নৈকট্যকেই বেলায়েত বলা হয়, যার অগণিত মর্তবা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁদের জীবন-সাধনার মাধ্যমে নৈকট্য লাভের এ মকাম অর্জনে সচেষ্ট হয়েছেন।

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ), হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাআত নফল নামাজ আদায় করতেন। হযরত সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রাঃ) পঞ্চাশ বছর যাবত এশার নামাজের অজু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) চল্লিশ বছর একাধারে এশার নামাজের অজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) পচিশ বছর যাবত এমন সাধনা করেছেন। একটানা পনের বছর প্রত্যেক রাতে কোরআন শরীফ এক বার খতম করেছেন। হযরত শাহ আফাক (রঃ) প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ হাজার বার কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতেন। এমনি আরো বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। তাঁদের এ সাধনা ছিল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সফল চেষ্টা। আল্লাহ পাক মানুষের নিকটতম, একথা আল্লাহ পাক নিজেই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন"।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ

'স্মরণ কর, দুই গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার ডান ও বামে বসে তার কৃতকর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে'।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে আল্লাহ পাক দু'জন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন-একজন ডানে, একজন বামে। মানুষ যা কিছু করে এবং বলে তা লিখে রাখাই তাঁদের কাজ, ডান দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা মানুষের নেক আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। আর বাম দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা মানুষের পাপাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। জীবনের শেষ

মুহূর্ত পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ"।

كِرَامًا كَاتِبِينَ

"সম্মানিত লেখকগণ"।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"তারা জানে যা তোমরা কর" (সূরা ইনফেতার, আয়াত ১০,১১,১২)।

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

'সে যে কোন কথাই বলুক না কেন, তার নিকটই রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী'।

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের ডানে বামে ফেরেশতাগণ রয়েছে, তারা তোমাদের সকল আমল লিপিবদ্ধ করছে। আদম সন্তানের মুখ থেকে যে কথাটিই বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করে রাখে।

এ মর্মে মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ কোন মানুষ এমন কথা বলে, যা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়, ঐ ব্যক্তি কথাটিকে এত সওয়াবের কাজও মনে করেনা, অথচ আল্লাহ পাক ঐ কথাটির কারণে তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন। আর কেউ অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার কারণে আল্লাহ পাক তার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন। হযরত আলকামা (রঃ) বলেন, এই হাদীস আমাকে অনেক কথা বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করেছে। তিরমিজী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আহনাফ এবনে কায়েস বর্ণনা করেন, ডান দিকে উপবিষ্ট ফেরেশতা নেক আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, আর বাম দিকের ফেরেশতা বদ আমলের বিবরণ সংরক্ষণ করেন। তবে দু'জনের মধ্যে নেতৃত্ব হলো ডান দিকের ফেরেশতার, যদি কোন বন্দা দ্বারা কোন গুণাহর কাজ হয়ে যায়, তবে ডান দিকের ফেরেশতা বাম দিকের ফেরেশতাকে সঙ্গে সঙ্গে তা লিখতে বারণ করেন। তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা কর, যদি আল্লাহ পাকের এই বন্দা তওবা করে ফেলে,

তবে আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়না। আর যদি তওবা না করে তবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছিলেন, হে আদম সন্তান! তোমার জন্যে তোমার আমলনামা খুলে রাখা হয়েছে, দু'জন ফেরেশতা তোমার ব্যাপারে নিযুক্ত রয়েছে। একজন নেক আমল লিপিবদ্ধ করছে, আরেক জন বদ আমল। যখন তোমার মৃত্যু হবে, তখন এ দফতর বন্ধ করা হবে এবং তোমার কবরে তা রেখে দেয়া হবে। যখন কেয়ামতের দিন তুমি কবর থেকে উঠবে, তখন তোমার সম্মুখে ঐ আমলনামা রেখে দেয়া হবে এবং কেয়ামতের ময়দানে ঐ আমলনামা হাতে দিয়ে বলা হবে,

اِقْرَاْ كِتَابَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

(সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত-১৪)

"পাঠ কর তোমার আমলনামা, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছু বলে, সবই লিপিবদ্ধ করা হয়, এমনকি তোমার এমন কথা, "আমি খেয়েছি", "আমি পান করেছি", "আমি দেখেছি" প্রভৃতি কথাও আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার দিন তার আমলনামা পেশ করা হয় এবং ভাল ও মন্দ আমলের বিবরণ সংরক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত যা ভালও নয়, মন্দও নয় তা বাদ দেয়া হয়।

বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আহমদ (রঃ) যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, তখন হযরত তাউস (রঃ) বললেন, ফেরেশতাগণ আপনার এ কাতরানোর কথাও লিপিবদ্ধ করছেন, তখন তিনি কাতরানো বন্ধ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি রহমত নাজিল করুন। মৃত্যুকালে "উফ" পর্যন্ত বলেননি।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

এরপর তাউস (রঃ) বলেন, হে আদম সন্তান, মৃত্যুর সময় অবশ্যই তুমি অজ্ঞান হবে, তখন সে সন্দেহ দূরীভূত হবে, আজ যাতে তুমি লিপ্ত রয়েছ। তখন তোমাকে বলা হবে, এটি সেই সত্য যা থেকে তুমি পলায়নপর ছিলে, আজ তা এসে গেছে। কোনভাবেই তুমি তা থেকে নাজাত পাবেনা এবং তা থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারবেনা, মৃত্যুকে তুমি বাধাও দিতে পারবেনা, তাকে প্রতিরোধও করতে পারবেনা,

তাকে টাল-বাহানা করে বিদায় করতে পারবেনা এবং তার মোকাবেলাও করতে পারবেনা। আর এ ব্যাপারে কারো সাহায্য বা সুপারিশও কাজে আসবেনা।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ -

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

"আর মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই এসে গেল, যাকে তুমি এড়িয়ে চলতে, তাতো এটিই"।

কাফেররা পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার নিমিত্তে সর্ব প্রথম তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং শক্তির কথা বলেছেন, এরপর তাঁর অন্তহীন জ্ঞানের কথা ঘোষণা করেছেন। এরপর মানুষের জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা ঘোষণা করেছেন এবং আলোচ্য আয়াতে মানুষের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তাকে পরজীবনের জন্যে সতর্ক করা হয়েছে।

سَكْرَةُ الْمَوْتِ

মৃত্যু-যন্ত্রণা

আলোচ্য আয়াত সমূহে মৃত্যু-যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং কেয়ামতের দিনের অবস্থার বর্ণনায় অতীত কালের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন جَاءَتْ (মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই এসে গেছে) نُفِخَ (শিংগায় ফুঁক দেয়া হয়েছে) كَشَفْنَا (পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে) অথচ এসব ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে, কিন্তু যেহেতু এসব অবশ্যই ঘটবে এবং এগুলো সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তাই অতীত কালের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেন সত্যিই এসব ঘটনা ঘটে গেছে। যদিও অনুবাদ করা হয়েছে ভবিষ্যত অর্থে।

بِالْحَقِّ

অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সব কিছুই মরীচিকার ন্যায়, এখন যা বাস্তব এবং সত্য, তা বিদায় নেবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, আর মৃত্যুর পর যে অবস্থা হবে এবং যে ঘটনা ঘটবে, তাই হলো প্রকৃত সত্য। এ সত্যের মৃত্যু নেই, কেননা এসব আল্লাহ পাকেরই ওয়াদা, যার বরখেলাফ হওয়া সম্ভবই নয়।

মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষের অজ্ঞান হওয়া এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা চিরসত্য। হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর চেহারা মোবারক থেকে তিনি ঘাম মুছছিলেন এবং বলেছিলেন, সোবহানাল্লাহ! মৃত্যু-

যন্ত্রণা অত্যন্ত কঠিন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কিভাবে আরাম এবং বিশ্রাম করতে পারি, অথচ যে ফেরেশতা শিংগায় ফুঁক দেবেন, তিনি মুখে শিংগা নিয়ে নিয়েছেন এবং মাথা নত করে আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষা করছেন। যখন হুকুম হবে, তখনই শিংগায় ফুঁক দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তাহলে আমরা কি বলবো? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা বল,[১]

حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

বস্তুতঃ আত্মবিস্মৃত মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জগতের মায়া-মোহে মুগ্ধ থাকে, পরকালীন জীবন সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমনকি, এ জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করে, এ জীবনের সকল সত্য তখনই মিথ্যায় পরিণত হয়, যখন মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান কারো ব্যাপারে কার্যকর হয়, সে যেন আজীবন মৃত্যু থেকে পালায়নপর থাকে, কিন্তু অবশেষে সে মৃত্যুর হাতে ধরা পড়ে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

'এটিই সেই সত্য যাকে তুমি এড়িয়ে চলতে'।

পবিত্র কোরআনের সূরায়ে জুমআয় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ, তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে"।

আর মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়েই আসে, আগেও নয়, পরেও নয়। যে সত্যকে মানুষ ভুলে যায়, যা অপ্রতিরোধ্য, সে সত্যের নামই মৃত্যু। সারা বিশ্বের সমস্ত সামরিক শক্তি একত্রিত করেও যার মোকাবেলা করা যায় না, তিনি হযরত আজরাঈল (আঃ)।

কোরআনে করীমের এ আয়াত মানুষকে বাস্তববাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়। এ জীবনের মায়াজালে আবদ্ধ না থেকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানায়।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৭৪

'আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তাই হলো শাস্তির দিন'।

অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সেদিন হবে শাস্তির দিন।

আবু নায়ীম লিখেছেন, একরামা (রাঃ) বলেছেনঃ যারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, মৃত ব্যক্তির গোশত মাছেরা খেয়ে ফেলে, শুধু হাড়গুলো থেকে যায়, সমুদ্রের ঢেউ সে হাড়গুলোকে তীরে নিক্ষেপ করে, ঐ হাড়গুলো শুকিয়ে এমন অবস্থা হয় যে, হাড়গুলো উটেরা চিবিয়ে খায় এবং হাড়গুলো উটের মলে পরিণত হয়। উট অবশেষে মলত্যাগ করে, কোন ব্যক্তি ঐ মলগুলোকে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। অবশেষে তা ছাইয়ে পরিণত হয়। আর ঐ ছাইকে বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এরপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন ঐ লোকগুলো আল্লাহ পাকের হুকুমে পুনর্জীবন লাভ করবে এবং তাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيدٌ

'সেদিন প্রত্যেকটি লোক (এভাবে) হাজির হবে, যে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক, আরেকজন তার কৃতকর্মের সাক্ষী'।

সায়ীদ এবনে মানসুর এবং আবদুর রাজ্জাক, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম তাঁদের তফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উসমান (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের হুকুমে হাশরের ময়দানের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। আর একজন ফেরেশতা তার আমলের সাক্ষী হিসেবে হাজির থাকবে।

বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যিনি হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি হলেন ফেরেশতা আর সাথী হবে মানুষের আমল।

আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) "কিতাবুল বরজখে" হযরত জাবের (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কেয়ামত হবে তখন নেকী-বদী, ভাল-মন্দ আমল লেখক ফেরেশতা অনতিবিলম্বে প্রত্যেকটি মানুষের দিকে যাবে এবং মানুষের গলায় ঝুলন্ত আমলনামটি হাতে নিয়ে নেবে। এরপর উভয়ই হিসাবের স্থানে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে হাজির হবে, একজন লোকটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে আর একজন সাক্ষী থাকবে।

আবু নায়ীম এই হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) তফসীরকার যাহ্যাক (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, যে প্রত্যেকটি মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে সে হবে ফেরেশতা আর সাক্ষী হবে মানুষের হাত পা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও একথা বর্ণিত আছে।[১]

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

'তুমি এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিলে, আমি তোমার অন্ধকার দূর করে দিলাম, আজ তোমার দৃষ্টি খুবই প্রখর'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একথা প্রত্যেক কাফেরকে সম্বোধন করে বলা হবে এ মর্মে যে, দুনিয়ার জীবনে তুমি কেয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলে। আজকে আমি তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিলাম তোমার স্বপ্নের ঘোর কাটলো, সত্য তোমার নিকট সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হলো তোমার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত প্রখর।

আর কোন কোন তফসীরকারগণের মতে, ভাল মন্দ সকল মানুষকেই কেয়ামতের দিন একথা বলা হবে যে, তুমি ছিলে এদিন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তোমার উদাসীনতার আবরণ আজ আমি সরিয়ে দিলাম, আজকে তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। পরকালীন জীবনের কঠিন মঞ্জিল সমূহের উপর যে গাফলতের আবরণ পড়ে থাকে, পরিণামে মানুষ আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকে, সে গাফলতের আবরণকেই আলোচ্য আয়াতে غطاء বলা হয়েছে, অর্থাৎ দুনিয়ার মায়া-মোহে মুগ্ধ-মত্ত থেকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা। কোরআনে করীমে এ অবস্থার বিশ্লেষণে غشاء শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

আজ তোমার দৃষ্টি খুবই প্রখর, একথাটির তাৎপর্য হলো দুনিয়ার জীবনে কেয়ামতের দিনের কথা, হিসাব-নিকাশের কথা তুমি অস্বীকার করতে, এ অবস্থার সম্মুখীন যে হতে হবে, আজ তা তুমি স্বচক্ষে দেখছ, তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-৯৭

তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭৪

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ
لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾
هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

তরজমা

(২৩) এবং তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেন, এটি তাই, (আমলনামা) আমার নিকট প্রস্তুত।

(২৪) (তখন নির্দেশ প্রদান করা হবে) এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ কর, যারা ছিল উদ্ধত প্রকৃতির কাফের।

(২৫) যে কল্যাণকর কাজে বাধা দিয়েছে, যে সীমা লংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী।

(২৬) যে আল্লাহ পাকের সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, এমন ব্যক্তিকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ কর।

(২৭) তার সহচর শয়তানটি তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচনা দেইনি, সে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দূরে সরে পড়েছিল।

(২৮) আল্লাহ পাক বলবেন, আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করোনা, আমি পূর্বাহ্নেই

আজাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছি।

(২৯) আমার দরবারে কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং আমি আমার বন্দাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচারও করিনা।

(৩০) (সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমি দোজখকে বলবো, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?

(৩১) আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকট আনা হবে, কোন দূরত্ব থাকবেনা।

(৩২) (এবং বলা হবে) এটি সেই জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ পাকের প্রতি) আকৃষ্ট এবং যে এবাদতে পাবন্দী করে।

(৩৩) যে দয়াময় আল্লাহ পাককে না দেখে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে তাঁর দরবারে হাজির হয়।

(৩৪) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা নিরাপদে বেহেস্তে প্রবেশ কর, আজ চিরকালীন অবস্থানের দিন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে দু'জন ফেরেশতা থাকবে, একজন তাকে হাঁকিয়ে কেয়ামতের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে, আর একজন তার আমলনামা সংরক্ষণ করবে। যে আমলনামার দায়িত্বে থাকবে সে কেয়ামতের দিন আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ

এ ব্যক্তির আমলনামা আমার নিকট সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে, এতে এতটুকু কম-বেশী করা হয়নি।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এটি সেই ফেরেশতার কথা যাকে "সায়েক" বলা হয়েছে, সে তাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে।

এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, আমার মতে এ কথাটি উভয় ফেরেশতাই বলবে।

এরপর আল্লাহ পাক বন্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং নিম্নোক্ত আদেশ দেবেন, তোমরা দোজখে নিক্ষেপ কর দূরাত্মা, উদ্ধত প্রকৃতির কাফেরকে, যে দুনিয়ার জীবনে কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, যে ছিল সীমা লংঘনকারী এবং আল্লাহ পাকের

একত্ববাদে অবিশ্বাসী এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার গুণাবলী সম্পর্কে যে ছিল সন্দেহ পোষণকারী, এমন লোকদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। এ আদেশ হওয়ার পর দুনিয়াতে যে শয়তান তার নিত্য সহচর ছিল সে বলবে, কোরআনে করীমের ভাষায়ঃ

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَٰلٍ بَعِيدٍ

'পাপের দোসর সেই সাথী বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচনা দেইনি, কিন্তু সে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মোকাতেল (রঃ), সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন, তারা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قرين শব্দটি দ্বারা সেই ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার জন্যে নিয়োজিত রয়েছে, তারা বলেছেন, ফেরেশতা একথা তখন বলবেন যখন কাফেররা দাবী করবে যে ফেরেশতাগণ আমাদের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় বাড়াবাড়ি করেছে।

مَا أَطْغَيْتُهُ

অর্থাৎ আমি আমার তরফ থেকে তাকে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ করিনি; বরং সে নিজেই বিভ্রান্তিতে অনেক দূরে সরে পড়েছিলো।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قرين শব্দটি দ্বারা সেই শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে কাফেরের নিত্য সহচর ছিলো, ঐ কাফের বলবে, আমার সহচর শয়তানই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে তখন ঐ শয়তান বলবে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছিলো, আমি শুধু তাকে এতটুকু সাহায্য করেছি, তার গোমরাহী পথভ্রষ্টতা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছি।

মূলতঃ শয়তান তখনই মানুষকে বিভ্রান্ত করে যখন তার নিজের মধ্যে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাই শয়তান বলবে, আমি তাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করিনি, আমি শুধু তাকে অন্যায় অনাচারের দিকে আহবান করেছি তারা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছে, এজন্য আমাকে মন্দ বলোনা নিজেদেরকে মন্দ বলো, কেননা প্রকৃতপক্ষে অন্যায় অনাচারের জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী, আমি নই।

এ কারণেই সুফী সাধকগণ তাদের প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার জন্য জেহাদে প্রস্তুত থাকেন, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে অন্যায়ের মোকাবেলা করেন এবং

প্রবৃত্তিকে দমন করেন।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ

আল্লাহ্ পাক তখন বলবেনঃ আমার সন্মুখে বাক-বিতন্ডা করোনা, আমি পূর্বাহ্নেই আজাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছি। যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, যারা হবে সত্য-দ্রোহী, যারা নবী রসূলগণের বিরোধী হবে, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে অবিশ্বাসী হবে, তাদের শাস্তি অনিবার্য।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ

অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমি যে ঘোষণা দিয়েছি তাই ঠিক থাকবে, এতে কোন পরিবর্তন হবেনা, আমার ঘোষণা ছিল,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ- الاية

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুণাহ্ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতেও পারেন"। অতএব হে কাফের মোশরেকরা! আজ কোন প্রকার ক্ষমার আশা করোনা।

দুনিয়াতে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। কোন্ আমলের কি পরিণতি তা তোমাদেরকে জানানো হয়েছে, এখন নিজেদের আমলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করতে থাক।

তফসীরকার কালবী (রঃ) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ এর অন্য একটি অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ আমার সন্মুখে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়, কোন কথা পরিবর্তন করাও অসম্ভব, কেননা, আমি সব কিছু জানি, আমার নিকট কোন কিছুই গোপন রাখা যায়না।[১]

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

আর আমি আমার বন্দাদের প্রতি জুলুম করিনা, যা, সত্য, ন্যায় তাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

'(সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমি দোজখকে বলব, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? সে বলবে, আরও আছে কি'?

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭৭

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোজখে পাপীষ্ঠ লোকদেরকে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর দোজখ "আরো চাই", "আরো চাই" বলতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী কদম মোবারক তার উপর রেখে দেবেন। তখন সে সংকুচিত হয়ে যাবে। সে বলতে থাকবে "ব্যাস", "ব্যাস"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ সেদিনকে তোমরা স্মরণ কর, যেদিন আমি দোজখকে জিজ্ঞাসা করবো, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? দোজখ বলবে, আরো আছে কি? কাফেরদের প্রতি যেন তার আক্রোশ কিছুতেই কমছেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তিনি জ্বীন ও মানুষ দ্বারা দোজখকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে কাফের মোশরেকদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, কিন্তু কোন কিছু দ্বারাই দোজখ পরিপূর্ণ হবেনা। দোজখ "আরো চাই" বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতি কদম মোবারক তার উপর রাখবেন। আর দোজখ বলবে, "ব্যাস, আর সুযোগ নেই"। প্রশ্ন হতে পারে, দোজখ কি কথা বলতে পারবে? এর জবাব হলো, যেভাবে আল্লাহ পাক মানুষের জিহ্বাকে কথা বলার তৌফিক দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি দোজখকেও কথা বলার তওফিক দান করবেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার জান্নাত এবং দোজখের মধ্যে কথোপকথন হয়। দোজখ বলে, সকল অহংকারী এবং সকল জালেমের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, আর জান্নাত বলে, আমার অবস্থা এই যে, আমার মধ্যে দুর্বল লোকেরা আসবে, যাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানিত মনে করা হতোনা, তারা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ পাক জান্নাতকে বলেছেন, তুমি আমার রহমত, আমার বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে আমার রহমত দ্বারা ধন্য করবো, আর আল্লাহ পাক দোজখকে বলেছেন, তুমি আমার শাস্তি, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার দ্বারা শাস্তি দেব, তবে তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা হবে। কিন্তু দোজখ যখন পরিপূর্ণ হবেনা, তখন আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী কদম তার উপর স্থাপন করবেন, তখন সে "ব্যাস" "ব্যাস" বলবে এবং সংকুচিত হবে।[১]

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১০০

'আর জান্নাতকে পরহেজগারদের নিকটবর্তী করা হবে, এতটুকু দূরত্বও থাকবেনা'।

নির্দিষ্ট সময়ে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই জান্নাতীগণ তার সুগন্ধ, মনোরম দৃশ্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে শুরু করবে।

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

যাঁদের জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

'(এবং বলা হবে) এটি সেই জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ পাকের প্রতি) আকৃষ্ট এবং যে এবাদতে পাবন্দী করে'।

أَوَّابٍ শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশকারী, তওবাকারী।

হযরত সায়ীদ এবনুল মুসায়্যাব (রাঃ) বলেছেন, أَوَّابٍ বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে গুণাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা ফেলে।

শা'বী এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একাকী বসে নিজের কৃত গুণাহর জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হতে থাকে, তাকে أَوَّابٍ বলা হয়।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, أَوَّابٍ অর্থ হলো تَوَّابٍ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তওবাকারী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আতা (রঃ) أَوَّابٍ শব্দটি র অর্থ বলেছেন, আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনাকারী।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, أَوَّابٍ এর অর্থ হলো নামাজ আদায়কারী আর حَفِيظٍ শব্দটির অর্থ হলো প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণকারী, তওবা এস্তেগফারকারী, নিজের গুণাহ সমূহকে যে সামান্য মনে না করে। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে যে সব আমানত অর্পণ করেছেন তার হেফাজতকারী।

যাহ্যাক (রঃ) حَفِيظٍ শব্দের অর্থ বলেছেন, নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী, দায়িত্ববান।

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, حَفِيظٍ এর অর্থ হলো তত্ত্বাবধায়ক।

সোহায়েল এবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, সর্বদা যথানিয়মে এবাদত বন্দেগীতে

আত্মনিয়োগকারী।

আর হযরত ওসায়েদ এবনে উমায়ের (রঃ) বলেছেন, اواب এবং حفيظ হলো সে ব্যক্তি, যে কোন মজলিশে বসলে তওবা এস্তেগফার না করে ওঠেনা।

বস্তুতঃ এসব গুন যাঁদের মধ্যে থাকবে, তাঁদেরকেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।[১]

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

'যে দয়াময় আল্লাহ পাককে না দেখে ভয় করে, আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশকারী অন্তর নিয়ে হাজির হয়, তাকেই সুসংবাদ দেয়া হবে, তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর'।

অর্থাৎ যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাককে না দেখে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর আজাবকে ভয় করেছে এবং সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করেছে এবং এমন অন্তর নিয়ে হাজির হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশকারী ছিল, এমন ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার যাহ্যাক, সুদ্দী এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একা অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করতো, যখন কেউ তাকে দেখতে পারতোনা, তার জন্যেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلرَّحْمٰن শব্দের উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি তাঁর রহমতেরও আশা করে। আল্লাহ পাকের রহমত দেখে যেমন আশান্বিত হয়, ঠিক তেমনি তাঁর ভয়ে ভীতও হয়।

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ

"জান্নাতে প্রবেশ কর নিরাপদে" অর্থাৎ এখানে আর আজাবের কোন ভয় নেই এবং জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ারও কোন আশংকা নেই।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছানো হবে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে।

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৬, পৃষ্ঠা-১০১

"আর তাই হবে চিরকালীন অবস্থানের দিন।" যেদিন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেদিনই চিরকাল জান্নাতে অবস্থান করার আদেশ হবে, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, এমন অবস্থায় যে, তোমাদের জন্যে চিরকাল জান্নাতবাসী থাকার বিধান রয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোজখীরা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে দোজখবাসী! আর মৃত্যু নেই, হে জান্নাতবাসী! আর মৃত্যু নেই, প্রত্যেকে চিরদিন সেখানেই থাকবে, যেখানে এখন রয়েছে।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন এখানেই থাকবে, মৃত্যু আসবেনা, আর দোজখবাসীদের উদ্দেশ্যেও অনুরূপ ঘোষণা হবে, হে দোজখবাসী! চিরদিন এখানেই থাকতে হবে, আর মৃত্যু আসবেনা।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮০

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم
مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ
قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ
سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا
أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৩৫) বেহেস্তে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে, আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক।

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে (কুফরীর কারণে) আরো বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা ছিল এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরতো কিন্তু কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি।

(৩৭) নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে সে ব্যক্তির জন্যে যার অন্তর আছে অথবা যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

(৩৮) নিশ্চয় আমি আসমান জমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি মাত্র ছয় দিনে, আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

(৩৯) অতএব, (হে রসূল!) তারা যা বলে এ সম্পর্কে আপনি সবর অবলম্বন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন, সূর্য উদয়ের পূর্বে (ফজর) এবং অস্তমিত হওয়ার পূর্বে (জোহর ও আছরের সময়)।

(৪০) আর রাত্রিকালেও আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন, (মাগরিব ও এশার সময়) আর ফরজ নামাজের পরেও।

(৪১) আর নিকটবর্তী স্থান থেকে যেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, সেদিন মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর।

(৪২) সেদিন সত্য সত্যই সকলে গুরুগর্জন শ্রবণ করবে, তাই হবে বের হওয়ার দিন।

(৪৩) নিশ্চয় আমি জীবন দান করি, আমিই মৃত্যুমুখে পতিত করি, আর আমারই নিকট সকলকে ফিরে আসতে হবে।

(৪৪) (সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন জমীন তাদের (মৃতদের) উপর থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং মানুষ দ্রুত বের হয়ে আসবে, এই একত্র সমাবেশ আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

(৪৫) কাফেররা যা কিছু বলে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত রয়েছি, আর (হে রসূল!) আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। অতএব, আপনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই লোকদেরকে উপদেশ দান করতে থাকুন, যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানদার ও নেককারগণের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, আর জান্নাতে চিরদিন থাকার এবং কখনও জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে জান্নাতেরই আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

জান্নাতবাসীগণ যা কামনা করবে সেখানে তাই পাবে, আর আমার নিকট অনেক বাড়তি নেয়ামতও রয়েছে।

অর্থাৎ এমন নেয়ামত সমূহ রয়েছে, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, যার কথা কখনও কেউ শোনেনি এবং তা মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত।

হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতে যে বাড়তি নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ্ পাকের দীদার।

মুসলিম শরীফ এবং এবনে মাজায় হযরত সোহায়েব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে চলে যাবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে আরো কিছু দান করি? তখন জান্নাতীগণ আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি কি আমাদের চেহারাগুলোকে জ্যোতির্ময় করনি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দান করনি? তুমি কি আমাদেরকে দোজখ থেকে হেফাজত করনি? এর চেয়ে বাড়তি নেয়ামত আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁর এবং জান্নাতীদের মধ্যের আবরণ সরিয়ে দেবেন। তখন তারা পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবেন। জান্নাতীগণ তখন উপলব্ধি করবেন, আল্লাহ্ পাকের দীদারের চেয়ে বড় কোন নেয়ামত নেই।

হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হোজায়ফা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে, যা সকলেই শ্রবণ করবে, হে জান্নাতবাসী! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় এবং বাড়তি নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, উত্তম বিনিময় হলো জান্নাত, আর দয়াময় আল্লাহ্ পাকের দীদার হলো বাড়তি নেয়ামত।[১]

হযরত কাসীর এবনে মোররা (রাঃ) বর্ণনা করেন, বাড়তি নেয়ামত হলো জান্নাতবাসীদের নিকট দিয়ে একটি মেঘমালা অতিক্রম করবে এবং ঐ মেঘমালা থেকে এ ঘোষণা শ্রুত হবে, তোমরা কি চাও? তোমরা যা চাও, তা-ই আমি বর্ষণ করবো। তখন জান্নাতীগণ যা চাইবে, তা-ই মেঘমালা থেকে বর্ষণ করা হবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (জান্নাতে) তোমরা যদি কোন পাখীর গোশত খেতে চাও, তখন ঐ পাখী ভুনা অবস্থায় তোমরা পেয়ে যাবে।

১। তফসীরে মাজহারী: খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮১

সোহায়েব এবনে সেনান রুমী (রঃ) বর্ণনা করেন, এই বাড়তি নেয়ামত হলো আল্লাহ পাকের দীদার।

আর হযরত হাসান এবনে মালেক (রঃ) বর্ণনা করেন, এ বাড়তি নেয়ামত হলো প্রত্যেক জুমার দিন জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে বাড়তি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো, জান্নাতবাসীগণ যা আকাংখা করবে, তার চেয়েও অনেক বেশী নেয়ামত তাদেরকে দেয়া হবে।[২]

"আর আল্লাহ পাকের নিকট বাড়তি নেয়ামত রয়েছে", তফসীরকারগণ এর আরো একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীগণ যত নেয়ামতই কামনা করুন না কেন, আল্লাহ পাকের ভান্ডারে তার চাইতে অধিকই মওজুদ রয়েছে। জান্নাতবাসীগণের আকাংখা পূরণের জন্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কখনো কোন অভাব হবেনা, কেননা তাঁর নেয়ামত অনন্ত অসীম।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ

'আমি তাদের পূর্বে (কুফরী ও নাফরমানীর কারণে) আরো বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত, কিন্তু কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি'।

যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছিল, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল, তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী জাতিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন, যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন গয়রহ। মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকদের চেয়ে এসব জাতির শক্তি ছিল অধিকতর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোথাও আশ্রয়-স্থল পর্যন্ত খুঁজে পায়নি, আল্লাহ পাকের গজব তাদেরকে পাকড়াও করেছে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অথচ তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াত, তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, আল্লাহ পাকের আজাব দেখে তারা আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সকল চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হয়েছে, অতএব, যারা আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১০১
২। তফসীরে কবির, খন্ড-২৮ পৃষ্ঠা-১৯০

অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের ভয় করা উচিৎ, যে কোন সময় তাদের প্রতি আজাব আসতে পারে, এজন্যে আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"যারা আল্লাহ্ পাকের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিৎ, তাদের উপর যে কোন বিপদ আপতিত হতে পারে, অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আজাব আসতে পারে"।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে সে ব্যক্তির জন্যে, যার অন্তর আছে, অথবা যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে'।

অর্থাৎ এ সূরায় উপদেশ রয়েছে, অথবা পূর্বকালের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ধ্বংসাবশেষে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে, তবে সকলের জন্যে নয়, উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে কিছু পূর্বশর্তও রয়েছে, যাদের বুঝবার মত মন থাকে, সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি থাকে এবং উপদেশ শ্রবণের জন্যে আগ্রহ থাকে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এসব কথায় অবশ্যই উপদেশ রয়েছে। যাদের মন পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, যারা আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে থাকে তন্ময়, যারা আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী অন্তর দিয়ে কবুল করে, তারাই উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ জমীনে আমার স্থান সংকুলান হয়না, আসমানেও আমার স্থান সংকুলান হয়না, তবে মোমেন বন্দার অন্তরে আমার স্থান হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "ক্বলব" শব্দটির অর্থ হলো বিবেক বুদ্ধি, এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে "নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে সে ব্যক্তির জন্যে, যার বিবেক বুদ্ধি আছে, অথবা যে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে"।

অথবা আলোচ্য আয়াতের شهيد শব্দটি شاهد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কোন বিষয় শ্রবণ করার পর ঐ ব্যক্তির অন্তর যদি তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং অন্তর যদি

তা কবুল করে, তবেই উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

"আর নিশ্চয় আমি আসমান জমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি মাত্র ছয় দিনে, আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি"।

শানে নজুল

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিছু ইহুদী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আসমান জমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,আল্লাহ পাক জমীনকে রোববারে, সমুদ্রগুলোকে সোমবারে এবং পাহাড় এবং তাতে যা কিছু উপকারী রয়েছে, সব কিছুকে মঙ্গলবারে এবং বৃক্ষ–রাজি, পানি সহ অন্যান্য অনেক জিনিষ বুধবারে এবং আসমানকে বৃহস্পতিবারে এবং নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য ও ফেরেশতাগণকে জুমার দিন তথা শুক্রবারে এমন সময় সৃষ্টি করেছেন, যখন এ দিনের তিন ঘন্টা বাকী ছিল। এর প্রথম ঘন্টায় আল্লাহ পাক মৃত্যুর সময়কে সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় ঘন্টায় সেই বিপদাপদকে সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের উপকারী বস্তুর উপর হয়ে থাকে। আর তৃতীয় ঘন্টায় আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে জান্নাতে আবাদ করেছেন, ইবলিসকে আদেশ দিয়েছেন তাঁকে সেজদা করার জন্যে। আর তৃতীয় ঘন্টার শেষ মুহূর্তে তাঁকে জান্নাত থেকে বহিঃস্কার করেছেন। ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করলো, এরপর কি হয়েছে? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এরপর আল্লাহ পাক তাঁর মহান আরশে অধিষ্ঠিত হন। ইহুদীরা বললো, আপনি পূর্ণ বিবরণ দেননি, আপনার বিবরণে একটু ত্রুটি রয়েছে। যদি আপনি পূর্ণ বিবরণ দিতেন তবে ভাল হতো আর তা হলো, "এরপর আল্লাহ পাক বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন"।

একথা শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বিরাট বিশাল আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছয় দিনে, অথচ বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ করেননি। যা তিনি সৃষ্টি

করেছেন তা তিনি ধ্বংসও করতে পারেন এবং দ্বিতীয় বারও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ রয়েছে।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

অতএব, (হে রসূল!) ইহুদীরা যা বলে, এ সম্পর্কে আপনি সবর অবলম্বন করুন, কেননা তারা বলেছে, আসমান জমীন সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক ক্লান্তি বোধ করেছেন, এরপর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তাদের এসব উক্তিতে আপনি সবর অবলম্বন করুন।

অথবা মোশরেকরা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে তারা মানেনা, হে রসূল! আপনি এ বিষয়েও সবর করুন, কেননা আল্লাহ পাক, যিনি সমগ্র বিশ্বকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি দ্বিতীয় বারও তা সৃষ্টি করতে পারেন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

'এবং আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন, সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী নাসারাদের ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। দুনিয়ার কোটি কোটি ইহুদী নাসারা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাক ছয় দিনে আসমান জমীনের সব কিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন।
আল্লাহ পাকের শানে এ বেয়াদবীপূর্ণ কথার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, হে রসূল! আপনি কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথায় কর্ণপাত করবেন না, আপনি সবর অবলম্বন করুন এবং আল্লাহ পাকের স্মরণে মনোনিবেশ করুন, আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করুন, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে মশগুল থাকলে এবং তাঁর স্মরণে তন্ময় থাকলে পথভ্রষ্ট লোকদের এসব হিংসাত্মক, শত্রুতামূলক এবং ভিত্তিহীন কথার দিকে মনই যাবে না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে তসবীহ শব্দ দ্বারা নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা এর জন্যে সময়ও নির্ধারিত করা হয়েছে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে

অর্থাৎ ফজরের নামাজ আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যোহর ও আছর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যোহর ও আছরের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ

'আর রাত্রিকালেও আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন এবং ফরয নামাজের পরেও'।

রাত্রিকালের তসবীহর কথা বলে মাগরিব ও এশার নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে।

মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এর দ্বারা রাতের নফল এবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রহঃ), শাবী (রহঃ), নখয়ী (রহঃ) এবং আওজায়ী (রহঃ) এর মতে, وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ বলে মাগরিবের নামাজের পূর্বে দু' রাকাআত এবং ফজরের নামাজের পূর্বে দু' রাকাআত নামাজের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অবশ্য আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাতের কথা উদ্দেশ্য করা হতে পারে না, এ কারণে যে তখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়, আর এমন সময় নামাজ আদায় করা বৈধ নয়, বরং একথাটির উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক নামাজের পরের নফল এবাদত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতের فسبحه কথাটির অর্থ সুবহানাল্লাহ পাঠ করা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না, তবে যে ব্যক্তি অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি এই আমলও করে আসে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, যে ব্যক্তি একদিনে একশতবার "সুবহানাল্লাহে ওয়াবে হামদিহী" পাঠ করে তার গুণাহ মাফ হয়ে যায়, যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ হলো ছগীরা গুণাহের কথা। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্যে তওবা পূর্বশর্ত এবং বন্দার হক যদি হয় তবে হকদ্বারকে হক আদায় করতে হয় বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমা নিতে হয়।

বোখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস যা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'টি বাক্য যা উচ্চারণে অতি হালকা, তবে কেয়ামতের দিন পাল্লার ওজনে হবে অনেক ভারী এবং দয়াময় আল্লাহ পাকের দরবারে হবে অতি প্রিয়, এ দ'টি বাক্য হলো সুবহানাল্লাহে ওয়াবে হামদিহী ও সুবহানাল্লাহিল আজীম।

নামাজের পরে তসবীহ পাঠ কর, মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এ কথাটির অর্থ হলো নামাজের পর সুবহানাল্লাহ পাঠ করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবর পড়ে, এই ৯৯টি বাক্য হলো, এরপর একবার পাঠ করে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তবে তার সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেয়া হয় যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় হয়।

(মুসলিম ও বোখারী)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ

'আর নিকটবর্তী স্থান থেকে যেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, সেদিন মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। সেদিন সত্য সত্যই সকলে গুরুগর্জন সহকারে শ্রবণ করবে, তাই হবে বের হওয়ার দিন'।

এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে.

তফসীরকার মোকাতেল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ডাক দিয়ে বলবেন, হে সকল হাড়! হে সকল জোড়া! আল্লাহ পাক আদেশ দিচ্ছেন তোমরা তাঁর ফায়সালার জন্যে একত্রিত হও।

এবনে আসাকের জায়েদ এবনে জাবের এর সূত্রে লিখেছেন, কেয়ামতের দিন ইস্রাফিল (আঃ) বয়তুল মোকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন, হে হাড় সকল!, এবং হে চুলেরা! সেদিন আল্লাহ পাকের হুকুমে পৃথিবীর সকলেই এ ডাক শুনবে, যে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থা থেকেই ডাক শুনবে।

আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন, তোমরা শেষ বিচারের জন্যে একত্রিত হও। এভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হওয়ায় জন্যে সকলকে ডাকা হবে।

মৃতরা এই ডাক শ্রবণ করবে

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ

সেদিন আল্লাহ পাকের হুকুমে সকলেই এ ডাক শ্রবণ করবে, এমনকি মৃত্যুর পরে যারা মাটির সংগে মিশে গেছে, তারাও এই ডাক শ্রবণ করবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সঠিক পেয়েছ?

আমরা আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সঠিক পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি প্রাণহীন দেহের সংগে কথা বলছেন? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পার না, পার্থক্য হলো তারা জবাব দিতে অক্ষম।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেন, শিংগায় ফুঁক দিলে যে ভয়াবহ আওয়াজ হবে, তাতে মৃত লোকেরা জীবিত হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আওয়াজ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রথম দিকে আওয়াজ মৃত মানুষকে জীবিত করার জন্যে হবে, এরপর আওয়াজ হবে, কবর থেকে বের করার জন্যে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ইস্রাফীল (আঃ) হাড়গুলোকে ডাকবেন, চামড়াগুলোকে ডাকবেন, আলোচ্য আয়াতের الصيحة শব্দটি দ্বারা ইস্রাফিল (আঃ)-এর হুংকার উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক প্রথম বার সৃষ্টির সময়

যেমন كُنْ (হও) বলেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে, হয়তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টির সময়ও তাই করবেন।

আলোচ্য আয়াতে مكان قريب (নিকটবর্তী স্থান) থেকে যে ঘোষণা ধ্বনিত হবে, তা শ্রবণ করার নির্দেশ হয়েছে। যেহেতু বয়তুল মোকাদ্দাস থেকে কেয়ামতের প্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তাই তাকে নিকটবর্তী স্থান বলা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, যে যত দূরেই থাকুক না কেন, শিংগার আওয়াজ এত ভয়াবহ হবে যে, প্রত্যেকেই মনে করবে, তার নিকটবর্তী স্থান থেকেই আওয়াজ আসছে। এজন্যেই তাকে "নিকটবর্তী স্থান" বলা হয়েছে। আর হযরত ইস্রাফীল (আঃ) যখন দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ হবে, মানুষ কবর থেকে বের হয়ে দ্রুতবেগে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ

তাই হলো বের হওয়ার দিন। সেদিনই কবর থেকে বের হয়ে সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

"নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যুমুখে পতিত করি, আর অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে"।

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক আল্লাহ পাকই, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

(সূরা মূলকঃ আয়াতঃ ২)

"যিনি সৃষ্টি করেছন মৃত্যু এবং জীবনকে. যেন তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ করে"।

এ জীবন একটি মহা পরীক্ষা

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের এ জীবন একটি মহা পরীক্ষা, আর এ পরীক্ষা শেষ হলে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারেই

তাকে ফিরে যেতে হবে। এটিই আল্লাহ পাকের অলংঘনীয় বিধান।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন মাটির বুক বিদীর্ণ হবে, মানুষ দ্রুত হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে, সেদিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন অবশ্যই আসবে। আর এভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীকে একত্রিত করা আমার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হাশরের ময়দানে সেদিন সকলেই একত্রিত হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হয়েছে এবং হবে, সকলকে হঠাৎ করে একত্রিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

অর্থাৎ হাশর, হিসাব-নিকাশ তথা পরকালীন জীবন সম্পর্কে কাফেররা যে সব বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। তারা যে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তারা যা কিছু বলে, আমি তা জানি। আর (হে রসূল!) আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন, অতএব তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আপনার কর্তব্য পালন করতে থাকুন। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আপনি মানুষকে উপদেশ দিতে থাকুন। পবিত্র কোরআনে পরকালীন জীবন সম্পর্কে যে সব সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা (হে রসূল!) আপনি মানুষকে নসিহত করতে থাকুন, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণীতে সাবধান হয়, তারা আপনার নসিহত দ্বারা উপকৃত হবে। আর যারা সাবধান হবেনা, তাদেরকে হেদায়েতের জন্যে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়। এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, যেন কাফেরদের বিদ্রুপাত্মক কথায় তিনি মনক্ষুন্ন না হন, আর এতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিছু লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলো যে, দয়া করে আমাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে কিছু বলুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও একথা বর্ণিত হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা যারিয়াত

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسِّمٰتِ

اَمْرًا ۝٤ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) শপথ সেই বায়ুর যা ধূলা-বালিকে উড়িয়ে থাকে,

(২) শপথ সেই মেঘমালার, যা বোঝা বহন করে থাকে,

(৩) শপথ সেই তরী সমূহের, যা ধীরগতিতে চলে,

(৪) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা নির্দেশ মোতাবেক ভাগ করে দেয়।

(৫) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে, তা ধ্রুব সত্য।

(৬) আর নিশ্চয় কর্মফল অ াধারিত।

সূরায়ে যারিয়াত প্রসঙ্গে

সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরায়ে যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে জোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

এ সূরায় তিনটি রুকু, ষাট আয়াত, ৩৬০টি বাক্য ও ১,২৮৭টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল

রুগ্ন ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার সকল বন্ধু তার অনুগত থাকবে এবং তার রিজক বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ববর্তী সূরার সথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা ক্বাফে হাশরের কথা বলা হয়েছে এবং দলিল দ্বারা হাশরের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও হাশর, তওহীদ এবং নবুওয়তের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা ক্বাফের পরিসমাপ্তিতে হাশরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেই শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে হাশরের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গী

সূরায়ে ক্বাফে হাশরের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলিল প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তা করেনা। তাদেরকে যে পন্থায় বোঝানো হলে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়, সে পন্থাই আলোচ্য সূরায় অবলম্বন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব জাতির মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একটি বিরাট গুণ ছিল, তারা মিথ্যাবাদিতাকে অপছন্দ করতো, বিশেষতঃ শপথ করে মিথ্যা বলাকে তারা ভীষণ অন্যায় মনে করতো, তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে শপথ করে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্যে কোন ব্যক্তি যদি শপথ করে কোন কথা বলতো, তবে তার সত্যতায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

মূলতঃ এ কারণেই আলোচ্য সূরার শুরুতে কয়েকটি জিনিষের শপথ করে কেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এমন বস্তু সমূহের শপথ করা হয়েছে, যা কেয়ামতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-(৬) পৃষ্ঠা-১২৩

তফসীরুল কোরআন

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا

শপথ সেই বায়ুর, যা ধূলা-বালুকে উড়িয়ে থাকে, প্রথমতঃ যখন ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন তা ধুলা-বালু উড়িয়ে নিয়ে যায়। এরপরই আকাশে মেঘমালা দেখা যায়, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا

শপথ সেই মেঘমালার, যা বোঝা বহন করে থাকে, কেননা মেঘমালা পানির বোঝা বহন করে থাকে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا

'শপথ সেই তরী সমূহের, যা ধীর গতিতে চলে'।

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا

শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ভাগ করে থাকে অর্থাৎ যেখানে যে পরিমাণ বারি বর্ষণের হুকুম হয়, সেখানে ততখানিই বৃষ্টি হয়।

একবার হযরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে বলেছিলেন, কোরআনে করীমের যে কোন আয়াত বা হাদীস শরীফের কোন বিষয়ে জানতে চাইলে আমাকে প্রশ্ন করতে পার। তখন এবনুল কার‍্যার নামক এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়। সে জিজ্ঞাসা করে যারিয়াত শব্দটির অর্থ কি? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, বায়ু। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, "হামেলাত" অর্থ কি? তিনি বললেন, মেঘমালা। এরপর সে প্রশ্ন করে, জারিয়াত কি? তিনি বললেন, তরী সমূহ। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, "মোকাচ্ছেমাত" কি? তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ।[১]

ঝড়ো বাতাস, ধূলা-বালি উড়ানো, মেঘ-মালা, বৃষ্টিপাত এসব কিছু মানুষ প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করে। তাই এসব কিছুর বাস্তবতায় এবং সত্যতায় কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ পাক এসবেরই শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, এসব যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন জীবনও সত্য। হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া, মানুষের

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড- (২৬), পৃষ্ঠা-১১৬

সমস্ত জীবনের হিসাব-নিকাশ হওয়া তেমনি অকাট্য সত্য। দুনিয়াতে বায়ু-সঞ্চালন মেঘমালার গমনাগমন যেমন উদ্দেশ্য বিহীন নয়, ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিও অকারণে নয়। ঝড়ো বাতাসের পর মেঘমালার আগমন এবং বৃষ্টিপাতের যেমন একটি পরিণতি আছে, ঠিক তেমনিভাবে বিশ্ব-সৃষ্টিরও একটি পরিণতি আছে, আর সে পরিণতিই হলো পরকালীন জীবন। আল্লাহ পাক বিশ্বের সব কিছুই মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু'।

অর্থাৎ মানুষের কল্যাণার্থেই বিশ্বের সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হলো, মানুষকে আল্লাহ পাক কি জন্যে সৃষ্টি করেছেন? এর জবাবও রয়েছে পবিত্র কোরআনে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"আর আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি"।

অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন যাপন করা। কে কতখানি সঠিকভাবে এ কর্তব্য পালন করেছে তার বিচারই হবে কেয়ামতের দিন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ

'তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে তা ধ্রুব সত্য'।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ

"আর নিশ্চয় কর্মফল অবধারিত', এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই"।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি খলিফাতুল মুসলেমীন হরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, যারিয়াত কি? তিনি বলেছিলেন, বায়ু। যদি আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ অর্থটি না শুনতাম তবে তোমাকে বলতাম না। এরপর সে জিজ্ঞাসা করলো, মোকাচ্ছেমাত কি? তিনি বললেন, ফেরেস্তাগণ। আর এ অর্থও আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

নিকটই শুনেছি। এরপর লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, যারিয়াত অর্থ কি? তিনি বললেন, তরী সমূহ। এটিও যদি আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট না শুনতাম, তবে তোমাকে কখনও বলতাম না।

যেহেতু কেয়ামত সম্পর্কে এ ব্যক্তি সন্দিহান ছিল এবং সন্দেহের বশীভূত হয়েই এসব প্রশ্ন করেছে, তাই হযরত ওমর (রাঃ) তাকে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। যথানিয়মে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। এরপর একটি বাড়ীতে বন্দী রাখা হলো, যখন তার ক্ষত শুকিয়ে গেল, তখন পুনরায় তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হলো, এরপর তাকে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে এ তাগিদ করা হলো, যেন সে কোন মজলিশে বসতে না পারে। কিছুদিন পর তাকে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট হাজির করা হলে সে শপথ করে বললো, আমি আত্মসংশোধন করেছি, এখন আর আমার মনে কোন মন্দ আকীদা নেই, যা আগে ছিল। তখন হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট তার সম্পর্কে এ তথ্য পেশ করলেন, এরপর একথাও লিখলেন যে, আমার ধারণা, সে এখন আত্মসংশোধন করেছে। তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবার থেকে বলা হলো, এখন তাকে মজলিশে শরীক হওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।[১]

বস্তুতঃ এ জীবন যেমন সত্য, পরকালীন জীবনও তেমনি সত্য, এ সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক তাঁরই সৃষ্টি বায়ু, মেঘ, তরী এবং ফেরেস্তা প্রভৃতির শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, কেয়ামতের ওয়াদা অকাট্য সত্য, কেয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে এবং সেদিন মানুষের বিচার হবে। বিশ্ব-জগত ও তার সব কিছু যাঁর সৃষ্টি, তাঁর পক্ষে সমগ্র মানব জীবনকে পুনর্জীবন দেয়া ও পুনরুত্থান করা কঠিন কিছুই নয়, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- (২৭), পৃষ্ঠা-২
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা- (২৬), পৃষ্ঠা-১০৫
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১১), পৃষ্ঠা-৯০

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾
يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ
وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِينَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(৭) শপথ! সেই আসমানের, যা বহু পথ বিশিষ্ট।

(৮) নিশ্চয় তোমরা পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ কর,

(৯) সত্যের সমর্থন থেকে সে ব্যক্তিই বিরত থাকে, যে সার্বিক কল্যাণ থেকে দূরে থাকতে চায়।

(১০) ধ্বংস হোক মিথ্যা উক্তিকারীদের,

(১১) যারা গাফলত ও মূর্খতার কারণে উদাসীন রয়েছে,

(১২) যারা (হে রসূল!) আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বিচারের দিন কবে আসবে?

(১৩) (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন) যেদিন তারা অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে,

(১৪) এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ কর, এটি সে শাস্তিই, যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

(১৫) নিশ্চয় পরহেজগারগণ বাগান এবং ঝর্ণা সমূহে অবস্থান করবে।

(১৬) তাদের প্রতিপালক যা তাদেরকে দান করবেন, তাই তারা গ্রহণ করতে থাকবে, কেননা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তারা নেককার ছিল।

(১৭) (আল্লাহ পাকের এবাদতের কারণে) রাতের সামান্য অংশই তারা নিদ্রায়

অতিবাহিত করতো।

(১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

তফসীরুল কোরআন

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

এ আয়াতে শপথ করা হয়েছে আসমানের যা অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত, যাতে ফেরেশতাদের চলাফেরার পথ রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং একরামা (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের ذات الحبك। কথাটির অর্থ হলো, সুন্দর, উজ্জ্বল, সুশোভিত এবং সুসজ্জিত, কেননা আল্লাহ পাক আসমানকে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত এবং সুশোভিত করেছেন।

সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন সুসজ্জিত।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, নক্ষএপুঞ্জ দ্বারা আসমানকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সুদৃঢ়, মজবুত।

মোকাতেল (রঃ), কালবী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, যেভাবে বায়ু প্রবাহের কারণে পানিতে ঢেউ সৃষ্টি হয় এবং যেভাবে কোকড়ানো চুলের মধ্যে ফাঁক ফাঁক হয়, ঠিক তেমনি আসমানের মধ্যে পথ রচিত রয়েছে, যা দূরত্বের কারণে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, বহু পথ, আর তা হলো নক্ষত্রপুঞ্জের চলাচলের পথ, আর এ নক্ষত্র দ্বারাই আসমানকে সুশোভিত করা হয়েছে।

إِنَّكُمْ

এতে প্রথমতঃ সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসী কাফেরদেরকে।

لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ

'নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ কর'।

অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমাদের কথা পরস্পর-বিরোধী, কখনো তোমরা তাঁকে কবি বল, কখনো যাদুকর এবং কখনো পাগল (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

অথবা পবিত্র কোরআন সম্পর্কেও তোমাদের বিভিন্ন মত রয়েছে, কখনো তোমরা

তাকে যাদু বল, আবার কখনো তোমরা তাকে প্রাচীন কালের কাহিনী বল, অথবা তোমরা তাকে কাব্য বল।

অথবা এর অর্থ হলো, কেয়ামত এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে তোমরা কলহ-দ্বন্দে লিপ্ত রয়েছ, অথচ এটি ধ্রুব সত্য। বিবেকবান মাত্রই এ সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য, তবে যে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে মানেনা, তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনকেও বিশ্বাস করেনা, যে তাঁর প্রেরিত রসূলকেও অমান্য করে, যার সামান্যতম কান্ডজ্ঞানও নেই, যে বিশাল নীলাভ আকাশকে দেখে তার স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করেনা, যে বিরাট-বিস্তৃত জমীনকে দেখেও তাঁর সৃষ্টির লীলাখেলা বুঝতে পারেনা, সে আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, কেয়ামতকে অস্বীকার করতেও সে দ্বিধাবোধ করেনা।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

"তার সমর্থন থেকে সে ব্যক্তিই বিরত থাকে যে সার্বিক কল্যাণ থেকে দূরে থাকতে চায়", যে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত এবং যে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে-ই ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বা কোরআনে করীমের শিক্ষা গ্রহণ থেকে অথবা ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন থেকে সে ব্যক্তিই বঞ্চিত হয়, যার বঞ্চিত হওয়া আল্লাহ পাকের এলমে পূর্বেই থাকে।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে কোরআনে করীমের প্রতি এবং হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে বঞ্চিতই থাকে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মক্কার কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হতো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হতে প্রয়াসী হতো, তবে মক্কার কাফেররা তার পথরোধ করতো। তারা আকে বলতো, তুমি কোথায় যাও? যে মিথ্যুক, পাগল, যাদুকর (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) তার কাছে যাও? এভাবে তাকে ঈমান আনয়নে বাধা দিত। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্বের মওসুমে যখন কোন কাফেলাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তখন কাফেররা ঢোল

পিটিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো, যাতে কাফেলার লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করতে না পারে। এভাবে তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করতো।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

'মিথ্যা উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক'।

যারা দ্বীন ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করেনা, যারা তৌহীদ ও রেসালতের শত প্রমাণ পাওয়া সত্বেও তাতে বিশ্বাস করেনা, শুধু নিজেদের ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ

'যারা গাফলত ও মূর্খতার কারণে উদাসীন রয়েছে'।

মূলতঃ এই ক্ষণস্থায়ী জগতের ভোগ-বিলাস, এখানের আনন্দ-উল্লাস তাদেরকে চিরকালীন জীবনের মহাসত্যের কথা ভুলিয়ে রাখে এবং এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মায়া মোহে তারা মুগ্ধ মত্ত থাকত। বাস্তব জ্ঞানের অভাব এবং মূর্খতার প্রভাব তাদেরকে আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন করে রাখত।

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ

আর এজন্যে তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে জিজ্ঞাসা করতো, আপনি যে বিচার দিনের কথা বলছেন, তা কবে আসবে? পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের এ উপহাসের জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

যেদিন তারা অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে, সেদিনই বিচারের দিন এবং সেদিনই প্রত্যেককে তার আমলের বদলা দেয়া হবে, আর সেদিনই তাদেরকে বলা হবে,

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ কর, এটি সে শাস্তিই, যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছিলে, যার সম্পর্কে তোমরা বারংবার জিজ্ঞাসা করেছিলে এবং যার প্রতি

তোমরা বিদ্রূপ করেছিলে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ

'নিশ্চয় পরহেজগারগণ বাগান এবং ঝর্ণা সমূহে অবস্থান করবে'।

নেককারগনের শুভ-পরিণতি

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেক পাপীষ্ঠদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে ঈমানদার নেককার পরহেজগার লোকদের শুভ পরিণতির বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাককে ভয় করে, তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করেছে, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় কাজ করেছে এবং তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থেকেছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করেছে, তাদের জন্যেই বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত অপেক্ষা করছে।

দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করে যারা এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায় মশগুল থাকে, তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, অতএব ঈমান, এখলাস, তাকওয়া পরহেজগারী, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায় বিচার, হালাল রিজক, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, মানুষের কল্যান সাধন করা, আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকা- এ সবই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সৌভাগ্য লাভের মূল কারণ।

ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দান করবেন, তাই তারা গ্রহণ করতে থাকবে, কেননা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তারা নেককার ছিল, আল্লাহ পাক তাদের জীবনের সত্য-সাধানার কারণে যে সওয়াব এবং যে সম্মান ও নেয়ামত দান করবেন, তা তারা গ্রহণ করবে। দুনিয়ার জীবনে তারা আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করেছে, তাই তারই শুভ-পরিণতি তথা অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা আখেরাতে ভোগ করবে।

كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

রাতের সামান্য অংশই তারা নিদ্রায় অতিবাহিত করতো, অর্থাৎ তারা যে শুধু সৎকাজ করতো তাই নয়, বরং আল্লাহ পাকের এবাদতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

অধিক সময় এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতো।

আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা রাতের সুখ-নিদ্রা বর্জন করতো, রাতের অধিকাংশ সময়ই তারা নফল এবাদতে অতিবাহিত করতো, আর খুব সামান্য সময়ই তারা বিশ্রাম করতো, যেমন সূরায়ে ফোরকানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

করুণাময় আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা রাত অতিবাহিত করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত অবস্থায় অথবা দন্ডায়মান অবস্থায়।

এটি আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের বৈশিষ্ট্য।

وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আর রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণ রাতের অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে সারারাত এবাদতে মশগুল থাকার পরও রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কেননা তারা সর্বদা আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকতো, এই মর্মে যদি এবাদতে কোন ক্রটি থেকে যায়, যদি কোন কারণে দরবারে এলাহীতে আমার এবাদত কবুল না হয়, সারারাত এবাদত করেও আল্লাহ পাকের এবাদতের হক্ব তো আদায় হলোনা, তাই আল্লাহর ওলীগণ রাতের শেষ প্রহরে এ মোনাজাত করেনঃ শত আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা সত্বেও হে আল্লাহ! তোমার বন্দেগীর হক্ব আদায় করতে পারলাম না, এজন্যে আমাকে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তওবা করি, আমার তওবা গ্রহণ কর, আমার সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ রাতের কম অংশই বিশ্রাম করেন, অধিকাংশ সময়ই বন্দেগীতে মশগুল থাকেন এবং রাতের শেষ প্রহরে দরবারে এলাহীতে এস্তেগফার করতে থাকেন।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক রাতের যখন এক তৃতীয়াংশ বাকি

থাকে, তখন আল্লাহ পাক দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান থেকে ঘোষণা করেনঃ আমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মালিক, আছে কি কেউ যে আমার নিকট দোয়া করবে, তা হলে আমি তার দোয়া কবুল করবো। আছে কি কেউ যে কিছু চায়? আমি তাকে দান করবো, যে আমার নিকট গুণাহর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হবে, আমি তার গুণাহ মাফ করবো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, এস্তেগফার করতেন, এরপর বলতেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে, আসমান এবং জমীনের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তোমারই, তোমারই জন্যে সকল প্রশংসা, আসমান জমীন তথা সমগ্র বিশ্ব-জগতের তুমিই শাসনকর্তা, তোমারই প্রশংসা সর্বত্র, তুমিই সত্য, সত্য তোমার প্রতিশ্রুতি। তুমিই চিরন্তন, একথাই সত্য। তোমার মহান বাণী সত্য, দোজখ সত্য, নবী রসূলগণ সত্য, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য, কেয়ামত সত্য।

হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার প্রতি ঈমান রাখি, তোমার প্রতিই আমি ভরষা রাখি, তোমারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার সাহায্যেই আমি দুশমনের মোকাবেলা করি। আমার বিষয় ফায়সালা করার জন্যে আমি তোমারই নিকট হাজির হই; তুমিই আমাদের প্রতিপালক। তোমারই নিকট ফিরে আসতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য আমার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান, সব মাফ করে দিও। সর্বপ্রথম তুমি, আর সর্বশেষও তুমি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তুমি ব্যতীত কেউ এবাদতের যোগ্য নেই।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে উঠে এই দোয়া পাঠ করে,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

এরপর বলে, رَبِّ اغْفِرْلِي অথবা বলেছেন, এরপর দোয়া করে তবে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া কবুল হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে জাগ্রত হতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেনঃ

لا اله الا انت سبحنك اللهم وبحمدك استغفرك لذنبى
واسئلك رحمتك اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى
وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب

(আবু দাউদ শরীফ)

وَفِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ وَفِى
الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِى
السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ
مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ
الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا
تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ
عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ
عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(১৯) আর তাদের অর্থ-সম্পদে হক্ব রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের,

(২০) আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে।

(২১) আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও অনেক নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

(২২) আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযক এবং যা কিছুর প্রতিশ্রুতি

তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

(২৩) আসমান ও জমীনের প্রতিপালকের শপথ! (কেয়ামত এমন) সত্য, যেমন তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা।

(২৪) (হে রসূল!) ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা আপনার নিকট পৌঁছেছে কি?

(২৫) যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সালাম, জবাবে তিনিও বললেন, সালাম। এরা যে অজানা লোক।

(২৬) এরপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন এবং একটি হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা বাছুর নিয়ে আসলেন।

(২৭) আর তাদের সন্মুখে রাখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

(২৮) এতে তাঁর মনে তাদের সম্পর্কে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হলো। তারা বললো, আপনি ভীত হবেন না। এরপর তারা তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুখবর দিল।

(২৯) এরই মধ্যে তাঁর স্ত্রী কথা বলতে বলতে উপস্থিত হয় এবং নিজের কপালে হস্ত দ্বারা আঘাত করতে করতে বলে, বৃদ্ধা বন্ধার কখনও সন্তান হয়?

(৩০) তারা বললো, আপনার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুত্তাকী পরহেজগার লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাতের অধিকাংশ সময় এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকে, এতদসত্ত্বেও তারা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তারা আল্লাহ্ পাকের রাহে দান করতে কখনো কার্পণ্য করতো না, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে তারা সর্বদা অগ্রগামী থাকতো, যে সাহায্যপ্রার্থী তাদেরকে তো তারা দান করতোই, অধিকন্তু যারা বঞ্চিত অথচ কারো কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো না, তাদেরকেও আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ অনুসন্ধান করে সাহায্য করতো, এটিও জান্নাতীগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্য

ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, যারা জান্নাতবাসী

হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ

তারা ছিল দুনিয়ার জীবনে নেককার, তারা সৎকাজ করেছে, তারা কি কি সৎকাজ করেছে তা এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) তারা রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকতো, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করতো।

(২) রাতের শেষ প্রহরে দরবারে এলাহীতে ক্ষমাপ্রার্থনা করতো।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

আর মনে করতো যে, তাদের অর্থ-সম্পদে দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষের হক্ব রয়েছে, তাই তাদেরকে সাহায্য করতে কখনো কুণ্ঠিত হতো না, বরং ঐ হক্ব আদায় করতে তারা সর্বদা সক্রীয় থাকতো।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং জুহরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "মাহরূম" শব্দের অর্থ হলো, সে সব লোক যারা দরিদ্র হওয়া সত্বেও মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো না, এজন্যে সাধারণতঃ মানুষ তাদেরকে দরিদ্র মনে করতো না, তারাই হলো মাহরূম।

আর জায়েদ এবনে আসলাম বলেছেন, মাহরূম হলো সে ব্যক্তি যার ফল-ফসল প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, আগে অনেক কিছু ছিল, এখন কিছুই নেই।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারজী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

(৪) 'আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে' অর্থাৎ যারা নেককার তারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখতে পায়, যেমন কুরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

(সূরায়ে ইয়াসীন)

"এবং তাদের জন্য এই শুস্ক মৃত জমীনও একটি নিদর্শন, যাকে আমি নবজীবন দান করি ও সবুজ ও সতেজ করে তুলি এবং এই জমীন থেকেই খাদ্য বীজ (শস্য)

উৎপন্ন করি যা থেকে তারা আহার করে থাকে"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি জমীনকে সম্পূর্ণ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং নরম করে দিয়েছেন, অতএব জমীনের উপর চলাফেরা কর এবং জমীনে আল্লাহর দান স্বরূপ তোমাদের জন্যে যে রিজক গুপ্ত রয়েছে, তা খেতে থাক। একথা মনে রেখ, তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

বস্তুতঃ যারা সত্য-সন্ধানী এবং যারা সত্যপন্থী তারা ধরণীর বুকে আল্লাহ পাকের অগণিত নিদর্শন দেখতে পায়, এটিই নেককার লোকদের একটি বৈশিষ্ট্য।

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

(৫) 'আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই অনেক নির্দশন রয়েছে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না'?

মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে বড়ই অসহায় এবং নিরুপায় থাকে, তার বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৈহিকশক্তি, বিবেকবুদ্ধি কিছুই তো থাকে না, সে থাকে অবুঝ এবং নিতান্ত শক্তিহীন। এমন দূর্বল অবস্থা থেকে আল্লাহ পাকই তাকে ধীরে ধীরে সবল করে তোলেন এবং কিছুদিন পর সেই দূর্বল শিশুটিই শক্তিশালী বীরে পরিণত হয়। যে কিছুই জানতো না, আল্লাহ পাকের করুণা-দৃষ্টির কারণে কিছুদিন পর সেই শিশুটিই বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী, প্রখ্যাত পন্ডিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

মানব-জীবনের এই ক্রমোন্নতি একমাত্র করুণাময় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ.........لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(সূরায়ে নাহল)

"এবং আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনেন, এমন অবস্থায় যে, তখন তোমরা কিছুই জানতে না"।

এরপর আল্লাহ পাক শ্রবণের জন্যে কর্ণ, দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন, হয়তো তোমরা তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মূলত এভাবেই প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের কৃপা ও দয়ায় শূণ্যের তিমির অন্ধকার থেকে অস্তিত্ব ও বাস্তবতার আলোর জগতে আসে। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আমি কি মানুষকে চক্ষুদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা প্রদান করে ভালো মন্দ ডান-বাম উভয় পথের পরিচয় দান করিনি"?

আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমাদের নিজেদের মধ্যেই আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এবং রহমতের অনেক নির্দশন রয়েছে।

বস্তুতঃ যারা নেককার, যাদের অন্তরদৃষ্টি উন্মুক্ত, তারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমতের অনেক নিদর্শন দেখতে পায় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার থাকে।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিজক এবং যা কিছুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের رزق শব্দটি বলে এর উপকরণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ বৃষ্টি, কেননা আসমান থেকে বৃষ্টিপাত হয় এবং তার ফলে যমীনে ফসল উৎপন্ন হয়।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, মানুষ অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় জীবিকা উপার্জনের প্রচেষ্টায় কোন কোন সময় পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত বিশ্বের জটিলতম সমস্যাই হলো অর্থনৈতিক সমস্যা, যা যুগে যুগে মানুষকে বিব্রত এবং চিন্তিত করে রেখেছে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের রিজকের ব্যবস্থা আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

তোমাদের জীবিকা এবং তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সবই রয়েছে আসমানে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হযরত

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাষায়ঃ

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ

"আল্লাহ পাকই দান করেন আমাকে আমার আহার্য এবং পানীয়"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন মানব জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মানব মন থেকে সর্ব প্রথম এ পর্যায়ের সকল হতাশা নিরাশার অবসান ঘটিয়েছে এবং মানুষ মাত্রকে তার রিজক লাভের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। আমাদের জীবন যাঁর দান, তিনিই দিয়েছেন জীবিকার সন্ধান, জীবিকার অফুরন্ত দ্রব্যসামগ্রী তিনি রেখে দিয়েছেন যমীনের অভ্যন্তরে, যখনই যেখানে যে কেউ পরিশ্রম করে মাটিতে একটু বীজ বপন করে আল্লাহ পাক তাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ফসল দান করেন। মানব জাতির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হয়েছে এবং হবে, সকলের জন্যেই আল্লাহ পাক যমীনের অভ্যন্তরে রিজক রেখে দিয়েছেন, তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক রিজকের নিশ্চয়তা বিধান করে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ.........كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

"পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী মাত্রেরই রিজকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকের উপর এবং তিনি জানেন তাদের অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাসস্থল সম্পর্কে। মূলতঃ সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

আল্লাহ পাক যার জন্যে যতটুকু জীবিকা বরাদ্দ করে রেখেছেন, সে ততটুকুই পাবে, এর কোন ব্যতিক্রম হবেনা, আর আসমানেই রয়েছে রিজক বরাদ্দের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ "লওহে মাহফুজে" লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, রিজকের ব্যাপারে এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরষা রাখ।

وَمَا تُوْعَدُوْنَ

"আর যা কিছুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো সওয়াব এবং আজাব।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কল্যাণ ও অকল্যাণ।

আর যাহ্যাক (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, জান্নাত ও দোজখ।

অতএব, আয়াতের অর্থ হবে, তোমাদের রিজক, তোমাদের সওয়াব বা আজাব, কল্যাণ ও অকল্যাণ, জান্নাত ও দোজখ সব কিছুর ফয়সালা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা আসমানে রয়েছে। যদি এ আয়াত দ্বারা শুধু নেককার লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়, তবে অর্থ হলো, যেহেতু জান্নাত আসমানেই রয়েছে, তাই নেককারগণের জন্যে সব কিছুই রয়েছে আসমানে।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

'আসমান জমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় (কেয়ামত এমন) সত্য, যেমন তোমাদের কথাবার্তা'।

অর্থাৎ তোমরা যেভাবে কথাবার্তা বল, আর এর সত্যতায় কারো কোন সন্দেহ নেই, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামত সত্য। আর নেক আমলের সওয়াব এবং মন্দ কাজের শাস্তিও তেমনি সত্য।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণার প্রতি ঈমান

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ আসমায়ী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি বসরার জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে এক বেদুঈনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। সে আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি বললাম। এরপর সে জিজ্ঞাসা করলো, আমি এখন কোথা থেকে এসেছি। আমি বললাম, যেখানে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় সেখান থেকে। সে বললো, আমাকে পবিত্র কোরআন শোনাও। আমি সূরা যারিয়াত তেলওয়াত করলাম, যখন আলোচ্য আয়াত পাঠ করলাম وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ (আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিজক) তখন বেদুঈন বললো, এখানেই শেষ কর। এরপর বেদুঈন উঠে তার উষ্ট্রীটিকে জবেহ করে দিল এবং তার গোশত পথিকদের মাঝে বন্টন করে দিল, আর তার তলোয়ার, তীর, কামান ফেলে দিয়ে এক দিকে চলে গেল। এর অনেক দিন পর যখন আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাজির হলাম, পথিমধ্যে কোন এক ব্যক্তি আমাকে ডাকল, আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম, ঐ বেদুঈন ব্যক্তিই, সে আমাকে সালাম দিল, এরপর পুনরায় সূরায়ে যারিয়াত শোনানোর জন্যে অনুরোধ করলো। আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

"আসমান ও জমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় তা সত্য"।

একথা শ্রবণমাত্রই বেদুঈন একটি চিৎকার দিল এবং বললো, সোবহানাল্লাহ! কে আমার প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছে? যে তিনি শপথ করেছেন, লোকেরা তাঁর কথা মানেনি বলেই তিনি শপথ করেছেন। বেদুঈন ব্যক্তি একথাটি তিনবার বললো এবং এরই মধ্যে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, إِنَّهُ لَحَقٌّ এর সর্বনামটি দ্বারা পবিত্র কোরআনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের কালাম। তোমরা যে কথা বল, তা যেমন সত্য, তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ সত্য আল্লাহ পাকের কালাম, তোমরা একে অন্যের কথাকে যেমন সত্য বলে মনে করে বিশ্বাস কর, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের কালামে বিশ্বাস করা তোমাদের কর্তব্য।[২]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মেহমানগণের ঘটনা

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর পিতামহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

'(হে রসূল!) ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা আপনার নিকট পৌঁছেছে কি'?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট মানব রূপ ধারণ করে কয়েকজন ফেরেস্তে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন এবং একটি বাছুর ভাজা করিয়ে তাঁদের সন্মুখে পরিবেশন করলেন। কিন্তু এত সুস্বাদু খাদ্য মেহমানদের সন্মুখে থাকা সত্বেও তারা নিস্ক্রীয় ছিলেন। খাবারের প্রতি তাদের কোন আগ্রহই ছিলনা। অবস্থা দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো, অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন, মেহমানগণ যদিও মানব রূপ ধারণ করেছেন, প্রকৃত অবস্থায় তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা।

ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সুসংবাদ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড- (১১), পৃষ্ঠা-৯৮
২। তফসীরে কবীর, খন্ড- (২৮), পৃষ্ঠা-২১০

দিলেন যে, তিনি এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান লাভ করবেন। অদূরেই তাঁর স্ত্রী দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি এ সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কেননা তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধা, তার জবাবে ফেরেস্তাগণ বললেন, এটি আমাদের কথা নয়, বরং পরাক্রমশালী, মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা। তাই এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ফেরেস্তাগণ যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ)। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ

"(হে রসূল!) ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা আপনার নিকট পৌছেছে কি"?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মেহমান তথা ফেরেস্তাগণের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আতা (রঃ) বলেছেন, ফেরেস্তাগণের সংখ্যা ছিল তিনজন। জীব্রাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) এবং ইস্রাফীল (আঃ)।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ) বলেছেন, ফেরেস্তাগণের সংখ্যা ছিল আটজন. হযরত জীব্রাঈল (আঃ) সহ আরো সাতজন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন নয়জন, মোকাতেল (রঃ) বলেছেন. বার জন ফেরেস্তা ছিলেন।

সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, তাঁরা ছিলেন ১১ জন। তারা অল্প বয়স্ক ছেলেদের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন। তাদের চেহারা ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন। এটি নবী রসূলগণের তরীকা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার কর্তব্য হলো মেহমানের আপ্যায়ন করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলো, ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম, তখন তিনি এরশাদ করলেন, খাবার খাওয়ানো এবং সালাম দেয়া, পরিচিত হোক কি অপরিচিত।

আলোচ্য আয়াতে مُكْرَمِيْن শব্দটির অর্থ হলো সম্মানিত, কেননা তাঁরা ছিলেন

ফেরেস্তা। আর ফেরেস্তাগণ নিঃসন্দেহে সম্মানিত।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

ফেরেস্তাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলে তিনিও সালামের জবাবে সালাম দিলেন। এভাবে পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হলো।

قَوْمٌ مُّنكَرُونَ

"এরা যে অজানা লোক"।

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে চিনতে পারিনি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একথাটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মনে মনে বলেছিলেন যে এরা একবারেই অপরিচিত লোক।

তফসীরকার হযরত আবুল আলীয়া বলেছেন, যেহেতু তখন ঐ শহরে সালামের কোন প্রথা ছিলনা, কেননা সালাম হলো ইসলামের একটি শিক্ষা, যা তখন ঐ শহরে প্রচলিত ছিলনা, তাই তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি।

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

এরপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন এবং একটি হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা বাছুর (ভাজা) তাদের সম্মুখে পরিবেশন করেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা খাও। কিন্তু তারা খাবারের দিকে মনোনিবেশ করলোনা, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ

(যখন মেহমানগণ খাবার গ্রহণ করলেন না) তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীত হয়ে অস্বস্তি বোধ করলেন, তাঁর মনে এক অজানা ভয় ও আশংকা দেখা দিল যে, হয়তো তারা দুশমন হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা ফেরেস্তা, হয়তো কোন আজাবের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মনে মনে এ আশংকা করলেন। মেহমানগণ বললেন, আপনি ভীত হবেন না, কোন প্রকার আশংকা করবেন না, আমরা আল্লাহ পাকের ফেরেস্তা।

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

এরপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যাঁর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তিনি হলেন হযরত ইসহাক (আঃ)। যিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করবেন।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

এরই মধ্যে তাঁর স্ত্রী কথা বলতে বলতে উপস্থিত হলেন এবং স্বীয় কপালে করাঘাত করে বললেন, যে বৃদ্ধা যে বন্ধা, তার কি কখনো সন্তান হয়?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত সারার বয়স ছিল তখন নব্বই বছর, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, এমন অবস্থায় সন্তান হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ

ফেরেস্তাগণ তাঁর কথার জবাবে বললেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, কেননা একথা আমাদের নয়, বরং স্বয়ং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই আমরা এ সুখবর তোমাকে দিচ্ছি।

إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূণ, তাৎপর্যবহ। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই, তিনি অতীতকে যেমন জানেন তেমনি ভবিষ্যত সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৪/১১/৯৬ইং মোতাবেক ২২ জমাদিউসসানী, ১৪১৭ হিঃ রোজ সোমবার বেলা ১টায় পবিত্র কোরআনের ২৬তম পারার তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা এবং এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, তোমার অশেষ করুণায় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিও এবং মুসলিম উম্মাহকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দিও, আমীন।

وصلى الله تعلى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

লেখক পরিচিতি

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বরুরা থানাস্থ বাঘমারা মিয়া বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্জ মওলবী মোহম্মদ আলী মিয়া সাহেব একজন সুফী সাধক, অত্যন্ত বড় আবেদ, পরহেজগার, দানশীল ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি ৫ম স্থান অধিকার করেন। সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী দু'বছর তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম হজ্জ সুসম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁর 'বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় তিনি 'তফসীরে নূরুল কোরআন' শীর্ষক মৌলিক ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর দীর্ঘ প্রায় দু' যুগের নিরলস সাধনা অব্যাহত রেখেছেন । এর ২৯তম খন্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনায় যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসারেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব, মাসিক আল বালাগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভর্ণর্সের সদস, ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একাডেমিক কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিয়্যু কমিটির চেয়ারম্যান, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল-নাহিয়ান ট্রাষ্ট বোর্ডের সদস্য; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক সিলেকশন কমিটির সদস্য সহ বহু মাদ্রাসা, মসজিদ ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন থেকে নিয়মিত পাবত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি তাঁর মৌলিক রচনার জন্য 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে' (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।

ইসলামের সেবায় নিবেদিত বিশ্বের যে তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে (১৪১৩ হিঃ) বারই রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে মিশরের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক (ফাষ্ট গ্রেড) প্রদান করেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।